আন্তর্জাতিক ছোটগল্প
ও সমাজ জিজ্ঞাসা

প্রথম প্রকাশ ☐ জুন, ১৯৬০

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮।এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড,
কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, রামকৃষ্ণ প্রেস, রামধন
মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

বারো বছর ধরে সম্পাদনা করে চলেছি 'আন্তর্জাতিক ছোটগল্প' পত্রিকা। বারো বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে বাঙালী পাঠক খুবই আগ্রহ নিয়ে ছোটগল্পের সাথে ছোটগল্পের বিশ্লেষণ পড়তে ভালবাসে। সে কথা ভেবে পত্রিকা থেকে বারো বছরের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলো নিয়ে একটি সংকলন বের করার প্রয়োজন বোধ করি। যে সকল প্রবন্ধ বাছাই করা হয়েছে, যেখানে সমাজজিজ্ঞাসা বিষয় হতে পেরেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম দুটি প্রবন্ধ 'ক্ষুধিত পাষাণের উৎস সন্ধানে' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দ'। প্রবন্ধ দুটির বিষয়বস্তু মূলত সমাজজিজ্ঞাসা না হলেও সমাজজিজ্ঞাসাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করা হয় নি। তবুও মুদ্রিত হয়েছে। কারণ প্রবন্ধ দুটি বিতর্কিত। আগামী দিনে বিতর্ক একদিন মীমাংসিত হবে আশা করি আরো গবেষণার ফলে।

'এই দেশ, অন্য দেশ' এভাবে প্রবন্ধগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। এবং ওভাবে নামও দেওয়া যেত প্রবন্ধ সংকলনটির। কিন্তু যেহেতু প্রবন্ধগুলো 'আন্তর্জাতিক ছোটগল্প' পত্রিকা থেকে সংকলিত এবং এই পত্রিকা বারো অতিক্রম করেছে যেহেতু ঐ নামকরণ থেকে সরে এসেছি।

কিছু মুদ্রণত্রুটি থেকে যায়। এই সংকলনেও আছে। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। অবশেষে প্রবন্ধকারদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। যাঁরা একটা লিটল ম্যাগাজিনকে নিঃস্বার্থভাবে প্রবন্ধ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এবার পাঠকের কাছ থেকে সহযোগিতা পেলেই আমি ধন্য।

শ্রীমান বীজেশ সাহা আমার খুবই প্রিয়। আমার মনে হয় একমাত্র বীজেশ সাহাই প্রথম পুস্তক-প্রকাশনার জগতে লিটল ম্যাগাজিনের প্রবন্ধকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং প্রবন্ধের বই বের করেছে। ওর আগ্রহ না থাকলে এই সংকলন কি বের হতো ? না।

□ সূচিপত্র □

ক্ষেত্র গুপ্ত □ ধ্বংস : একটি যুদ্ধবিরোধী ছোটগল্প ৯
প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস □ ক্ষুধিত পাষাণের উৎস সন্ধানে ১২
কৃষ্ণা বসু □ ত্রিশদশকের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মানবীরা ২২
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য □ প্রাগৈতিহাসিক : পুনর্মূল্যায়ন ২৯
নারায়ণ চৌধুরী □ সোমেনচন্দের দুটি অবিস্মরণীয় ছোটগল্প ৪২
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত □ কৃষণ চন্দরের গল্প ৪৯
প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত □ দেনাপাওনা : বিষামৃতের ফসল ৫৪
দীপেন্দু চক্রবর্তী □ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও তাঁর ছোটগল্প ৬৫
অলোক দাস □ তেলেনাপোতা আবিষ্কার এবং একটি সমীক্ষা ৭৫
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় □ মার্কসবাদী গল্পকার সৌরী ঘটক ৮৩
মিহির ভট্টাচার্য □ প্রেমচন্দ : নীতি ও আদর্শবোধের সাহিত্য ৮৯
তপন চক্রবর্তী □ রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দ ১০১
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত □ ছোটগল্পের প্রেমেন্দ্র মিত্র ১০৫
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য □ কথাসাহিত্যে সোমনাথ লাহিড়ী ১০৯
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় □ তবে আমরা কি করব ১১৯
শ্যামল মৈত্র □ অনুবাদ এবং ম্যাক্সিম গোর্কীর গল্পপাঠ ১২৫
তপোবিজয় ঘোষ □ লু স্যুন : 'পাগলের রোজনামচা' ও সমাজতত্ত্ব ১২৮
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য □ মেটামরফোসিস এবং সমাজ জিজ্ঞাসা ১৩৭
মনোজ চাকলাদার □ সার্ত্রের গল্প : স্বাধীনতা ১৪৮
দেবর্ষি সারগী □ মার্কেজের দস্যুজগৎ ১৫৮

ধ্বংস ঃ একটি যুদ্ধবিরোধী ছোটগল্প

ক্ষেত্র গুপ্ত

এক

গল্পের শেষে একটি ছড়া আছে। তার কথা আগে বলি।

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,
মনে হত, মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা।
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।

পবিত্র মানবিক বিশ্বাস থেকে পতন ঘটাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।

অতিবার্ধক্যে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কবির এই তীব্র ভর্ৎসনা উচ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু এই ছন্দোবদ্ধ রূঢ় ভাষণটুকুকে আপাতত স্বতন্ত্র করে দেখবার উপায় নেই। একটি ছোটগল্পের উপসংহারে ছড়াটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই গল্পের নাম 'ধ্বংস'। রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্পের বই 'গল্পসল্প'-এর একটি লেখা।

রূপকথা, স্মৃতিচারণা, কোনো চরিত্রের একটু বেঁকে যাওয়া মুখভঙ্গী নিয়ে লেখা গল্পগুলির মধ্যে হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো।

বিষয়বস্তু রবীন্দ্র-গল্পের পক্ষে একান্ত অভিনব—একক। সমকালীন য়ুরোপের বুকে সে দেশের পাত্র-পাত্রীদের কথা। তিনি একে গল্পই বলতে চান নি, বলেছেন 'হালের খবর'। যেন বলতে চান, বানিয়ে তোলা কাহিনী লিখতে বসি নি, এ টাটকা খবর, জীবন্ত সত্য।

খুব ছোট লেখা। এ সময়ের সব লেখাই ছোট। কিন্তু যত্নের অভাব নেই। প্রীতি আর নিপুণতায় মিশে গড়ে উঠেছে পিয়ের শোপ্যা আর তার তরুণী মেয়ে ক্যামিল। এত অল্প আয়োজনে, কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের ঠেকনা ছাড়াই তারা দুজন পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছে—কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি কিছু নেই।

শোপ্যাঁর 'সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল করে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে।'

তারপরে তাকে যেতে হল যুদ্ধে দেশের হয়ে লড়তে। ফাসিস্ত জার্মানির আক্রমণের মুখে ফ্রান্সের আত্মরক্ষার লড়াই। আর জার্মানদের গোলা এসে পড়েছিল ফুল বাগানে। ক্যামিল তখন বাবার সাধনা সফল করতে ব্যস্ত ছিল, বাগানে ফোটাচ্ছিল হলুদ রঙের রজনীগন্ধা।

এইতো একটুখানি গল্প। কিন্তু এর ব্যথাটা অস্তিত্বের উৎস থেকে উঠে আসে। যে ফুলের বাগানে মিলনের নবসৃষ্টির মহাযজ্ঞ চলছিল, লুব্ধ হিংস্র কামানের গোলা তাকে ধ্বংস করল। ভেতর থেকে মৌন বাণী উঠল 'মা নিষাদ'।

পাছে এ মৌন নিষেধ অনেকের কানে না পৌঁছায়, তাই লেখক থামলেন না গল্প থেমে গেলেও। তিনি একটি ছোট্ট প্রসঙ্গ জুড়ে দিলেন একটি অনুচ্ছেদে। চীনের পিকিং শহরে এক প্রাচীন প্রাসাদে প্রাচীন কারুকার্যের অসাধারণ সম্পদ ছিল। মহাকাল তাকে রক্ষা করে আসছিল। দুই মহাসভ্য শক্তিধর জাতির (রবীন্দ্রনাথের অনেক অভিশাপ এই 'সভ্য' শব্দটির উপরে পড়েছে। শব্দটি আসলে ব্যবহৃত হয়েছে 'সাম্রাজ্যবাদী' শব্দের সমার্থে) হিংস্র আক্রমণে তা বিধ্বস্ত বিনষ্ট হয়েছিল :

এবং তারও পরে ঐ উপরের ছড়াটি। গল্পের মূল ভাবটিকে ছন্দের স্পন্দনে পাঠকের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা।

সাহিত্যবিদ্ যদি বলেন, শিল্প তো যায় খেল, গল্পের মধ্যেই ছিল তাঁর বাণী, তাকে গল্পের বাইরে বিশেষ জোর দিয়ে বলায় উদ্দেশ্য বড় প্রবল হল—তো শিল্পী হয়ত উত্তর দিতে চাইবেন, শিল্পের ধরণটা বদলানো চাই। বাড়ানো যাক গল্পত্বের সীমানা। যেমন প্রাচীন কথক ঠাকুরেরা করতেন, গল্প বলতে বলতে ব্যাখ্যান চলত। ভেতরের সুখের দুঃখের ক্রোধের সুরকে পাঠকের মনে বাজিয়ে তোলার জন্য—সে বাজনাকে সম্ভব মতো স্থায়িত্ব দেবার জন্য। মাঝে মাঝে 'পয়ার এড়িয়ে ভাই বলরে লাচাড়ি', কাহিনীর বিবরণ দিতে দিতে গানের আয়োজন গদ্য গল্পের উপসংহার ঘটুক ছড়ার ছন্দে।

দুই

'গল্পসল্প' ছোটদের গল্প, যদিও এমন কিছু আছে যা ছোটদের ডিঙিয়ে যায়। আশি বছর বয়সেও লেখক গল্পের দেহ নিয়ে নানা রকমের ভাঙ্গচোর চালাচ্ছেন। মেজাজ এ-গল্পে লঘু। ধরণটা খেলার, কিন্তু গোড়ায় বড় কাজের হাত দেখা যায়। বছর দুয়েক আগে লেখা 'সে' বই থেকে কিছু নেওয়া, কিছু নতুন ঢঙ।

'ধ্বংস' অতি ছোট বেরঙ গল্প—ঘটনায় আছে চমকাবার উপাদান, বিন্যাসে নাটক নেই। মূল্য এর বিষয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান কামানের গোলা বহু-দূর থেকে অনায়াসে ফুলের বাগান, জ্যাক-ক্যামিলের তরুণ প্রেমকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবির 'মা নিষাদ' দৃপ্ত নিষেধ গল্পটুকুতে থেমে না থেকে চীনের প্রসঙ্গ তুলে বক্তৃতায় উচ্চবাক। এতে গল্প মার খেলেও রোগ-বার্ধক্য ঠেলে মানবিক মূল্যবোধে কবির ভাষা যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তার নিদর্শন রইল।

ক্ষুধিত পাষাণের উৎস সন্ধানে

প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটি প্রায় একশো বছর ধরে পাঠক ও সমালোচকদের প্রশংসা পেয়ে আসছে। এ গল্পের উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্য গল্পগুচ্ছের চতুর্থ খণ্ডের শেষে 'উৎস ও ব্যাখ্যান' অংশে ছাপা হয়েছে, যার মধ্যে দুটি মন্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭৮ সালে প্রথম বার বিলেত যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আমেদাবাদে ছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শাহিবাগের সরকারি বাসভবনে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদের সেশন জজ। 'ছেলেবেলা' বই-এ রবীন্দ্রনাথ এই শাহিবাগ প্রসঙ্গে লিখছেন : 'আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা-বড়ো ঘরোআনা, তার সাবেক দিনগুলো যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।' আর একটি মন্তব্য হল : 'ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্প-লোক থেকে আমদানী।' ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের উৎস হিসেবে এই তথ্য দুটি কতোটা বিশ্বাসযোগ্য বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেটা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চাই।

ক্ষুধিত পাষাণ ছাপা হয়েছিল সাধনা পত্রিকায় ১৩০২ সালের (১৮৯৫) শ্রাবণ সংখ্যায়। কখন গল্পটি লেখা হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারণা, গল্পটি লেখা হয় প্রকাশিত হওয়ার মাস খানেক আগে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৫ সালের ২৮শে জুন সাজাদপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন :

> বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, তখনি অনন্তভাবে তুলে দিতে পারতুম তাহলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত।

প্রভাতকুমার বলেছেন—'গল্পটি ক্ষুধিত পাষাণ। সাধনায় শ্রাবণ ১৩০২ (১৮৯৫) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ চিঠির সঙ্গে ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের কি সম্পর্ক চিঠি থেকে তা বোঝার উপায় নেই, প্রভাতকুমার এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যাও দেন নি। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি চিঠির কথা বলেছেন যেটি ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে লেখা :

> কেন জানিনে, মনে হয় এই রকম সোনালী-রৌদ্রে-ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্যোপন্যাস তৈরী হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরবদেশ,

ডামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা, আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বাদু জলের উৎস, নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সঙ্কীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রী করছে। পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাব বিছানো জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙীন কাঁচলি-পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড় পরা কালো হাবশি পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময়, সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের কান্না আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরী হচ্ছে।

প্রভাতকুমার বলছেন: আমার মনে হয় এইদিন ক্ষুধিত পাষাণের চিত্রটি জাগে; তারপর অবচেতনে তলাইয়া যায়—বৎসরকাল পরে গল্পে রূপ লইল।··· কবির কল্পনায় দামাস্কাস, বুখারা ছিল, কিন্তু স্মৃতির মধ্যে ছিল আমেদাবাদের শাহিবাগের জজ সাহেবের বাড়ি; বোধহয় অন্তগামী মুঘল যুগে সেটা নির্মিত হয়।' ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের উৎস খোঁজার ব্যাপারে চিঠিটি সত্যিই অত্যন্ত জরুরি। কেননা গল্পের পরিবেশের প্রায় পুরো খসড়া এতে রয়েছে। কিন্তু এই চিঠি লেখার জন্যে শাহিবাগের জজসাহেবের বাড়ির স্মৃতি-রোমন্থনের কোন প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের ছিল বলে মনে করার বিশেষ কোন কারণ নেই।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় হয়তো দামাস্কাস, বুখারা ইত্যাদি ছিল, কিন্তু হাতের কাছে Edgar Allan Poe-র গল্প সংকলন থাকলে ঐ চিঠির খুঁটিনাটি বর্ণনা বা ক্ষুধিত পাষাণের আরব্য পরিবেশের খসড়া খুব সহজেই পাওয়া যেতো পো-র 'A Tale of the Ragged Mountains' গল্পে। ঐ গল্পের একটু অংশ পড়লেই ব্যাপারটি সহজেই বোঝা যাবে:

'On the margin of the river stood an Eastern-looking city, such as we read of in the Arabian Tales. The houses were wildly picturesque. On every hand was a wilderness of balconies, of verandas, of minarets, and fantastically curved oriels. Bazaars abounded; and there were displayed rich wares in infinite variety and profusion – silks, muslin, the most dazzling cutlery, the most magnificent jewels and gems....And amid the millions of black and yellow men, turbaned and robed....From the swarming streets to

the bank of the river, there descended innumerable steps leading to bathing places....Beyond the limits of the city arose, in frequent majestic groups, the palm and the cocoa....and here and there might be seen....a tank....'

এই বর্ণনাটুকু পড়লে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ চিঠির 'আরব্যোপন্যাস···কত শত সহস্র গল্প' (Arabian Tales), 'নগর' (city) সঙ্কীর্ণ রাজপথ (swarming streets), 'পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি' (turbaned and robed), 'ঘন খেজুরের ছায়া' (the palm···in frequent majestic groups), 'স্বচ্ছ জলের উৎস' (tank) ইত্যাদি খুঁটিনাটিগুলি পেতে পারতেন শুধু তাই নয়, ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের 'দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের' (innumerable steps leading to bathing places) সন্ধানও পেতে পারতেন। ঐ চিঠি লেখার দিনই রবীন্দ্রনাথের মনে 'ক্ষুধিত পাষাণের চিঠিটি জাগে, প্রভাতকুমারের এই ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে পো-র A Tale of the Ragged Mountains-এর সঙ্গে ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের একটা যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনার কথাও আমাদের ভাবা দরকার।

ক্ষুধিত পাষাণ ও A Tale of the Ragged Mountains দুটি গল্পেই মূল কাহিনী বলা হয়েছে মুখ্য চরিত্রের জবানীতে। পো-র নায়ক Bedloe-র মেসমেরিজম বা magnetic remedies সম্পর্কে একটা উৎসাহ বা দুর্বলতা আছে। ক্ষুধিত পাষাণের নায়কের সঙ্গে 'কোনো এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে, কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজ্‌ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা কিছু।' পো-র নায়ক Bedloe-র সঙ্গে ক্ষুধিত পাষাণের নায়কের 'magnetic' যোগাযোগের ফলেই হয়তো দুজনের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যেও যথেষ্ট মিল থেকে গেছে এবং সে অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষাও দুই নায়কেরই প্রায় এক রকম : একটি নির্জন জায়গায় অনেকক্ষণ হাঁটার পর পো-র নায়কের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো : an indescribable uneasiness possessed me—a species of nervous agitation and tremor। ক্ষুধিত পাষাণের নায়ক এক জায়গায় ঠিক ওই অনুভূতির কথা বলছে ; 'আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন (tremor) হইতে লাগিল। সে উত্তেজনা [agitation] ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের ঠিক বলিতে পারি না [indescribable]।'

পো এক জায়গায় লিখছেন : 'A strange odour loaded the breeze' ; ক্ষুধিত পাষাণেও 'একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।' পো-র নায়ক আর এক জায়গায় বলছে : 'The heat became all at once intolerable···a strong and brief gust of wind bore

off the incumbent fog' ; ক্ষুধিত পাষাণের নায়কও বলছে : 'হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটি বাতাস দিল'। পো-র গল্পের আর একটি ঘটনার সঙ্গেও ক্ষুধিত পাষাণের নায়কের একটি অভিজ্ঞতার আশ্চর্য মিল রয়েছে। পো লিখছেন : There came a wild rattling or jingling sound, and upon the instant a dusky-visage and half naked man rushed past me with a shriek'। লোকটি তার হাতের steel rings বা লোহার বালাগুলি সজোরে নাডাতে নাডাতে নায়কের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। নায়কের মনে হলো : A low continuous murmur, like that arising from a full but gently flowing river, came to my ears, intermingled with the peculiar hum of multitudinous human voices'. এইসব 'rattling or jingling, অসংখ্য মানুষের কলগুঞ্জন, 'বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপ', পাশ দিয়ে ছুটে চলে যাওয়া, শান্ত নদীর কলতান, অনিবার্যভাবেই ক্ষুধিত পাষাণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পো-র A Tale of the Ragged Mountains-এর সঙ্গে ক্ষুধিত পাষাণের পরিবেশগত মিলের ঘনিষ্ঠতায় খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ মাত্র কয়েক মাস আগেই রবীন্দ্রনাথ পো-র আরেকটি বিখ্যাত গল্প Ligeia-র কাহিনী অবলম্বন করে তাঁর নিশীথে গল্পটি লিখেছেন, যার মধ্যে অনেক জায়গায় পো-র বর্ণনার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রহস্য গল্পগুলির বেশির ভাগই পো-র বিভিন্ন গল্পের কাঠামো একটু এদিক ওদিক করে লেখা। কিন্তু ক্ষুধিত পাষাণের মূল গল্পে এক সাধারণ জীবিত যুবকের সঙ্গে অতীত যুগের এক সুন্দরী যুবতীর যে অতিলৌকিক সম্পর্ক বা প্রেম-অভিসারের কাহিনী রয়েছে সেটি পো-র কোন গল্পে নেই। এমনও হতে পারে যে A Tale of the Ragged Mountains থেকে মুখ্যচরিত্র বা পরিবেশ সম্পর্কে কিছু কিছু উপাদান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুধিত পাষাণ শুরু করেছিলেন, কিন্তু মূল কাহিনী নিজের কল্পনা দিয়েই গড়ে তুলেছিলেন।

এই ব্যাখ্যাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম যদি রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের উৎস সম্পর্কে শাহিবাগের অভিজ্ঞতার কথা বারবার উল্লেখ না করতেন, বা যদি 'ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্প-লোক থেকে আমদানী' এই সন্দেহজনক উক্তিটি না করতেন। ক্ষুধিত পাষাণের মতো আজগুবি একটা গল্পের কল্পনা কল্প-লোক থেকে আসবে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও যখন রবীন্দ্রনাথ একথা বলছেন তখন আমরা ধরে নিতে চাই যে এই গল্পের মূল কাহিনীও অন্য কোন বিদেশী গল্প থেকে এসেছে বলেই তিনি বারবার শাহিবাগ, কল্প-লোক ইত্যাদির মধ্যে এ গল্পের উৎস নির্দেশ করেছেন। গল্পের উৎস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য শোনা যেতে পারে, কিন্তু সেটাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে করা সবসময়

নিরাপদ নয়।

ক্ষুধিত পাষাণের মূল কাহিনী কোন্ বিদেশি গল্প থেকে আসতে পারে সেটা আন্দাজ করা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা নয় যদি আমরা গল্পটির কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদানের কথা মনে রাখি। গল্পের নায়কের মধ্যে একটা বাস্তব-অসহিষ্ণু অতৃপ্তি বা একাকীত্ববিলাস আর এক ধরণের চর্চিত ennui আছে। মুঘল হারেমের পরিবেশ আর নায়িকার মধ্যে রয়েছে একটা উত্তেজনা মেশানো exoticism। জীবিত নায়ক আর অতীত থেকে আসা নায়িকার সম্পর্ক বা আসঙ্গলিপ্সার মধ্যে রয়েছে কিছুটা যৌন আবেদন মেশানো অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় আভাস।

ennui, exoticism, eroticism আর mysticism—এই চারটি পরস্পর মেশানো ফর্মুলার মধ্যে শুধু যে একটা অরাবীন্দ্রিক, অবক্ষয়ী fin de siecle গন্ধ আছে তাই নয়, একটু কড়া ফরাসি আমেজও আছে। সেইজন্যে শুধু ইংরেজি বা আমেরিকান গল্পের কথা না ভেবে ফরাসি গল্পের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশেষত এই কারণে যে ১৮৯১ সাল থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় সব নামকরা ফরাসি গল্পের অনুবাদ শুরু করেছেন। প্রমথ চৌধুরী Prosper Merimee-এর অনুবাদ করেছেন এবং প্রিয়নাথ সেন ১৮৮৩ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথকে ফরাসি লেখকদের সঙ্গে পরিচিত করাচ্ছেন অনুবাদের মাধ্যমে। Theophile Gautier-র বিখ্যাত উপন্যাস Mademoiselle de Maupin ১৮৮৩ সালে প্রিয়নাথ পড়তে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে এবং ১৯০১ সালে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গোতিয়ে, দোদে এবং মোপাসাঁ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা লিখেছেন। আনাতোল ফ্রাঁস সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ খোঁজখবর নিচ্ছেন এই সময়।

এবার বোধহয় আমরা সহজেই খুঁজে নিতে পারবো কোন্ ফরাসি লেখকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ennui, exoticism, eroticism আর mysticism-এর অবক্ষয়ী মিশ্রণটি পেতে পারতেন—তিনি গোতিয়ে ছাড়া আর কেউ নন। ইয়োরোপীয় কলাকৈবল্যবাদীদের গুরু গোতিয়ে আর তাঁর Art for Arts' Sake-এর ঢেউ শুধু ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা ইতালীতেই নয়, বাংলাদেশেও এসে পড়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। Mademoiselle de Maupin-র জনপ্রিয়তার ফলে গোতিয়ের অতিপ্রাকৃত আর exotic গল্পগুলিও ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় আদর পেতে সুরু করেছে ১৮৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে। ১৮৮২ সালে গোতিয়ের কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের ইংরেজী অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়, অনুবাদক ছিলেন Lafcadio Hearn যিনি মোপাসাঁ ও লোতি-র গল্পেরও প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন।

হার্ণ গোতিয়ের কয়েকটি গল্পের অনুবাদ করে প্রথম যে বই প্রকাশ করেন

১৮৮২ সালে, তার নাম One of Cleopatra's Nights। এই বইটির মাধ্যমেই সারা পৃথিবীর ইংরেজি-জানা পাঠকেরা গোতিয়ের কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। প্রভাতকুমার আমাদের জানিয়েছেন: 'পাশ্চাত্য আধুনিক সাহিত্যর বহু সংবাদ রবীন্দ্রনাথ পাইতেন প্রিয়নাথের নিকট হইতে।' প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে One of Cleopatra's Nights-এর সন্ধান দিয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ঐ বইটি থেকে গোতিয়ে-র বিখ্যাত গল্প Le pied de la momie-র ইংরেজি অনুবাদ The Mummy's Foot যে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

The Mummy's Foot গল্পটি লেখকের নিজের জবানীতে লেখা। গল্পের কথকই নায়ক, প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে উৎসাহ আছে নায়কের। একদিন একটি কিউরিও-দোকানে মমির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পায়ের পাতা দেখে নায়ক পাঁচ স্বর্ণমুদ্রায় সেটি কিনে নিয়ে এলেন তাঁর বাসায়। টেবিলে কাগজ—পত্রের ওপর পায়ের পাতাটি রেখে নায়ক বাইরে বেরোলেন। খানাপিনা সেরে বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন বিছানায়। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় নায়কের মনে হলো মমি-র পা-টি যেন নড়াচড়া করছে, লাফাচ্ছে। হঠাৎ বিছানার পর্দাটা কে যেন সরিয়ে দিল, নায়ক দেখলেন এক সুন্দরী যুবতী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, চোখ জলে ভেজা। একটি পায়ের অভাবে তাকে খোঁড়াতে হচ্ছে। সে এসেছে তার হারিয়ে যাওয়া পায়ের পাতা-র খোঁজে। এক আরব দস্যু তার কফিন থেকে ঐ পায়ের পাতা চুরি করে। মিশরসুন্দরী ঐ পায়ের পাতা এখন ফেরত পেতে চায়। সব শুনে পায়ের পাতা-টি যুবতীকে বলল: আমি তো তোমার কাছে ফিরে যেতে পারি না, পাঁচ স্বর্ণমুদ্রায় আমি বিক্রীত হয়েছি; তুমি এই অর্থ দিয়ে আমাকে মুক্ত করো। নায়ক বিনামূল্যেই পাতা-টি ফেরত দিলেন নায়িকাকে। সুন্দরী খুব খুশি, নায়ককে আমন্ত্রণ জানালো তার বাবা ফ্যারাও-র (pharaoh) প্রাসাদে।

রাজদর্শনে যাবার মতো উপযুক্ত সাজ পোষাক পরে নায়ক সেই রহস্যময়ী যুবতীকে অনুসরণ করলেন। দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে পৌঁছালেন ফ্যারাও-র প্রাসাদে যেখানে দীর্ঘ সোপানের নীচে স্ফিংস পাহারা দিচ্ছে। তারপর অজস্র দীর্ঘ বারান্দা, বড় বড় ঘর ইত্যাদি পেরিয়ে নায়ক এসে পড়লেন এক বিরাট সভাগৃহে ফেয়ারো-র সামনে। সবকথা শুনে রাজা খুশি হয়ে নায়ককে পুরস্কার দিতে চাইলেন। নায়ক চেয়ে বসলেন রাজকুমারীকে, সুন্দরীও অরাজী নয়। কিন্তু তা তো হবার নয়। সাতাশ বছরের যুবকের সঙ্গে তিনহাজার বছর অতীতের রাজকন্যার মিলন সম্ভব হবে কি করে? তাছাড়া ঐ যুবক তো জানেই না কি করে হাজার হাজার বছর শরীরকে টিকিয়ে রাখা যায়। 'ছাখো না আমি হাজার হাজার বছর পরেও কেমন মজবুত আছি'—এই কথা বলে নায়কের হাত ধরে ফেয়ারো এত জোরে করমর্দন করলেন যে নায়কের ঘুম

ভেঙে গেল, দেখলেন কেয়ারো নয়, তাঁর এক বন্ধু তাঁকে ঠেলে ঘুম থেকে ওঠাচ্ছে। বুঝলেন তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন—সব ঝুট হ্যায়। গল্পটির শেষে একটু অতীন্দ্রিয় চমক আছে। নায়ক দেখলেন টেবিলের ওপর সেই পায়ের পাতাটি নেই, তার জায়গায় রয়েছে একটি সবুজ দেবমূর্তি যেটি গত রাতের রহস্যময়ী অভিসারিকার বুকে আটকানো ছিল।

গোতিয়ের গল্পের এই কাঠামোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন জীবিত মানুষের সঙ্গে অতীত যুগের এক সুন্দরীর অতিলৌকিক রোমান্স, অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় পরিবেশ, exoticism আর নায়কের একাকীত্ব ও চর্চিত অতীতবিলাস—ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের বিশিষ্ট উপাদানগুলি সবই এখানে উপস্থিত। কিন্তু শুধু গল্পের কাঠামো বা উপাদানের মিল থেকেই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে ক্ষুধিত পাষাণের সঙ্গে The Mummy's Foot-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই গল্প দুটি আর একটু খুঁটিয়ে পড়া দরকার। রহস্য গল্প লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ একটা অদ্ভুত কাজ করতেন মাঝে মাঝে। তিনি শুধু কোন বিদেশি রহস্য গল্পের কাঠামো বা পরিবেশগত উপাদানই ব্যবহার করতেন না, মাঝে মাঝে বর্ণনাও প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে নিতেন। A Tale of the Ragged mountains এর কোন কোন বর্ণনার অংশে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। The Mummy's Foot থেকেও তিনি ঐ ভাবে বেশ কিছু বর্ণনা হুবহু অনুবাদ করে নিয়েছেন। The Mummy's Foot ও ক্ষুধিত পাষাণ থেকে কয়েকটি অংশ পাশাপাশি রাখলেই এটা বোঝা যাবে :

'I caught sight of a charming foot—It had beautiful ruddy tints'.

'শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে…'

'tatbebs—painted and embroidered and turned up at the toes'.

'বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা'।

'A vague whiff of oriental perfume delicately titillated my olfactory nerves—it was a perfume at once sweet and penetrating, a perfume that four thousand years had not been able to dissipate ;

'শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহু দিবসের লুপ্তাবশিষ্ট আতরের মৃদু গন্ধ আমার নেশার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।
'I bathed you [the foot] with perfumed water in a bowl of alabaster গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব…'

'The Arab who violated your coffin···five pieces of gold for my ransom···'

'বেদুইন দস্যু···বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। ···বাদশাহের ভৃত্য স্বর্ণমুদ্রা গনিয়া দিয়া···'

'I felt a strange wind chill my back—my suddenly rising hair caused my nightcap to execute a leap of several yards—'

'একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাসে আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল।'

'Her brow was adorned with a shining plate of gold—'

'সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট···বেষ্টন করিয়াছে।'

I arrayed myself in a dressing gown of large flowered pattern which lent me a very Pharaonic aspect—'

'যত্নপূর্বক শাহাজাদার মতো সাজ করিতেছি।·· ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া—বহু যত্নে সাজ করিতাম'।

'At last we found ourselves in a hall so vast, so enormous, so immeasurable, that the eye could not reach its limits; files of monstrous columns stretched far out of sight on every side—'

'সম্মুখের ঘরটি অতিবৃহৎ। তিনসারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্য-খচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে।—আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।'

'She gave me her hand which felt soft and cold like the skin of a serpent—'

'একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত···'

'The princess conducted me to the mountain of rose-coloured granite, in the face of which appeared on opening no narrow and low—We traversed corridors of interminable length opened into square chambers, in the midst of which pits had been contrived—'

'সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথা যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।'

উদাহরণ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। The Mummy's Foot ও ক্ষুধিত পাষাণের মধ্যে শুধু গল্পের কাঠামো বা নায়ক নায়িকার চরিত্র সৃষ্টিতে নয়, বিভিন্ন অংশের বর্ণনা বা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এতো ঘনিষ্ঠ, বিশেষ করে আমাদের বর্ণনায় অনুবাদ এতো আক্ষরিক যে The Mummy's Foot গল্পটি সামনে খুলে রেখে ক্ষুধিত পাষাণ লেখা হয়েছিলো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছাড়া বোধহয় আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকে না। নিঃসঙ্গ অতীত বিলাসী নায়ক, বহু শতাব্দীর ওপার থেকে আসা সুন্দরী নায়িকা, অতীত যুগের বিলাসবৈভবের অর্ধলুপ্ত সৌরভ, শ্বেতপাথরের আসনে বসে সুগন্ধি জলে স্নান, পাহাড় ঘেরা বিশাল প্রাসাদ, প্রহরী, সারি সারি প্রকাণ্ড স্তম্ভ, নায়িকাকে অনুসরণ করে দীর্ঘ বারান্দা, প্রশস্ত সভাগৃহ, গোপন কক্ষ পার হওয়া, আর গল্পের শেষে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া—এ সবই রবীন্দ্রনাথ গোতিয়ে-র গল্পে পেয়েছেন। অন্যদিকে নায়কের অলৌকিক ব্যাপারে কিছু-একটা যোগ আর গল্পের মুঘল আরব্য পরিবেশ পো-র A Tale of the Ragged Mountains তাঁকে দিয়েছে। সুতরাং ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের কোন উপাদানের জন্যই শাহিবাগের স্মৃতির ওপর নির্ভর করার কোন দরকারই ছিলো না রবীন্দ্রনাথের। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে বারবার শাহিবাগের গল্প শোনানো, বা 'ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্প-লোক থেকে আমদানী' এই সব কথা বলা বেশ মজাদার রসিকতা হতে পারে, কিন্তু তথ্য হিসেবে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সব থেকে মজার ব্যাপার হলো ভক্তবৃন্দের উপরোধে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুধিত পাষাণের ইংরেজি অনুবাদেও সম্মতি দেন। ১৯১১ সালে Modern Review পত্রিকায় গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১৬ সালে Macmillan রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে—The Hungry Stones and other Stories। এই বইটির প্রথম গল্পই The Hungry Stones—ক্ষুধিত পাষাণের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদক ছিলেন সি. এফ. অ্যাণ্ডরুজ, তাঁকে সহায়তা করেন টমসন, পান্নালাল বসু, সিস্টার নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এঁদের একজনকেও রবীন্দ্রনাথ বললেন না কিভাবে ক্ষুধিত পাষাণ লেখা হয়েছিল। ফল যা হবার তাই হলো, Lafcadio Hearn-এর যে অনুবাদ থেকে ক্ষুধিত পাষাণ এসেছিলো, অ্যাণ্ডরুজ The Hungry Stones-এর মাধ্যমে আবার গল্পটিকে তার উৎস মুখে ফিরিয়ে দিলেন, অনুবাদের কপিরাইট শেষ হবার অনেক আগেই। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের কোন ফরাসি অনুবাদ হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই, হয়ে থাকলে বৃত্তটি সত্যিই সম্পূর্ণ হয়েছে বলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেন তখন বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ছিলো না। ঐ সময়েই শিক্ষিত বাঙালীরা বিদেশি ছোটগল্পের সঙ্গে

পরিচিত হতে শুরু করেন আর এই যোগাযোগের ফলেই আধুনিক ছোটগল্পের বিশিষ্ট ফর্ম বা গঠনরীতি সম্পর্কে তাঁরা উৎসাহিত হন। এ যুগের বাংলা ছোটগল্পের আদি লেখকেরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে উঠতে পারেন নি বাংলা ছোটগল্প কোন পথে এগোবে, কোন ধরণের কাহিনী বা বিষয়বস্তু, কি ধরণের ঘটনাবিন্যাস বা ভাষা বাংলা ছোটগল্পের পক্ষে উপযুক্ত হবে। ইতিমধ্যে হিতবাদী, সাধনা বা ভারতীর মতো পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে ছোটগল্পের চাহিদা তৈরি হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক যে ঐ চাহিদা মেটানোর জন্যে সে যুগের উৎসাহী লেখকেরা নামকরা বিদেশি লেখকদের গল্প বা রচনাকৌশল অনুসরণ করবেন, বা ঐ সময়ে লেখা বেশ কিছু গল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিদেশি প্রভাব থাকবে। এর মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই, লজ্জা পাবারও কিছু নেই। বরং আদিযুগের এই সব লোকদের ওপর বিদেশি প্রভাব ঠিক কিভাবে বা কতোটা কাজ করেছে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারলে পরবর্তী কালের রচনায় এই সব প্রাথমিক প্রভাব কাটিয়ে উঠে লেখকেরা যে পরিণত শিল্পবোধ বা মৌলিক রচনাশৈলীর পরিচয় দিয়ে গেছেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

নিশীথে, মহামায়া, গুপ্তধন, সম্পত্তি সমর্পণের মতো ক্ষুধিত পাষাণও রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষানবিশির ফসল। ঘটনাবিন্যাসের শিথিলতা, পরিহাসের সুরে তুলোর ট্যাক্স আদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ফ্যান্টাসির আমেজটিকে বার বার ভেঙে দেওয়ার ফলে গল্পের নিজস্ব গতিবেগ গড়ে না ওঠা, নায়িকার অট্টহাসি, চুলছেঁড়া, কাঁচুলি ছিঁড়ে বুক চাপড়ানো, হিস্টিরিয়া, রক্তারক্তি আর তার সঙ্গে বাতাসের গর্জন, ঝড়ঝাপটা, প্রবল বৃষ্টি ইত্যাদি মিশিয়ে জোড়াতালি দেওয়া অতি নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স তৈরি করার আপ্রাণ চেষ্টা, মেহের আলির প্রায় যাত্রা সুলভ চীৎকার, কিংখাব, কাফ্রি-খোজা, আপেল-নাশপাতি-আঙুর, সুগন্ধি ধূপ, রঙীন রুমাল, জাফরানি পায়জামা, গোলাপজল, ফুলকাটা কাঁচুলি, ছোরাছুরি ইত্যাদি বহু-ব্যবহারে জীর্ণ থিয়েটারি সাজসরঞ্জামের ক্লান্তিকর সমাবেশ—এই সব কিছুই ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের অসহায় পরাশ্রয়িতার চিহ্ন বহন করছে। এ গল্পের ভাষা বা শব্দপ্রয়োগের অতিরিক্ত জৌলুশ আর কাব্যিকতার মূলেও এই পরনির্ভর অস্থিরতা। রবীন্দ্রনাথের প্রাণ এ গল্পে নেই। তাই এত কৃত্রিম লিপি চাতুর্য, যাকে ভুল করে কবিতা বলে প্রশংসা করলে ছোটগল্পের সম্মান বাড়ে না, কবিতারও না।

---

* স্থানাভাবে উদ্ধৃতিগুলির উৎস নির্দেশ করা গেল না এই আলোচনায়। লেখকের 'রবীন্দ্রনাথের রহস্যগল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ' বইটিতে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে, উৎসাহী পাঠকেরা দেখে নিতে পারেন।

ত্রিশদশকের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মানবীরা

কৃষ্ণা বসু

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের রচনাগুলি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত—এই রকম একটি মনোভাব সাহিত্য সমালোচনার জগতে অত্যন্ত স্থায়ীভাবেই চলে আসছে। আমাদের একটা প্রবণতা আছে যে সহজ সিদ্ধান্তে কোনো লেখক বা শিল্পস্রষ্টাকে এক বিশেষ বিশেষণে চিহ্নিত করা,—যেমন ইনি রোমান্টিক, উনি বস্তুনিষ্ঠ, তিনি প্রকৃতি প্রেমিক, এইসব আর কি! এইভাবে বিশেষণ চিহ্নিত করার মধ্যে সাহিত্য সমালোচকের সুবিধা হয়তো কিছুটা হয়, কিন্তু সাহিত্যিকের প্রতি তাতে সবসময় সুবিচার করা যায় না। এক ধরণের সহজ সিদ্ধান্তের প্রতি ঝোঁক ও চিন্তার আয়াস এড়ানোর কারণেও এমনটি হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি লেখক জীবন আরম্ভ করেন ১৯২৮ সালে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একই বছরে প্রথম ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থ 'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প', দুটি উপন্যাস 'জননী' ও 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশিত হয়। একথা ঠিক যে তাঁর এই সময়ের গল্পের চরিত্রগুলির আচরণ, আচরণের অসংগতি, স্ববিরোধ, আত্মপ্রতারণা—সবকিছুকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো ফ্রয়েডীয় মনো-বিকলনবাদের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, কিন্তু সব সময় নয়। মানিকের শিল্পী স্বভাবটি ছিল অনাবেগী, প্রশ্নমনস্ক অথচ মানুষের প্রতি, বিশেষত এই সমাজের দোষে জীবনের হাতে মার খাওয়া মানুষের প্রতি সত্যিকারের মমতায় সমৃদ্ধ। মানিকের গল্পে ভাবাবেগের বাষ্পমাত্র নেই, কিন্তু দুঃখী, বিপন্ন, মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের সমস্যা যন্ত্রণা অসহায়তা তিনি দেখেছেন এবং তার নিজেরই ভাষায় এইসব চরিত্রগুলি তাঁকে বলেছে "ভাষা দাও, ভাষা দাও।" মানিক আপাত সত্যের আড়ালে প্রকৃত সত্যকে খুঁজতে চেয়েছেন তাঁর সারা জীবনের গল্পে। তার ফলে মনোলোভন, নরম নিটোল সুগোল মিষ্টি গল্প তিনি কোনদিনই লেখেন নি। বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে মানিক তাই একেবারে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে স্বয়ং প্রকাশ হলেন। 'কেন লিখি' নামক প্রবন্ধে মানিক বলেছেন, "জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে, পাতা নড়ে,—জানা নয়)।" এই অহংকার তাঁকে মানায়। একেবারে নিজের মতন

করে মানুষের চরিত্রকে, তার সমস্যাকে চিনে নিতেন তিনি, এই চেনার চরিত্রটাকে চিনে নেওয়াই হচ্ছে সাহিত্যের মনস্ক পাঠকের কাজ। তাঁর প্রথম দিকের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গল্পের বিশ্লেষণ করে তাঁর সেই চেনার স্বরূপ, তার মানবিক দিকটিকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা মাত্র করব এই প্রবন্ধে।

প্রথম আলোচ্য গল্পটি হল 'অতসীমামী ও অন্যান্য' গল্প, সংকলনের 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পটি। এই গল্পটি এমন একটি নারীর গল্প প্রথানুগ জীবনে, স্বামী সন্তানের সেবায় যে নারী জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পায়নি। তার স্বামীটি ছিল যাবতীয় হীনতা, রুচিবিকার এবং স্থূল স্বার্থপরতার একটি প্রতিমূর্তি, তার পুত্র সন্তান দুটিও তার পিতার আদলেই তৈরী হয়ে উঠেছিল। এই হীনতার আর রুচিহীনতার, মনুষ্যত্বের অবমাননার এই পরিবেশে মমতাদি হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই সেই ছোট জীবনের দমবন্ধ করা রুচিহীন মনুষ্যত্বহীন পরিবেশ থেকে মমতাদি বেরিয়ে এসেছিল। এই নারীটির জীবনের যে বেদনাবোধ এবং অসাধারণ আত্মমর্যাদাবোধ তাকে তার যথার্থ পটভূমিতে ধরতে পেরেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গল্পের মমতাদি যে কারণে স্বামী-গৃহ এমন কি সন্তান পর্যন্ত ছেড়ে দিল, সেই কারণটুকু আবিষ্কারের মধ্যেই মানিকের মানবিক মমতায় এবং সহানুভূতিতে সজীব হৃদয়টিকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এই পুরুষশাসিত মধ্যবিত্ত জীবনের স্বার্থপরতায়, নির্বোধ হৃদয়হীনতায় মৃণালের মতো বুদ্ধিমতী নারী বুঝতে পেরেছিল কোনখানে তার মনুষ্যত্বের অপমান, যে সমাজ তাকে নারী বলেই জেনেছে, মানুষ বলে মর্যাদা দেয়নি, সেই সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে অবস্থানের কী গ্লানি এবং লজ্জা-অপমান। বিন্দুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে আরো ভালো করে বুঝেছিল এই সমাজ নারীকে কতটুকু মূল্য দেয়। মৃণাল তার নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তার ঘেরাটোপ অস্বীকার করে এসে দাঁড়িয়েছিল বিরাট আকাশের তলায়, অনন্ত সমুদ্রের সামনে বৃহৎ জীবনের সন্ধানে। সেই বৃহৎ জীবনের সন্ধানেই পরোক্ষভাবে অপমানিত ও হীন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসেছিল মমতাদি (বৃহত্তর ও মহত্তর)। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের শেষে স্পষ্ট করে বলা নেই এই অপমানিত অবস্থান থেকে বেরিয়ে মৃণাল আর্থিক নিরাপত্তার কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মানিকের 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পের মমতাদি একটি সমাজ ও দেশসেবামূলক নারীকল্যাণ সমিতিতে যোগ দিয়েছিল এবং একটি বৃহত্তর মহত্তর আদর্শের সংস্পর্শে এসে অপমানিত মনুষ্যত্বের গ্লানি ভুলেছিল। কোনো ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদ নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অপমানিত অবস্থানকে চিনিয়ে দেবার অত্যন্ত মানবিক ও স্বচ্ছ সমাজমনস্ক মনোভাব এখানে কার্যকর। রবীন্দ্রনাথের মৃণাল প্রথম প্রতিবাদ করেছিল। সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম প্রতিবাদ। মানিকের মমতাদিও

বুঝেছিলেন কী ভাবে ভুল মানুষের সেবা করে ভুল পরিবেশে জীবনকে ভুল মূল্য দিয়ে সে বেঁচে আছে। রামপ্রসাদ বলেছেন, 'এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা'। সেই দুর্লভ মানব জমিনে যথার্থ সোনা ফলাবার জন্যই মমতাদি গৃহ ছেড়েছিল। কাহিনীর প্রথমেই মমতাদির স্বামী নগেনের যে সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ পরিচয় লেখক দিয়েছেন তার স্বল্প অবকাশেই পাঠক বুঝতে পারেন যে কী পরিমাণ হীনতা, বিকৃত রুচি, স্থূলতা এই চরিত্রটির সর্বত্র বিরাজিত,—এই রকম একটি মানুষের সঙ্গে মমতাদির মতো অনুভূতিশীলা ও আত্মসম্মানযুক্তা মহিলা যে এগার বছর ঘর করেছিল, তার প্রায় প্রতি মুহূর্তের গ্লানি, প্রচ্ছন্ন অপমান লেখক যেন নিজে অনুভব করেছেন এবং মমতাদির প্রতি পাঠক হৃদয়ের শ্রদ্ধাটিকেও তিনি এই কারণেই চমৎকার জাগিয়ে তুলেছেন। কাহিনীর শেষে মমতাদি অনুজ প্রতিম লেখককে অনুরোধ করেছে সে যেন মমতাদির স্বামী ও পুত্রদের কুশল সংবাদ মমতাদিকে পৌঁছে দেয়। যদিও মমতাদি চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে মমতাদির স্বামী নগেন আবার বিয়ে করেছিল। মমতাদির এই কুশল সংবাদ চাইবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তার মানবিক সত্তাটুকুকে, রক্তমাংসের মানুষের হৃদয়টুকুকেও চিনে নেওয়া যায়। এই পুরুষপ্রধান সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে চালিত সমাজে নারীর জীবনের চরিতার্থতা যে তথাকথিত প্রেমে নয়, গার্হস্থ্য সীমানায় নয়, তারও চরিতার্থতা যে বৃহৎ কর্মজগতের মুক্তিতে, কোন দু একটি ব্যক্তি বিশেষের কারণে যে তার মানব জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না এই জরুরী সত্যটুকুকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পে উচ্চারণ করেছেন অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পয়লা নম্বর' গল্পের নায়িকা অনিলাও স্বামী এবং প্রেম-প্রার্থী কারোর বন্ধনেই ধরা না দিয়ে গিয়েছিল নিজস্ব জগতের সন্ধানে। নিজের আত্মার সম্মানে নিজের কারণে ভিতর যে অনির্বাণ মনুষ্যত্ব তার অপমানের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘর ছেড়েছিল মমতাদি। মমতাদি তরুণকে (লেখকের গল্পের নাম) বলেছে "আমি তাই ভাবতাম যে শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদেরই কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হয় না? সবাই পরের জন্যই অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজের জন্য আহরণ করে সেই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু। ওরি নাম নিজের আত্মার কল্যাণ।" আর এক জায়গায় বলছে মমতাদি, "কতক স্বামীর জন্যে কতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিশাপে সমগ্রভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম। সম্পূর্ণভাবে আমার জীবন হলো অকারণ, অর্থহীন। স্বামী নয়, দুঃখ-দুর্দশা নয়, ব্যর্থ বেঁচে থাকাটা আমার সইল না। আমার আত্মা আর্তনাদ আরম্ভ করে দিল।" একটি মানবীয় জীবনের, এই ব্যর্থ বেঁচে থাকার দিকটাই মানিকের মানবিকবোধ-সম্পন্ন লেখক সত্তাকে আলোড়িত, উদ্বোধিত করেছিল।

'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পটি মানিকের প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থ 'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প'-এর অন্তর্গত। এই সংকলনটির প্রকাশকাল মনে রাখতে হবে ১৯৩৫। এরপরের যে গল্পটি আলোচনার মধ্যে আসবে তার নাম 'হাত'। গল্পটি মানিকের তৃতীয় সংকলন গ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'-র অন্তর্ভুক্ত। একটি অসহায় মানুষের এক অসমাধিত বেদনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পটি। 'হাত' গল্পের নায়িকার অপুষ্ট খর্ব শরীরের মধ্যে তার হাত দুটি ছিল অস্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট নিটোল দীর্ঘ এবং বেমানান। নায়িকার নাম মহামায়া, সে তার হাত দুটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সংসারের বহুতর প্রয়োজনের কাজ করে তার শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার হাত দুটি কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। এমন কি ঘুমের ঘোরেও তার অস্থির হাত দুটি বিছানা বালিশ চাদর ছিঁড়ে ফেলে তোষকের তুলো বার করে আনে। সংসারের কাজ সেরে মুহূর্ত মাত্র বিশ্রাম নিতে চায় না তার হাত দুটি। টবের ফুলগাছ শিকড় সমেত উপড়ে এনে সেটিকে ছিঁড়ে ফেলে, অন্যের দামী শাড়ি ছিঁড়ে ফালা করে দেয়,—সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে মহামায়ার হাত দুটি মহামায়াকে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত করে, গঞ্জনা অপমানের শেষ থাকে না তার, লাঞ্ছিত অপমানিত এই নারীটির বিচিত্র অসহায় বেদনাই এই গল্পের উৎসভূমি।

কোনো ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞান দিয়ে এই গল্পের মানবীটির বেদনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অসহায়, প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে নিরুপায় এই মানবীটির বেদনা এক ধরনের নিরাসক্তির সঙ্গে লেখক স্পষ্ট করেছেন। বারীন নামে একটি প্রতিবেশী যুবক মহামায়াকে সেলাই করতে দেবার জন্যে পাঞ্জাবীর কাপড় দিতে এলে মহামায়া কথা বলতে বলতে বারীনের কোটের বোতামগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর নিষ্ঠুর তিরস্কারে, আত্মধিক্কারে নিজের হাত দুটিকে পেতে দেয় বাঁধানো বই কাটবার যন্ত্রের তলায়, কনুয়ের নিচ থেকে হাত দুটি কাটা পড়ে, অচৈতন্য হবার আগে মহামায়া বারীনকে বলে, "মরতে দিও না ভাই ঠাকুরপো, বাঁচিও। আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা থেকে মহামায়া হাত দুটিকে কেটে বাদ দেয় না। নিজের অনিয়ন্ত্রিত অনিষ্টকারী হাত দুটির যন্ত্রণাদায়ক, বিড়ম্বনাকারী উপস্থিতি এমন মানসিক কষ্ট তার মধ্যে তৈরী করে যে এই ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত ছাড়া তার আর বোধহয় উপায়ান্তর ছিল না। মহামায়ার শৈশবে তার পিতৃব্য তাকে নিয়ে মোটরে চেপে যাবার সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটান যার চিহ্ন মহামায়া পিঠে এবং হাঁটুতে সারা জীবন বহন করেছে, যার পরিণামে সে রোগা এবং অপুষ্ট হয়ে গিয়েছে; পাশে বা লম্বায় বাড়েনি, কেবল তার হাত দুটি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এই সামঞ্জস্যবিহীন শরীর তাকে যত না লজ্জা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে তার অস্বাভাবিক অনিষ্টকারী হাত দুখানি। এই হাত দুটিকে নিয়ে মহামায়া সংসারের যাবতীয় কাজ অতি

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করে ফেলে, কিন্তু সব কাজই তাকে করতে দেওয়া যায় না। তার সদা চঞ্চল অসীম ক্ষমতাশালী হাত দুটি তখন অনিষ্ট সাধন করে বসে। সমাজ সংসারের সবটাই ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভারসাম্যের কোনো একটি বিন্দু যদি বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সেই বিচলন যদি অন্যের অনিষ্ট করে, তবে তা কেউ ক্ষমা করে না, মহামায়ার হাত দুটিকেও কেউ ক্ষমা করেনি। একদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের এই সমাজ বড় নিষ্ঠুর, স্বার্থে ঘা লাগলে, অসুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি হলে, কেউ কাউকে ক্ষমা করে না। সংসারে আর পাঁচজনের মধ্যে থেকেও মহামায়া ব্যক্তিগত সংকট থেকে পরিত্রাণের যে ধ্বংসাত্মক উপায় উদ্ভাবন করেছে, এর সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একটি অসহায় মানুষের বেদনাকে অনুভব করা যায় এবং এক ধরনের তীব্র কষ্ট পাঠক চিত্তকে অধিকার করে।

আমি এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অতি বিখ্যাত এবং বিতর্কিত গল্পকে নিয়ে আলোচনা করব। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'সরীসৃপ' নামের গল্প সংকলনটি। প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। 'অতসীমামী' ও অন্যান্য গল্প, 'প্রাগৈতিহাসিক' 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'সরীসৃপ'—প্রথমদিকের এই চারটি গল্প সংকলন গ্রন্থই প্রকাশ করেছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। গল্পটি প্রথম দিকের গল্পের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গল্প। যে বোধটি এই সমাজে মানুষকে সবচেয়ে বেশি চালিত তাড়িত এবং নিয়ন্ত্রিত করে তাহল নিরাপত্তা-বোধের জন্য ব্যাকুলতা। সেই জরুরী সত্যটি একজন দক্ষ লেখকের কলমে 'সরীসৃপ' গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'সরীসৃপ' গল্পটি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা বাংলা সাহিত্যে হয়েছে।

আমার মনে হয় যৌনতা নয়, আর্থিক নিরাপত্তার অভাববোধ এই গল্পের দুটি প্রধান নারী চরিত্র চারুদর্শনা ও পরীরানীকে বিচিত্র আচরণে উদ্বোধিত ও চালিত করেছে। চারুদর্শনা ও পরীরানী দুজনেই সহোদরা, এই দুই সহোদরা বোনের করুণ পরিণতি ও তাদের অসঙ্গত আচরণের পেছনে কার্যকর ছিল তাদের অসহায়তা বোধ ও অনিরাপদ অবস্থা। চারুদর্শনার শ্বশুর রাম তারণ বিপুল অর্থ ব্যয় করে চারিদিকে বাগানযুক্ত যে বিশাল তিনতলা বাড়িটি করেছিলেন বিধবা চারুদর্শনা বিরুদ্ধ পরিবেশের আক্রমণে সম্পত্তি ঠিকঠাক পরিচালনা করার অক্ষমতায় সেই বাড়িটি বুদ্ধিহীনার মতো হারিয়ে বসে। বনমালী ছিল চারুর শ্বশুর রামতারণের মোসাহেব ও বন্ধুর ছেলে। চারুর স্বামী ছিল অর্ধপাগলা, রামতারণ সপ্তাহান্তে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে যাবার আগে পনের বছরের বনমালীকে রেখে যেত সতের বছরের চারুকে পাহারা দেবার জন্য। রামতারণ মারা যাবার পরও বনমালী এ বাড়িতে আসত এবং বিধবা চারুর অসহায়তার সুযোগে সে চারুর বিশাল সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করে। মাত্র

ত্রিশ হাজারে বন্ধক রেখে সুদ দিতে না পারার অভিযোগে চারুর বাড়িটি বনমালী অধিকার করে নেয়। বিচিত্র উপায়ে সে চারুকে, চারুর অর্ধপাগল পুত্র ভুবনকে এবং চারুর প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছোটবোন পরীকেও এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। বাড়িটি এইভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় চারু বনমালীকে তোষামোদ করে। তার নিজেরই বাড়িতে অনেকটা অতিথির মতো থেকে যায়। চারুর বোন পরী বিধবা হয়ে শিশুপুত্রকে সঙ্গে করে চারুর তথা বনমালীর আশ্রয়ে ওঠে। বনমালী একদিন নবযৌবনের বাসনা ও জয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে চারুকে মনে প্রাণে কামনা করত। চারু সেই কামনাকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিলেও কোনোদিন বনমালীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। কিন্তু পরীর পরিস্থিতি চারুর থেকে ভিন্ন ছিল কিছুটা, সে শ্বশুরবাড়ী হতে বিতাড়িত নিঃসম্বল। পরী তার নিরাপত্তাহীনতার তাড়নায় নিজের রূপ ও মোহিনী শক্তির উপর আস্থা রেখে বনমালীকে জয় করতে চায়, কেন না সে বুঝেছিল বনমালীকে এইভাবে জয় করতে পারলে সে তার নিজের অনিশ্চিত অনিরাপদ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। নিজেকে বনমালীর কাছে সুলভ করে তোলে সে, যা চারু কোনোদিন করেনি। পরীকে বনমালীর চারিদিকে বৃত্ত রচনা করতে দেখে চিন্তিত চারু আবিষ্কার করে যে বনমালী এক ঝড়বৃষ্টির রাতে পরীর খাটে। উদ্‌ভ্রান্ত চারু ভাবে যে সে কেন আগে বনমালীকে জয় করেনি। পরীর পুত্র বনমালীর কাছ থেকে সম্পত্তি পাবে, ভুবন বঞ্চিত হবে,—এই উন্মাদ চিন্তায় চারু পরীকে হত্যা করার জন্য কলেরার জীবাণুদূষিত পাত্রে তারকেশ্বরের নির্মাল্য দেয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার পরীর ছেলের কাছ থেকে নিজের ছেলের দিকে আনার জন্য সে কৌশলে পরীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আর নিজের ছেলে ভুবনের মাথায় ঠেকায় তারকেশ্বরের প্রসাদী ফুল। পরী নয়, চারুই কলেরায় মারা যায়, চারুর মৃত্যুর পর পরীকে বনমালী অবহেলা করতে আরম্ভ করে। বিভ্রান্ত পরী বহুভাবে বনমালীর ভ্রষ্ট মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। বনমালী ভুবনকে নিয়ে মেতে ওঠায়, ভুবনকে অন্য একটি ছোট বাড়ি দেবার প্রস্তাব করায় পরী প্রতিশোধপরায়না হয়ে আধ পাগল নির্বোধ ভুবনকে তার মায়ের কাছে পাঠাবার নাম করে বোম্বে মেলে তুলে দিয়ে আসে। এই কথা ট্রেনে তোলার সময় ভুবনকে পরী বলে যে পরদিন ছটার সময় ট্রেন থেকে দরকার হলে লাফিয়ে নেমে পড়েও যেন সে তার মায়ের কাছে চলে যায়। এইভাবে নিজের দিদির ছেলেকে মৃত্যুর দিকে পাঠিয়ে নিজের ছেলেটিকে সে বুকে করে রাখে। বাড়ি ফিরে আসে পরী। বনমালী তার ঘর থেকে তাকে উচ্ছেদ করে বাড়ির দাসী ও আশ্রিতাদের কাছে পুনর্বাসন করায়। বনমালীর মা হেমলতা ভুবনের কাজ করতে বললে বনমালী বলে "আপদ গেছে, যাক্।" "এই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে

সেটা সুন্দরবনের ওপরে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।”

আমাদের এই সমাজ, যেখানে বহুতর অসংগতি, অন্যায়, বঞ্চনা, মনুষ্যত্ব-হীনতায় মানুষেরা নানাভাবে পীড়িত, অসুস্থ বিপন্ন সেই সমাজের মানুষগুলিই মানিকের গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। ‘সরীসৃপ’ গল্পটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেক সমালোচক এ রকম মত পোষণ করেন যে পরীর প্রতি বনমালীর আগ্রহ কমে গিয়েছিল বলেই পরী নিজেকে বনমালীর কামনায় মেলে দিয়েছিল। এভাবে পরীর আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। আর চারু কোনও দিনই বনমালীর কাছে ধরা দেয়নি বলেই তার সম্পর্কে বনমালীর আকর্ষণ কমেনি; কিন্তু আমার মনে হয় সমস্যা বনমালীর আকর্ষণের নয়, সমস্যাটি হল নিরাপত্তার। দুটি অনিরাপদ নারীর আর্থিক নিরাপত্তা, তাদের নিজেদের ও নিজের নিজের সন্তানের নিরাপত্তা। পরীকে বনমালীর অঙ্কশায়িনী দেখে চারুর যে প্রতিক্রিয়া তা ভোলবার নয়।—“পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচরাইয়া কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল। কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন ঘর। কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়-না, পরীকে কিছু বলিলে বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে, দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে?”—পরী ও বনমালীর এই আচরণে ক্ষিপ্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়েও চারু কিছু বলতে পারে না তার কারণ, সে অনিরাপদ এবং বনমালীর চাতুর্যের কাছে অসহায়; আর এই চতুর বনমালীর কাছেই সে নিরাপত্তার জন্য কুণ্ঠিত। নিজেরই বাড়িতে সে পরবাসী। পরী তার রূপ মোহ দিয়ে বনমালীকে জয় করতে চেয়ে পারে না, তার এই জয়ের আগ্রহ-ও তার নিজের এবং নিজের ছেলের নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায়, ব্যগ্রতায়, নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুলতায়। গল্পটির আরো একটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি, তাহলো পুরুষ শাসিত এই সমাজে পুরুষের আশ্রয়হীনা দুটি নারী সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও শুধু চাতুর্যের অভাবে, এবং পুরুষ-নির্ভরতার মজ্জাগত অভ্যাসের কারণে কতখানি অনিরাপদ, অসহায় অবস্থায় তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য কী অদ্ভুত আচরণ করতে পারে, তার একটি তীব্র জরুরী সংবাদ লেখক পাঠককে দিয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের সব গল্পই যে ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন-বাদের দ্বারা প্রভাবিত, এর সমর্থন পাওয়া যায় না।

প্রাগৈতিহাসিক : পুনর্মূল্যায়ন

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বাঙলা সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ছোটগল্পের বই 'প্রাগৈতিহাসিক' বের হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে যে ছোটগল্পের বইটি কলকাতা থেকে বের হয়েছিল তার সাহিত্য-মূল্য ও প্রভাব এখনও অম্লান। তখন মানিক ছিলেন তরতাজা যুবক, বয়স উনত্রিশ। নিশ্চয়ই এর আগে থেকেই তিনি এই বইয়ের ছোটগল্পগুলি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। তাহলে মোটামুটিভাবে আমরা অনুমান করতে পারি পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স থেকেই তিনি এই বইয়ের গল্পগুলো লিখতে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপাতে ছাপাতে ত্রিশ দশকের শেষাশেষি গ্রন্থাকারে ছোটগল্পগুলো বের করার জন্য প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে ছাপাতে দিতে সম্মত হন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। থাকতেন টালিগঞ্জ পৈতৃক বাড়িতে। কোন্ কোন্ পত্রিকায় গল্পগুলো বের হয়েছিল তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও অপ্রকাশিত। তবে 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পটি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।

এসময় মানিকের মানসিক অবস্থার কথা জানা একান্ত প্রয়োজন, কারণ তাহলে 'প্রাগৈতিহাসিক' গ্রন্থভুক্ত ছোটগল্পগুলোর উপর ফ্রয়েডিয়ান প্রভাব কতদূর সঙ্গত তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে বা ছিটেফোঁটা প্রভাবের জন্য ত্রিশ দশকের মানিক-সাহিত্যের উপর প্রচণ্ড রকমের ফ্রয়েডিয়ান দোষ চাপিয়ে দেওয়ার ইতিহাসটাও ধরা পড়বে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এ সময় মানিক ছিলেন মূলত বেকার। দু বছরের জন্য 'Metropolitan Printing and Publishing Home Ltd.-এর অধীনে স্বল্প বেতনের কাজ করেছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা 'বঙ্গশ্রী'র সহসম্পাদকরূপে। সংসারে ছিল প্রচণ্ড আর্থিক চাপ। মৃগীরোগে ভুগছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য সামান্য টাকা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বড়দা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু বড়দা টাকা পাঠান নি। মৃগীরোগের চিকিৎসা ভালভাবে হয়নি। এই অল্প বয়সেই সংসারের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত দিয়েছিল। সাংসারিক এবং পারিবারিক টান ছিল তাঁর প্রবল। এসময় তিনি বিয়ে করেন নি। সুস্থ ভালবাসার প্রতি ছিল চাপা আকর্ষণ। জনৈক পাঠিকাকে তিনি 'জননী' বই পাঠান। এই পাঠিকা চিঠি লেখেন। উত্তরে মানিক এক জায়গায় লেখেন 'আকাশে পৃথিবী নেই—পৃথিবীতে আকাশ আছে।' একদিকে বাস্তবতা, কঠোর বাস্তবতা। তার প্রমাণ এই চিঠিতেই আছে। তিনি লেখেন 'মেয়েপুরুষ অনেকের

সঙ্গেই আমাকে পরিচিত হতে হয়, দেখি যে সব প্রায় এক ছাঁচে ঢালা—অবোধ, অগভীর, অনাবশ্যক, অর্থহীন, রক্তমাংসের বিকৃত যন্ত্র।' অপর দিকে রোমান্টিকতা। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে মানিকের মানসিকতা ক্ষত-বিক্ষত। তিনি মীমাংসা খুঁজে পান না বলেই পাঠিকাকে জানান, 'আমরা পৃথিবীর জীব—আমাদের পথ পৃথিবীর ধুলার পথ। পথিক আকাশের। আমরা চলি পৃথিবীর পথে—খুঁজি আকাশের পথিককে।' তারপর লিখেছেন, 'এইটুকু সান্ত্বনা মানুষের আছে কিন্তু পথ না পথিক তার জন্য এগিয়ে চলি। এ সমস্যার কি মীমাংসা আছে!' এ সময়ে মানিকের মানসিক দ্বন্দ্ব 'রক্তমাংসের বিকৃত যন্ত্র' এবং 'পথিক আকাশের' মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরকম দ্বন্দ্বের অবস্থান জনৈক পাঠিকা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি কি মানিককে লিখেছিলেন, 'স্নেহ প্রেম দয়া মায়ার মাঝে কোন এক উদাসী অহোরাত্র বসে বাঁশি বাজায়—এ বাঁশীর সুর কি আপনি সকলকে শোনাবেন না?' অতসী মামী ছোটগল্পটির কথা মনে করিয়ে দেয়। একদিকে যক্ষ্মা, অপরদিকে যক্ষ্মা-রোগীর বাঁশীর সুর। শুধু ফ্রয়েডিয়ান নয়, কঠোর বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার দ্বন্দ্ব ত্রিশ দশকের মানিক-সাহিত্যের মূলদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে রোমান্টিকতা পরাজয় বরণ করে, কঠোর বাস্তবতা পথ খুঁজে বেড়ায়। ঐ চিঠিতেই মানিক লেখেন 'একথা বলাই বাহুল্য যে আমরা পথিক নই—আমরা শুধু পথ চলি তখন।' মানিকের বয়স সাতাশ কি আটাশ হবে। সাতাশ বা আটাশের মানিক বুঝতে পারেন বাস্তবতার পথ 'আকাশে পৃথিবী নেই' ধরেই তাকে চলতে হবে।

ত্রিশ দশকের বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে হলে তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে বুঝতে হবে। বৃটিশ শাসিত অখণ্ড বাংলাদেশ। একদিকে বৃটিশের অপশাসন এবং অত্যাচার, অপরদিকে স্বদেশী আন্দোলন, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ। একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, অপরদিকে কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের রাজত্ব। ফলতঃ বেঙ্গল চটকলে শ্রমিকদের ধর্মঘট। সারা ভারতে চারশোটি কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। গুপ্ত সমিতি ও চট্টগ্রাম রিপাবলিকান সৈন্য বাহিনী গঠিত। অর্থনৈতিক সংকট ও দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অসন্তোষ।

এ সময় কৃষক ও শ্রমিকদের ব্যাপক দারিদ্র খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বেকার দেখা দিয়েছিল। কৃষি এলাকায় জনাধিক্যের ফলে ভাড়া করা প্রতি খণ্ড জমির জন্য ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংকটাপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছিল। এরকম অবস্থায় জমিদার, তালুকদার ও ধনী কৃষকরা খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। শহরে সামান্য পণ্যউৎপাদক ও ছোটকারখানাগুলো বিধ্বংসী সংকটের মুখে।

ত্রিশ দশকের অন্তর্গত 'প্রাগৈতিহাসিক' নামক ছোটগল্পের বইটির উপর সে-

সময়ের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পড়েনি ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সমাজ-বাস্তবতায় যে চরমতম চিড় ধরেছিল তার পরোক্ষ প্রভাব কার্যকারণহীনভাবে পড়েছিল ছোটগল্পগুলোতে। তখনও পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের সাথে উৎপাদন, অর্থ ও রাজনীতির সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারেন নি। সেটা মানিকের স্বীকারোক্তিতেই বুঝতে পারা যায়, 'আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর সম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম।'

তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ছিল তার সহজাত। ফলত মানিক বুঝেছিলেন একমাত্র জীবনের অভিজ্ঞতাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীকে প্রসারিত করে। সেজন্য ত্রিশদশকের রচনায় লক্ষ্য করা যায় যে তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গল্পের বিষয়বস্তু গ্রহণ করে নিজস্ব ধ্যান ধারণাকে এস্টাব্লিশড করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি দেখেছেন, গ্রামগঞ্জের মানুষকে চুরি করে, ডাকাতি করে খেতে হয়; বাপকে সর্বস্ব দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়; টাকা-পয়সা পেলে শ্রেণীচ্যুত সংগ্রামী মানুষের সংস্বভাব পাল্টে যায়, শিক্ষিত পরিবারে নারী নির্যাতিত হয়; পয়সা ও সম্পত্তির প্রতি দাসত্ব রক্তের সম্পর্ককে তিক্ত করে দেয়; বেকারের তীব্রতায় মানুষ হয়ে যায় অমানুষ; পণপ্রথার ও বেকার-সমস্যার চাপে মানুষ হয়ে যায় রক্তমাংসের বিকৃতযন্ত্র যার ফলে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্ব বিতর্কিত হয়ে যায়। এসব কঠোর বাস্তবতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছেন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল এই কঠোর বাস্তবতাকে তখনও পর্যন্ত মানিক বুঝে উঠতে পারেন নি। সেজন্য ত্রিশ দশকের কোন কোন ছোটগল্পে তিনি ঈশ্বর ও নিয়তি ভাবনার ইতিবাচকতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। কিভাবে মানিক বন্দোপাধ্যায় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন যা ত্রিশ দশকের সামাজিক ইতিহাসকে তুলে ধরে, 'প্রাগৈতিহাসিক' বইটির প্রত্যেকটি ছোটগল্প আলোচনা করলে তা স্পষ্ট হবে।

এই বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। এই ছোটগল্পটি বইয়ের প্রথমে থাকলেও শেষে আলোচনা করবো। পরের ছোটগল্পটি 'চোর'। মধুর জীবিকা চুরি করা। মধু রাখালের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ভাবে, 'চুরি করার মধ্যে আর সে দোষের কিছু দেখিতে পাইল না। ভাবিল, কিসের পাপ? জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।' এমন কি ওর প্রিয় বৌ কাঁদুও দারিদ্র সহ্য করতে না পেরে চুরি করে দেহ দেয় রাখালের বড় ছেলে পান্নাকে। বৌ-এর স্বভাব মধু যখন জানতে, বুঝতে পারলো তখন 'সহসা মধু বীভৎস হাসি হাসিল।' গল্পটি এখানেই শেষ হলে শৈল্পিক গুণে সার্থক হতো। কাঁদু কি লিবিডো-তাড়িত? না, সংগ্রামবিমুখ কাঁদু দারিদ্রের জ্বালা সহ্য করতে পারে নি বলেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে। সুখে থাকার লোভ দুর্বলচিত্ত নারীকে

মোহিত করে তোলে। মধ্যবিত্ত নারীর সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ এখানে আরোপিত। এই ছোটগল্পটি ১৯৩৭ সালে রাধামোহন ভট্টাচার্য অনুবাদ করেন ইংরেজীতে। নাম রাখেন 'Thief'।

পণপ্রথার সামাজিক বিফলতার সোচ্চারিত প্রকাশ গল্পে শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলমে। তিনিই পণপ্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প লেখেন যথা, 'দেনাপাওনা' এবং 'অপরিচিতা'। তারপর থেকে পণ-প্রথার সামাজিক বিফলকে বিষয়বস্তু করে অনেকেই গল্প লিখেছেন। শুরু হয়েছিল ১৮৯১ সাল থেকে, 'দেনাপাওনা' লেখার পর থেকে যা এখনও লেখা চলছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাত্রা' ছোটগল্পটি বিংশশতাব্দীর ত্রিশ দশকের পণপ্রথার ডকুমেণ্টাল ভাষা-চিত্র। এখনও বিয়ের কার্ডে লাল ও সোনালি অক্ষরে লেখা হয় 'শুভ বিবাহ'। এই লেখাটা যে কতবড় মর্মন্তুদ তা ভাষায় প্রকাশ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'যাত্রা' ছোটগল্পে। ছোটগল্পটি বলছে, "তেরো বিঘা ধানের জমি কবে মুক্ত হইবে কে জানে"। পড়ে মনে হবে এ তো পণপ্রথার মামুলি ভাষা-চিত্র। ত্রিশ দশকে যুবক মানিকের কলম কত বলিষ্ঠ ছিল সেটা বোঝানো যাবে না যদি না উল্লেখ করি এই গল্পের পরিণতিটুকু। বিয়ে হয়ে গেছে। ইন্দু এবার শ্বশুর বাড়ি যাত্রা করছে। পাল্কিতে ওঠার আগে অসুস্থ ভাইয়ের চিকিৎসা কন্যাদায়গ্রস্ত নিঃস্ব বাবা করতে পারবেন কিনা, একথা ভাবতে ভাবতে ইন্দু মূর্ছা যায়। তা দেখে শ্বশুর বলে উঠলেন, 'এ কি কাণ্ড মশাই? ফাঁকি দিয়ে একটি মৃগী রোগীকে ঘাড়ে চাপালেন?' অতএব মৃগীরোগীকে চিকিৎসা করবার জন্য শ্বশুরমশাই আরও অতিরিক্ত পাঁচশ টাকা দাবি করলেন। 'রফা হইল তিনশ টাকায়' এবং পাল্কিতে ওঠার আগেই অতিরিক্ত এই ঘুষ মেয়ের বাবাকে দিতে হল, মেয়েকে জানানো হল না। 'মেয়ের শুভ বিবাহে শুভ যে কাহার হইল তাহাই ভাবনার বিষয়।' গল্পের শেষে আছে চিতার অপূর্ব চিত্র-কল্পতা। পণপ্রথার বলি মেয়ের বাবার হৃদয়ে শ্মশানে শোকের চিতা, বেদনার চিতা। দাউ দাউ জ্বলছে, চির বহমান এই শিখা। সেই চিতা দেখে পণপ্রথার সমর্থক স্বামীর ভণ্ডামী বুঝে নিতে কষ্ট হয় না বুদ্ধিমতী ইন্দুর, যখন গল্পের শেষে স্বামী হরেন বলে, 'পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমায় আমায় খুব মনের মিল হবে। হবে না?' ইন্দুর হয়ে মানিক উত্তর দিচ্ছেন 'যেন চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকি থাকিত।' বাবার মনে চিতা জ্বালিয়ে দিয়ে এখন উনি মনের মিল খুঁজছেন! এমত ভাবনারই প্রতীকি ঐ চিতা। বিদ্যাসাগর রচিত 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'য় দেখতে পাই শকুন্তলার অবৈধ গর্ভ-ভাবনার বিষাদগ্রস্ত মুখের ছবি। আর এখানে দেখতে পাই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার কুফলতাজনিত বিষাদ- গ্রস্ত ইন্দুর মুখের ছবি।

"প্রকৃতি" ছোটগল্পটি মিথ্যা প্রমাণিত করে মানিকের অপবাদটি যে তিনি

প্রথম পর্বে ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

যদিও আগের দুটি গল্পতেও তার কোন প্রমাণ নেই, তবুও এই গল্পটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ, এই গল্পে শ্রেণীচেতনার বীজ রোপিত হয়ে আছে। ফর্মের দিক থেকে প্রায় নিখুঁত এই ছোটগল্পটি প্রমাণ করে যে গল্প লেখার শুরু থেকেই তিনি সমাজের দুটি শ্রেণী ধনী ও দরিদ্রের আলাদা প্রকৃতির কথা ভেবে এসেছেন। 'সমাজের শ্রেণীবৈষম্যই মানুষের প্রকৃতিকে নির্ধারিত করে' ছোট গল্পের এই বোধই পরবর্তীকালে মানিককে মার্কসীয় পথের সন্ধান দেয়। 'প্রকৃতি' ছোটগল্পে আছে, 'অর্থের অন্যায় অসমান বিতরণের পাপ যাদের দিয়া জীবনব্যাপী বীভৎস প্রায়শ্চিত্ত করায় ইত্যাদি ইত্যাদি।' 'প্রকৃতি' ছোটগল্পের নায়ক অমৃত বড়লোক হওয়ার পর এসব ভাবে। যখন অমৃত একদা দারিদ্র-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত তখন সে এসব ভাবতো না। তখনকার মানিক লেখেন 'ধনী সমাজটার প্রতি চিরস্থায়ী বিদ্বেষে অমৃতের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে'

ভাবে, 'টাকা না থাকার চেয়ে টাকা থাকা তো কম ভয়ঙ্কর নয়।' ভাবে অমৃত, 'টাকার জন্য আজীবন ওরা (গরীব মধ্যবিত্ত মানুষ) লালায়িত থাকে, টাকার কাছে মাথা নীচু করিয়া জীবনের অনেক কিছু মহার্ঘ ওরা বিসর্জন দেয়, তবু টাকাকেই ওরা মানুষের একমাত্র মূল্য বলিয়া ধরিয়া রাখে না—মনুষ্যত্বের অন্য মর্যাদাও বোঝে।' সারা গল্পটাই অমৃতের ভাবনার স্রোতে এগিয়ে গেছে। মাঝে একটু গল্প। দশ বছর পর ঐশ্বর্যশালী অমৃত প্রমথবাবুর বাড়ি যায় তার দরিদ্র পরিবারকে দেখতে এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরে। প্রমথবাবুর বড়মেয়ে বিবাহিত সুনীতি অমৃতের পড়ে যাওয়া মানিব্যাগটা আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে এবং অমৃত সেটা বুঝতে পেরেও কিছু না বলে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফেরে। এবং এই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই stream of conciousness-এর স্টাইলে গল্প শেষ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠককে এই ধারণা দিয়ে 'ওদের (দরিদ্র শ্রেণীর) জন্য অমৃতের মনে গভীর মমতা আছে, আর আছে ওদের সান্নিধ্যের প্রতি নিবিড় ঘৃণা। দূর হইতে ওদের (দরিদ্র শ্রেণীর) মমতা করিবার মানসিক বিলাসিতাটুকু কম-বেশি কার না থাকে?'

নামকরণের তাৎপর্য ছোটগল্পে যে কতখানি শৈল্পিক ভূমিকা পালন করে তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করতেন বলেই, প্রতিটি ছোটগল্পের নামকরণ তিনি দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতেন। সার্থক নামকরণ নিখুঁত ছোটগল্পের শিল্পগুণ, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন 'ফাঁসি' ছোটগল্পে। গল্পের ফর্মটি এতোই বুদ্ধিদীপ্ত যে পাঠক স্থির করে ফেলেছেন, নারীঘটিত হত্যার দায়ে গণপতির ফাঁসি হবে। গণপতির বাবা রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন দুঁদে উকিল এবং তার দাদাও মস্তবড় উকিল। এহেন উকিল পরিবারের ছেলে গণপতি কিনা মিথ্যা খুনের জালে জড়িয়ে পড়ল। একমাত্র বুঝলো গণপতির স্ত্রী। বুঝলো,. এ তো পরিবারের অপমান, স্বামীর

অপমান এবং স্বামীর অপমান মানেই স্ত্রীর অপমান। ব্রিটিশ হাকিম রায় দিয়েছেন, গণপতির ফাঁসির বিরুদ্ধে আরও প্রমাণসাপেক্ষে আপীল চলবে। উকিল পরিবার গণপতিকে জামিনে খালাস করে এনে আপীল করবে মনস্থির করলো। বাড়িতে ফিরে গণপতি নতুনভাবে বাঁচার জন্য তৈরী হয় পরিবারের সকল অপমান দূরে সরিয়ে দিয়ে। কিন্তু রমা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না যে তার স্বামী ফাঁসির আসামী। এই অপমানকে সে মন থেকে সরাতে পারছে না। সে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে যায়। স্ত্রী তার মনের কথা অনেক রাত পর্যন্ত স্বামী গণপতিকে বোঝায়। গণপতিও ছেলেমানুষী স্ত্রীকে বোঝায় যে এ বাড়িতে থেকেই মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে মিথ্যাকে মুছে দিতে হবে। বোঝাবুঝিতে রাত বাড়ে, ক্লান্ত গণপতি ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর মানিক শেষ দুটি লাইন লিখে ছোটগল্পটি শেষ করেন, "পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকীলের বাড়িতে একটা বিরাট হৈ-চৈ শোনা গেল। বাড়ির মেজ বৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।" এমন সুন্দর সমাপ্তির কারুকার্য গোকি এবং চেখভকে মনে করিয়ে দেয়।

'ভূমিকম্প' ছোটগল্পটির পটভূমি বাস্তব অভিজ্ঞতা। মানিক-জীবনের একটি চরমতম দুঃখের ঘটনা হচ্ছে 'ভূমিকম্প' ছোটগল্পটির পরিপ্রেক্ষিত। মানিকের এক ভাই সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গেরে ব্যবসা করতেন। ১৯৩৪ সালে সেখানে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পে সুবোধবাবুর এক কন্যা মারা যায়। মানিক সংবাদপত্রে ভূমিকম্পের কথা জানতে পেরে মুঙ্গেরে চলে যান। মুঙ্গেরের বিধ্বংসী ভূমিকম্প এবং পারিবারিক দুর্ঘটনা মানিকের মানসিকতাকে আহত এবং মনকে ব্যথিত করে। সমাজের অনেক জটিলতা ও কুটিলতা মানুষের মনকেও ভূমিকম্পের মতো নাড়িয়ে দেয়। মানুষের মনকে তখন ভয় ঘিরে ফেলে। এরকমই একটি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভূমিকম্প' গল্পে। মানুষটির নাম প্রসন্ন। প্রসন্নের আত্মবিশ্লেষণের বিষয় হচ্ছে, কেন সে ভয় করে। এই ভয়টা ঢুকেছে তখন থেকে, যখন 'একবার মাঝরাতে বাসুকী মাথা নাড়িলেন। ভূমিকম্পে মার ডাকে সে জেগে ওঠে, কিন্তু ঘর থেকে বের হতে গিয়ে সে ঘরের দরজা হারিয়ে ফেলে। যখন সে বের হয়ে আসে তখন থেকে তার মধ্যে ঢুকেছে মৃত্যু ভয়। বন্ধ ঘর দেখলেই তার মধ্যে মৃত্যুভয় কাজ করে। প্রসন্নের বাসর-ঘরের দরজা বন্ধ করে যখন বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে যায় মেয়েরা কৌতুকতার জন্য, তখন প্রসন্ন বলে নব জায়াকে, 'এখুনি খুলে দিত বল। এসব কি? এসব আমি ভালবাসি না। নিরুপায় বউ চুপ করিয়া রহিল।' সাইকো-লোজিক্যাল গল্প। সামন্ততান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষের কথা ভেবেই হয়তো মানিক এই গল্প লিখেছেন। হয়তো রাজনৈতিক বিশ্লেষণের প্রবণতা সে সময় মানিকের মধ্যে ছিল না, কিন্তু গল্পতো সে পথেই যাচ্ছে। এই গল্পের

মধ্যেও মানিক পাঠকের মনে সমাজ চেতনার স্রোত বইয়ে দিয়েছেন।

মনস্তত্ত্বের উপর সমাজবাস্তবতার চুলচেরা বিচার করা হয়েছে 'অন্ধ' ছোটগল্পে। সনাতন মধ্যবিত্ত পরিবারের চাকুরীজীবী। মদ খাওয়াই তার একমাত্র নেশা। সনাতন নেশার লোভে স্ত্রীর বালা কেড়ে নিলে সাত বছরের মেয়েকে ফেলে রেখে স্ত্রী পালিয়ে যায়। পরে স্ত্রী মারা যায়। এরপর থেকে সনাতনের অভিমান বাড়ে, তৎসহ মদের নেশাও। মদের নেশা সনাতনের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এখান থেকেই গল্পের মনস্তাত্ত্বিকতা শুরু হয়। বড় দালান বাড়িতে বৃদ্ধ সনাতন বড়োই একা এখন। অন্ধ সনাতন বুঝতে পারে নির্জনতার অভিশাপ। মেয়েকে, জামাইকে, এমনকি মেয়ের শাশুড়িকেও কাছে এনে রাখে সনাতন। আম্নু নামে একটি কাজের মেয়েও আসে। একদিকে অর্থের লোভ, বাড়ির লোভ এবং অপরদিকে সেবাযত্ন, স্নেহ-মায়া-মমতা এ সবের জন্য পরের মেয়ে আন্নু ও নিজের মেয়ে মোহিনা দুজনের চরিত্র সনাতনের কাছে পাল্টে যায়। মোহিনী সনাতনের মন থেকে দূরে সরে যায়, আন্নু মনের কাছে চলে আসে। সনাতন অন্ধ, কিন্তু শরীরের ভেতর আরেক যে সনাতন বাস করে সে অন্ধ নয়। আমরা বুঝতে পারি গল্পের কথা, মান-অভিমান ক্ষুদ্র স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে রাখে এবং সমাজের বাস্তবতা মানুষকে জাগিয়ে রাখে। মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগে মার্কসীয় চেতনার প্রস্তুতি পর্বের প্রমাণ এই ছোটগল্পটি।

এই গল্পের বিজ্ঞানচেতনা, আত্মসমালোচনা, সমাজদর্পণ পাঠককে বিস্মিত করে, যখন পাঠক পড়েন, "প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকার বৈজ্ঞানিক শাসনে মোহিনী শাশুড়ী ননদের কাছে একদিন যা পাইয়াছিল এখন আন্নুকে তা ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করে।" বা 'নিজের দোষ স্বীকার করতে শেখো। শিখে অনুতাপ করো'। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স কতই বা, ত্রিশ অথবা ত্রিশ নয়। এ বয়সেই এতো তীক্ষ্ণ ঝাঁঝাল সামাজিক গন্ধ তিনি এ সময়ের প্রায় প্রতিটি ছোটগল্পে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। ডঃ নিতাই বসু মনে করেন এটি মনো-বিকারের গল্প। এটা তার ভুল সিদ্ধান্ত।

চাকরি নিয়ে দুই বন্ধুর গল্প, 'চাকরি'। বন্ধুদের নাম জয়গোপাল এবং মহেন্দ্রজিৎ। জয়গোপালের সংসারে বড়ই অভাব। কিন্তু মহেন্দ্রজিৎ স্বচ্ছল পরিবারের যুবক। শুধুমাত্র কৌশলে নয়, জয়গোপালকে প্রতারিত করে মহেন্দ্রজিৎ চাকরিটা পেয়ে যায়। কখনও কখনও গল্পে নিয়তিবাদের লক্ষণ ধরা পড়লেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতা থেকে গল্পের বিষয়কে সরিয়ে নিয়ে যান নি। গল্পের বাস্তবতা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি তির্যক। তবে নাটকীয়তা আছে। নাটকীয় ভংগিটি বাদ পড়লে গল্পের দেহ আরও সুঠাম হতো। তবুও গল্পে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া যায় যখন জয়গোপালের বাবা বলেন, "কলেজে পড়ার সময় তোর কত তেজ ছিল, সাহস ছিল, তুই এরকম হয়ে যাবি ভাবিনি বাপু।

ন্যায়সঙ্গত কাজ করতে আগে তো তোর লজ্জা হোত না ?” কিম্বা জয়গোপালের বোন মহেন্দ্রজিৎ-এর স্ত্রীকে শুনিয়ে দেয়, “দাদা কিছু করে না, চাকরি বাকরি খুঁজছে। কদিন আগে একটা ভাল চাকরি হয়েছিল, ছেলেবেলার এক বন্ধু বজ্জাতি করে নিজে চাকরিটা ভাওতা দিয়ে নিয়ে নিলে।” মহেন্দ্রজিৎ হচ্ছে ছেলেবেলার বন্ধু। ধনাকশ্রেণীর শঠতা, প্রতারণা, তাচ্ছিল্য, সন্দেহ, কৃত্রিম উদাসীনতা, অকৃত্রিম সেবাকে উমেদারি ভাবা এবং বিপরীতে গরীবের অসহায়তা, অকৃত্রিমতা, স্পষ্ট কথাবার্তা, প্রতিবাদের ভাষা, মানবিকতা—এসব দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতা গল্পের চরিত্রকে পাল্টে দিতে কিছুটা সাহায্য করেছে।

অর্থভাবনা অভাবী পরিবারকে কিভাবে কুৎসিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তোলে তারই পোস্টমর্টেম করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মাথার রহস্য’ ছোটগল্পে। এব গল্পটির মূল বিষয় পতিতপাবনের সঞ্চয় জীবনবীমার দুহাজার টাকা। টাকাতো নয়, পতিতপাবনের গায়ের রক্তের চেয়ে বেশী। সেই টাকাটা পতিতপাবন হারিয়ে ফেলেছেন। মানিক গল্প শুরু করেছেন, শেষ বয়সে একসঙ্গে থোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর পতিতপাবনের মাথাটা একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।’ এখান থেকেই শুরু হলো পতিতপাবনের মাথার রহস্য। ছেলে বলছে ‘ও তো বাবার ঢং। মাথা খারাপ হওয়ার ভান করছেন।’ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল একটি অভাবী পরিবারের নগ্ন শরীরটাকে কাটাছেঁড়া করে মানিক একের পর এক সমস্যা বের করে এনে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমস্যা এক : বয়স্ক মেয়ে পুচকির বিয়ে না হওয়ার মানসিক যন্ত্রণা ; সমস্যা দুই : বেকার ছেলে মাধবের ভবিষ্যৎ জীবন ; সমস্যা তিন : পরিবারের আর্থিক অনটন ; সমস্যা চার : রিটায়ার্ড বাবার টাকা হারাবার যন্ত্রণা ও পাগলামোর ভান। এসব সমস্যা বা এরচেয়ে বেশি সমস্যা শুধুমাত্র পতিতপাবনের পরিবারের নয় ত্রিশ দশকের কলকাতার প্রত্যেকটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারেরই সমস্যা যেন এক ঐতিহাসিক সামাজিক দলিল। আবারও বলি এ সময়ের গল্পে কখনও কখনও নিয়তিবাদ ঢুকে পড়েছে। ‘মাথার রহস্য’ ছোটগল্পটিও নিয়তিবাদ থেকে কি মুক্ত নয় ? এই গল্পে মানিক বলছেন, ‘পূজা, মানত ও মাদুলীর মধ্যে পূজা আর মানতগুলিই দেখা গেল সম্ভব, কিন্তু পতিতপাবনকে মাদুলি ধারণ করানোর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।’ নেতিবাচক নিয়তিবাদের লক্ষণ ধরা পড়লেও এই ছোটগল্পে পতিতপাবনের মধ্যে নিয়তিকে বা ঈশ্বরকে অস্বীকার করার ইতিবাচক মনোভাব বুঝতে পারা যায়। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গ্রন্থের কোন গল্পেই নিয়তিবাদকে মূল বিষয়বস্তু করেন নি। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের উপর ধর্মীয় প্রভাব মানিকের গল্পে প্রয়োজনে আসে যায়।

পতিতপাবনের মাথার রহস্যের জট ডাক্তার, কবিরাজ, পূজা, মানত, মাদুলী ইত্যাদি কোন কিছুর দ্বারাই খোলা যায়নি। খুললো পতিতপাবনের ছোটছেলে

যাদব এবং খুলতে গিয়ে যখন বুঝতে পারলো বাবার পাগলামোটা সম্পূর্ণ সাজানো ব্যাপার, তখন তার আঘাত সহ্য করতে না পেরে যাদবের মধ্যে দেখা দিল পাগলামোর লক্ষণ। শিক্ষিত বি এ. পাশ যাদব বাবার হারিয়ে-যাওয়া দুহাজার টাকার শোককে প্রশমিত করার জন্য তিন হাজার টাকা পণের লোভে কুৎসিত কালো মেয়েকে বিয়ে করেছিল নিজের আত্মিক সুখ বিসর্জন দিয়ে। এভাবেই মানিক যাদবের পাগলামোর যুক্তিটা রেখেছেন।

পঞ্চাশ বছর ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের আলোড়িত করে তুলেছে। এখনও এই ছোট গল্পটি নিয়ে গবেষণা চলছে। এই ছোটগল্পটি বহু বিতর্কিত, সমালোচিত এবং প্রশংসিত। এই ছোটগল্পটির আলোচনার পরিধি এত বিশাল যে আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্যে এমন আর দ্বিতীয় ছোটগল্প নেই যা এর বিশালতার পাশে দাঁড়াতে পারে। পাঠককে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পটি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে: তার একমাত্র কারণ কি ভিখুর জীবন? অবশ্যই।

এ ছাড়া আরও দুটি কারণ আছে। প্রথমটি হবে, এই সমাজে কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ভিখুর বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছে। ভিখুরই কথা, 'সে মরিতে চায় না।' দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ভিখুর এবং পাঁচীর গতিশীল ভালবাসা।

প্রাক্-ঐতিহাসিক জগতের বাসিন্দা এই ভিখু। এখনও পর্যন্ত আমাদের সমাজে প্রাক্-ঐতিহাসিক জগত আছে যেখানে ভিখুরা অন্ধকারে বাস করে। সভ্যতার আলো সেই অন্ধকার জগতে পৌছতে পারে নি। প্রাগৈতিহাসিক ছোটগল্পের স্মরণীয় চরিত্র ডাকাত ভিখু কি নেতিবাচক চরিত্র বা মরবিড চরিত্র নাকি ইতিবাচক চরিত্র যে চরিত্র সুস্থ জীবনের প্রত্যাশী? এ এক জটিল প্রশ্ন। এই গল্পে লক্ষ্য করা যায় ভিখুর দুটি জীবনধারা। যখন ভিখুর দুটি হাত ছিল তখন ভিখু একরকম জীবনযাপন করতো। যখন ভিখুর একটা হাত রইল, তখন ভিখু অন্য রকম জীবনযাপন করতো। আগে দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতো পরে দলবিচ্ছিন্ন একা একা অন্যরকম জীবনযাপন করে। এ ভাবেই ভিখুর রূপান্তরিত জীবন অন্ধকার জগত থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। ডাকাত থেকে হয় ভিক্ষুক। যৌনলিপ্সা থেকে সরে আসে প্রেমের কাছে। এ ভাবেই বাঁচার পরিবেশ ভিখুর জীবনকে পাল্টে দেয়। ভিখু যে দুটি খুন করেছে, তার একটির কারণ অর্থ নৈতিক। বাঁচার তাগিদে সে ডাকাতি করে, ডাকাতি করতে গিয়ে সে খুন করে। অপর খুনের কারণ প্রেম, না যৌনতাড়না এ নিয়ে তর্ক হতে পারে বা ফ্রয়েডকে স্মরণ করা যেতে পারে। পাঁচার প্রতি ভিখুর কিসের আকর্ষণ? প্রেমের, নাকি যৌনলিপ্সার? যদি যৌনলিপ্সা হয়, তাহলে পাঁচী কেন, সেখানে তো প্রধান হবে নারীদেহ। পাঁচী বলে আলাদা কোন নারীসত্তার প্রতি টান থাকতে পারে না, বিশেষ করে পাঁচীর একটা তৈলাক্ত দগদগে ঘা আছে যা কাম জাগায়,

না, ঘৃণা জাগায়। ভিখুর যৌনলিপ্সা মেটাবার জন্য তাহলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোন নারীচরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন কিন্তু তা করেন নি। কারণ তার ভিখু তার হাতে পরিবর্তিত হয়ে উঠছে। প্রাক্-ঐতিহাসিক জগতে তিনি আলো জ্বালাবার চেষ্টা করেছেন।

পাঁচীর প্রতি ভিখুর আকর্ষণ দেহ ভেদ করে মনেরই আকর্ষণ, শুদ্ধ ভালবাসার আকর্ষণ। তার প্রমাণ পাঁচীর পায়ে গা ঘিন্ ঘিন্-করা ঘা। পায়ের হাঁটুর নিচ হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তার থকথকে তৈলাক্ত ঘা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌন লিপ্সু করা বিকৃত রুচি ধারণ করে। ঘা এর চেয়ে যৌনক্ষুধাকে বড করে দেখে। কিন্তু ভিখুতো তা নয়। সে বলেছিলো ঘা'টাকে সারাতে। পাঁচী রাজি হয়নি। কারণ সারা জীবন বেঁচে থাকার মূলধন এই ঘা। এই ঘা'টা দেখিয়ে সে পয়সা উপার্জন করে ভিখুর চেয়ে বেশি। কিন্তু প্রেমের স্থান ঘৃণার উর্ধে। একসময় নারীদেহের প্রতি ভিখুর লোভ ছিল, যৌনক্ষুধা তাকে তাড়িত করতো। কিন্তু এখন তার সেই লোভ নেই, সে এখন একা দল থেকে বিচ্ছিন্ন। অপরিচিত জায়গায় সে একা ঘুরে বেড়ায়। অতীতের বেপরোয়া জীবনের কথা সে ভাবে। তার এখন ডান হাত নেই, সে হাতের জন্য আফশোস করে। এ ভাবেই অসহায় পরিবেশ তার দেহমনকে পাল্টে দেয়, তার মনে নিঃশব্দ পদচারণায় প্রেম প্রবেশ করে। সে এখন সুখ চায়, পারিবারিক সুখ। বিনু মাঝির সুখের দাম্পত্য জীবন দেখে তার হিংসে হয়, তাকে তোলপাড করে। ভিখু এখন আর নারীর দেহ চায় না, ভালবাসা চায়, পরিবার গড়তে চায়। একথা ভেবেই হয়তো মানিক লেখেন 'ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়।' এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রেমের উত্তাপ' ব্যবহার করেছেন, 'দেহের উত্তাপ' ব্যবহার করেন নি।

কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে ভিখু কিভাবে পাঁচীকে লাভ করবে? রক্ষিতা পাঁচী যে পুরুষটির অধীনে স্বামী-স্ত্রীর মতো আছে, সেই পুরুষমানুষটির শাসন ও কর্তৃত্বের বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে পাঁচীর প্রেম করা অর্থই পুরুষটির হাতে মৃত্যু! সেজন্য পাঁচী বলে, 'পারস তো যানা উহার সাথে লাগ না গিয়া।' পাঁচীর এই কথা প্রেমেরই নামান্তর। তাহলে কি পাঁচীও বসিরের শাসন কর্তৃত্বের বন্দী-শালা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে? নরনারীর স্বাধীন সত্তাইতো প্রেমের স্বভাব। পাঁচীর ঐ কথা ভিখুর পৌরুষে আঘাত করে। ভালবাসার প্রবল টান ভিখুকে আবার ফিরিয়ে দেয় প্রাগৈতিহাসিক জগৎ। এ যেন প্রাচীন প্রবাদ 'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা' সত্য হয়ে ফিরে আসে ভিখুর কাছে ত্রিশের দশকে। ভিখু পাঁচীকে পাওয়ার জন্য বসিরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। পুরুষশাসিত অশিক্ষিত সমাজে পণ্যমান নারীপ্রেমের এ এক অমোঘ পরিণতি। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় সীতা ও হেলেনের ভাগ্য ও পাঁচীর ভাগ্য এক হয়ে যায়, লড়াই করে নারীকে জয় করতে হয়।

ভিখুর বিতর্কিত চরিত্রের আরও কিছু পজিটিভ লক্ষণ ফুটে উঠেছে। যখন মানিক লেখেন, 'আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে', তখন নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে মানবসত্তার চিরকালীন সংগ্রামের কথা স্মরণ করায়। এখানে অন্ধকার জগতের বিরুদ্ধে ভিখুর মনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। ভিখুর চরিত্রকে অনেক সমালোচক বলেন মরবিড চরিত্র। এটা ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ ভিখু আশাবাদী। সে কখনও মনমরা বা বিষাদগ্রস্ত নয়। সে ভাবে, মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না, সেই অবস্থায় মানুষ সে, বাঁচিবেই। মরবিডিটির বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখুর প্রথম জীবনের যৌন তাড়নাকে প্রশ্রয় দেন নি। ভিখুকে তিনি ডাকাত থেকে যৌনলিপ্সা থেকে প্রেমিকে উন্নত করেছেন। পরবর্তী জীবনে মানিকের চোখে ভিখু হয়ে উঠেছে প্রেমিক। মানিক লেখেন, 'ভিখারিনী (পাঁচী) তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে।' এ ছাড়া প্রেমকে আরও অনুভব করা যায় যখন পড়ি, 'পায়ের ঘা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচী ?" খুনী ভিখু তাহলে অন্যের ব্যথা অনুভব করতে শিখেছে। এখানেই ভিখুর ডাকাতি ও খুনীর পরিচয় ভেংগে যায়। গড়ে ওঠে মানব মূর্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখুর চরিত্রের ডেভেলপমেণ্ট এমন একটা জায়গায় পৌছে দিয়েছেন যেখান ভিখু পাঠকের কাছ থেকে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ও সহানুভূতি আদায় করতে পারে। কিন্তু ক্ষমা ও সহানুভূতি পাঠকের ভিতরেই থেকে যায়। বেরিয়ে আসতে পারে না, দায়ী বসিরের নিষ্ঠুর মৃত্যুঘটনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরের মৃত্যুদৃশ্যে একটু সংযমী হলে পারতেন।

এই গল্পের মূল্যবান সংযোজন ভিক্ষুক সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ। ভিক্ষা জীবিকা একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং হীনমন্য অসহায় জীবিকা। ভিক্ষাজীবিকা ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কদর্য পরিণতি। এই সমাজ ব্যবস্থার প্রাচীন বুলি "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" যে কত অসার আর চরম অসত্য তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবুল করেছেন এই গল্পে। মূলধন ছাড়া যে অর্থ উপার্জন করা যায় না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেটা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। অতএব যারা ভিক্ষার দ্বারা অর্থ উপার্জন করে তাদেরও প্রয়োজন হয় মূলধনের। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে তিন প্রধান ভিখারীকে তুলে ধরেছেন মানিক, যথা, ভিখু পাঁচী এবং বসির। এই তিন ভিখারীর মূলধন ভিখুর নুলো ডান হাত, পাঁচীর পায়ের তৈলাক্ত দগ্‌দগে্‌ ঘা এবং বসিরের কাটা ডান পা। মানিক লিখেছেন ভিখুর নুলো হাত প্রসঙ্গে, 'শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সব চেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না।' পাঁচী প্রসঙ্গে লিখেছেন 'এই ঘায়ের জোরে সে (পাঁচী) ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সেজন্য

ঘা'টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।' বসির প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'একটি পা হাটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্ন সহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।'

যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক) 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পের আগে পটলডাঙার ভিখারীদের নিয়ে কিছু স্কেচধর্মী গল্প লিখেছিলেন। গল্পগুলো বের হয়েছিল কল্লোল পত্রিকায়। কল্লোল বেরিয়েছিল ১৯২৩ (১৩৩০) সালে, চলেছিল সাত বছর। ১৯৩০ সালেই কল্লোল উঠে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলের লেখক না হলেও কল্লোল পত্রিকার সাথে তার পরিচয় ছিল। যুবনাশ্বের গল্পগুলোর সাথে তাঁর পরিচয় থাকলেও থাকতে পারে। 'প্রাগৈতিহাসিক নামে গল্পের বইটি বের হয়েছিল ১৯৩৭-এ। যুবনাশ্বের লেখার ছয় সাত বছর পর প্রাগৈতিহাসিক ছোটগল্পটি বের হয়েছিল। তবে যুবনাশ্বের গল্প মানিককে প্রভাবিত করতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মূল্যবান মন্তব্য করেন। তিনি 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লেখেন 'কল্লোলে যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক) কিছু গল্প লিখেছিলেন পটলডাঙার ভিখারীদের নিয়ে। কালনেমি, গোষ্পদ, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি। কালনেমির সাথে কোথাও কোথাও বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। 'কালনেমি' গল্পের নায়ক ডাকু রেলে কাটা পড়ে কাজের বার হয়ে যায়। তারপর ময়নার যৌবনের টানে স্বামী স্ত্রী হয়ে থাকে পটলডাঙ্গার ভিখারী পাড়ায়। ডাকুকে রোজ রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দেয়। রতনা নামে আরেকটি যুবক ময়নার জুটে যায়। খোঁড়া ডাকু বলে, 'আমাকে একেবারে ফাঁকি দিস্ নে। দোহাই তোর একটি বার আসিস রেতে।' কিন্তু ভিখু আরও জীবন্ত, আরও বেপরোয়া, আরও বিদ্রোহী। যুবনাশ্বের ডাকুর মতো যৌনক্ষুধা কাতরতায় জীবনের ইতি টেনে দেয় নি।" অচিন্ত্যকুমার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করলেও দৃষ্টিভংগী দুই লেখকের সম্পূর্ণ আলাদা। যুবনাশ্ব দেখিয়েছেন ময়না ও ডাকুর পরিবার ছিল। রতনা সেটা ভেঙে দেয়। মানিক ভিখুর পরিবারকে দেখান নি, পরিবার গড়তে চাইছে ভিখু। যুবনাশ্বের গল্প দুর্বল, বাঁধন ঢিলেঢালা, কয়েক পাতার স্কেচ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বলিষ্ঠ, বাঁধন শক্ত, অসাধারণ যুক্তি এবং বিজ্ঞাননির্ভর। এ দুটি গল্পের তুলনা করে চলে না। তবে অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের দুটি কথা মূল্যবান। এক, ভিখু সমাজবাদী। যে সমাজ অন্নসংস্থান করতে পারে না, সেই ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে হয় সেই সমাজের বিরুদ্ধে ভিখুর বিদ্রোহ দেখে মনে হয় অচিন্ত্যকুমার এরকম মন্তব্য করেছেন। দুই, ভিখু ডাকুর মতো যৌনক্ষুধা কাতরতায় জীবনের ইতি টেনে দেয় নি। এরপরও যারা বলেন ভিখু মধ্যবিত্ত, ভিখুর মধ্যে ফ্রয়েড খুঁজে পাওয়া যায়, ভিখুর স্বভাবটাই নেতিবাচক এবং বিকৃত তাদেরকে আরও একবার বহুপঠিত এই ছোটগল্পটিকে ভেবে দেখতে বলি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের শেষে ঈশ্বর এবং সন্তানের কথা তুলেছেন। ভিখু

এবং পাঁচীর সন্তান। এটা ভিখু এবং পাঁচীকে নিয়ে পরিবার গড়ার সপক্ষে মানিকের বক্তব্যও বলা যায়। তিনি মনে করেন যে ওদের সন্তানও ভিখুর মতোই প্রাগৈতিহাসিক সমাজ রচনা করবে। ভিখু ও পাঁচী যে অন্ধকার নিয়ে এসেছিল এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে ভিখু এক সময় লড়াই চালায় সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য, তাদের সন্তানও সেভাবেই লড়াই চালিয়ে বেঁচে থাকবে, কিম্বা হয়তো অন্ধকারেই তলিয়ে যাবে। ত্রিশ দশকের এই মনোভাব 'পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই' চল্লিশ দশকে মানিকের মার্কসবাদ দীক্ষা পাল্টে দেয়। এই পৃথিবী ঈশ্বরের নয়, এই পৃথিবী শ্রমজীবী মানুষের। তারই আশ্বাসবাণী "তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দু'দিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূর গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে।"

পারিবারিক মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে 'ধানের ক্ষেত' এবং 'নবমীর চাঁদ' কথা দুটির যথার্থ প্রয়োগ আশা করি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

সোমেন চন্দের দুটি অবিস্মরণীয় ছোটগল্প — নারায়ণ চৌধুরী

ফ্যাসীবাদী ঘাতক দলের হস্তে নিহত বাংলার প্রথম শহীদ সোমেন চন্দ ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও শ্রমিক নেতা। আজ থেকে ৪০।৪৭ বছর আগে একই ব্যক্তিতে এরকম আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী ভূমিকার সমন্বয় খুবই বিরল ছিল। এ জাতীয় সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত আদৌ ছিল না বললেই চলে। তার কারণ তখনও পর্যন্ত আমাদের সাংস্কৃতিক মহলে এই সংস্কারই কম বেশী গ্রাহ্য ছিল যে, সাহিত্য শিল্প বা সংস্কৃতির সেবায় যিনি নিরত তাঁর পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ, সুতরাং দুষ্য। তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি এ দুয়ের মধ্যেও সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব। কেউ এরকম সামঞ্জস্য করতে গেলে তাঁর জীবনে বিপত্তি অনিবার্য।

বিপত্তি সোমেন চন্দের জীবনেও এসেছিল। বাইরে থেকে এই বিপত্তি তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল ফ্যাসিস্ত অপশক্তির আক্রমণের ফলে, যে-দুর্দৈব তাঁর এমন একটি চমৎকার এক্সপেরিমেণ্ট সফল করে তোলার উদ্যমটাকেই চিরতরে নষ্ট করে দিল। একই সঙ্গে সংস্কৃতি কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর সার্থক সমন্বয়ের একটি সুন্দর যুগ্মমূর্তি নিটোল রূপ পরিগ্রহ করার কিনারায় এসে যখন প্রায় উপনীত, তখন এক সাংঘাতিক বিপর্যয়ে আঘাতে-সংঘাতে গোটা সম্ভাবনাটাই চুরমার হয়ে গেল। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে ঢাকায় ফ্যাসী বিরোধী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রেলোয়ে শ্রমিকদের একটি মিছিল পরিচালনা করে সম্মেলন মণ্ডপের অভিমুখে নিয়ে আসার কালে সোমেন প্রতিপক্ষ এক রাজনৈতিক দলের গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নৃশংসভাবে নিহত হন। মনে হয় বাংলায়, শুধু বাংলায় কেন, গোটা ভারতবর্ষে সোমেন চন্দই হলেন ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের প্রথম বলি। রক্তরঞ্জিত লাল পতাকার আদর্শের বেদীমূলে আত্মাহুতি দেবার কালে সোমেন চন্দ ছিলেন মাত্র বাইশ বছরের নবযুবক।

সংস্কৃতি ফ্রণ্টে সোমেনের পরিচয়—সোমেন ছিলেন ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক। আর ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টে ছিলেন ই বি রেলোয়ে ওয়াকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক। এই দুই ভূমিকার তুলনামূলা বিচারে দেখা যায় তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টকে কেন্দ্র করেই সমধিক পরিণতি লাভ করেছিল, সেই তুলনায় তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ, যদিও ইতিমধ্যে বনস্পতি, সংকেত, দাঙ্গা, ইঁদুর জাতীয় কিছু উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের রচয়িতা হিসাবে ঢাকার প্রগতিবাদী তরুণ লেখক মহলে তাঁর খ্যাতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছিল। তবে পশ্চাদাবলোকনের সাহায্যে তাঁর প্রকাশ্য কৃতি ও কৃতিত্বের হিসাব নিলে দেখা যাবে, পাল্লাটা তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কিত কাজের

ধারার দিকেই সমধিক ঝুঁকেছিল। শ্রমজীবীদের শ্রেণীস্বার্থ ও ভাগ্যোন্নয়ন চেষ্টার কাজেই তিনি অধিকতর নিবেদিত চিত্ত ছিলেন। বিয়াল্লিশের ৮ই মার্চ তারিখের নারকীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত রেল শ্রমিক ও ঢাকেশ্বরী মিল শ্রমিকরা প্রতিরোধ গ্রহণের স্পৃহায় তাঁর জন্য জান দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তার থেকেই বোঝা যায় শ্রমিক বন্ধুদের চিত্তে তাঁর আসন কত সুদৃঢ় ছিল এবং তাঁরা তাঁকে কত ভালবাসতেন। এহেন শ্রমিক কল্যাণে উৎসর্গিত প্রাণ সোমেন তাঁর শ্রমিক দরদী কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেমন করে ইঁদুর, দাঙ্গা, বনস্পতি, সংকেত প্রভৃতি গল্পের ন্যায় শিল্প রসান্বিত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গল্প লিখতে পারলেন সেটা এক পরম বিস্ময়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও শ্রীদিলীপ মজুমদার সম্পাদিত 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ' সংকলনের মুখবন্ধে লিখেছেন— "সোমেন চন্দের নাম জানা ছিল, কিন্তু তাঁকে কখনও দেখিনি, কিংবা তখন তাঁর কোন লেখা পড়িও নি। পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া) যখন আইন-সম্মত হল তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দের লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি প্রথম পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার করে উঠল। হায় হায় এমন ছেলেকে রাজনৈতিক মন কষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেলল! সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিরাট্ স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন।"

এই মন্তব্যের শেষাংশে কমরেড মুজফ্‌ফর সোমেন চন্দের ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যে উজ্জ্বলতম প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত করেছেন তার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। যে-লেখকের কলম থেকে ২০।২১ বছর বয়ঃক্রমকাল মধ্যেই 'ইঁদুরের' মত এমন অসামান্য গল্প বেরতে পারে সেই লেখক বেঁচে থাকলে যে কী দুর্ধর্ষ লেখনীর অধিকারী হতে পারতেন তা চিন্তা করলেও হৃদয়ে শিহরণের অনুভব জাগে।

বয়সের সাযুজ্য, আদর্শের সমপ্রাণতা, বিশ্বাসের ঐক্য, প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, কর্মের আন্তরিকতা প্রভৃতি বিবিধ ব্যক্তিলক্ষণ বিচার করলে আরেকটি যে-নাম অবধারিত ভাবে সোমেনের নামের পাশে এসে হাজির হয় তিনি—সুকান্ত ভট্টাচার্য। ব্যক্তি বৈশিষ্টে ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বারূপ্যে দুইয়ের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল, শুধু তফাতের মধ্যে সাহিত্য চর্চার ব্যপদেশে একের বিচরণের ক্ষেত্র ছিল মূলতঃ কথা-সাহিত্য, অপরের মূলতঃ কাব্য; যদিও নাট্য-রচনায়ও উভয়ে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুকান্ত সোমেনের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিলেন, তবে তাঁদের দুজনারই মৃত্যুকালীন বয়স অল্প বিস্তর এক ছিল—একুশ-বাইশের মাঝামাঝি কোনও একটা সময়। সুকান্ত যদিও সোমেনের মত সন্ত্রাসের বলি হননি, তবে তাঁরও মৃত্যু এক হিসাবে শহীদের মৃত্যু, কেননা যে-বিগ্রহের বেদীমূলে তিনি তাঁর অমূল্য জীবনটি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তার নাম সাম্যবাদ। আর এই সাম্যবাদের ধ্যান-ধারণা আর অর্চনাতেই তাঁর প্রাণ এক অলিখিত তপশ্চারী একনিষ্ঠ সাধকের

মরণপণ ব্রত উদ্‌যাপনায় অবসিত হয়ে গেল। তিনি তাঁর হৃদয়পিণ্ডটি বৃন্ত থেকে সদ্য-উচ্ছিন্ন নীলোৎপলের মত উৎপাদনপূর্বক এক অমলিন আদর্শের সেবায় দান করে সংসার থেকে অকালে বিদায় নিলেন।

সোমেন ও সুকান্ত দুটি ভাই বড় সুন্দর একটি জুটি—এক বৃন্তে দুটি কুসুম। এক যুগল কুসুমের সুবাসের কোন তুলনা নেই।

যাই হোক, সোমেন চন্দের কথা হচ্ছিল, তাঁর কথাতেই ফিরে আসি।

সোমেন 'ইঁদুরের' মত এমন পাকা গল্প এত অল্প বয়সে লিখে উঠতে পারলেন কী করে? এমন নয় যে গল্পটি ত্রুটীমুক্ত। ত্রুটী আছে একাধিক। যেমন, কাহিনীর অনাবশ্যক বিস্তার, ছেঁড়া-ছেঁড়া এপিশোডিক ঘটনার কথন যেগুলির পরস্পরের ভিতর অপরিহার্য সংলগ্নতা নেই, যেমন এই গল্পের বুননের ভিতর বেমানান দার্শনিক ভাবুকতার আমদানি করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের প্রসঙ্গের উত্থাপন করা, (হয়ত এটা ব্যঙ্গোচ্ছলে করা হয়েছে তবু এর দরকার ছিল না), এই সব এবং এম্বিতর আরও এতাধিক ছাড়া-ছাড়া, টুকরো-টুকরো চিত্রমালার সংযোজনায় কাহিনীর গাঁথুনি জোরদার না হয়ে বরং আরও আলগা হয়েছে—কাহিনীর সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এতসব ত্রুটীবিচ্যুতি সত্ত্বেও বাঙালী শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন যাত্রার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কী গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিব্যক্ত করেছেন! গল্পের উপলক্ষ্য হলো একটি গরিব নিম্নবিত্ত ভদ্র পরিবারের দিনানুদৈনিক সংসার যাত্রার ধীর-স্থির-মন্থন লয়কে বিপর্যস্ত করে কিছুদিন যাবৎ ওই সংসারে ইঁদুরের উৎপাত এবং ওই উৎপাত দূরীকরণের জন্য একটি ইঁদুর-মারা-কল কেনার আবশ্যকতা সম্পর্কে সকলের একমত হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অস্বাচ্ছল্য হেতু কল-কেনার অসামর্থে পারিবারিক ব্যর্থতাবোধ ও অসন্তোষ, কিন্তু এই সামান্য উপলক্ষ্যটিকে অবলম্বন করেই লেখক সোমেন চন্দ বাঙালীর মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনাচরণের ছকের একটা সামগ্রিক চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ লিপিদক্ষতা ও মর্মভেদী মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার সাহায্যে। লেখক কৌশলে নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন তারই সমবয়সী বাড়ীর বড় ছেলে সুকুমারের বেশে এবং ওই ভূমিকায় আপনাকে স্থাপন করে তারই চোখ দিয়ে এবং তারই বাচনিকতায় গোটা কাহিনীটি বলিয়ে নিয়েছেন। লেখক এবং কথক এখানে এক দেহে লীন হয়ে গেছেন। কিন্তু কী অসামান্য অভিন্ন আইডেণ্টিফিকেশন! বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের চির দারিদ্র, নিত্য অভাবগ্রস্ততা, স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের আলো আঁধারির লীলা, সন্তান বাৎসল্য, ক্ষুধাতুরতা, বেকারত্বের জ্বালা, ধর্মীয় কুসংস্কারের পেছু টান, ক্ষয়-অবক্ষয়, রিক্ততা—সব যেন এই গল্পটির মধ্য দিয়ে 'ক্যালাইড্যাসকোপিক' ছবির মত পরের পর চিত্রহারের কায়দায় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কী গভীর বাস্তবানুসারী চিত্রণ! দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে।

গরিবের সংসারে কচিৎ-কখনও দুধ আনা হয়। বাচ্চাদের প্রয়োজনে এ দুধ কেনা হলেও সংসারের নিত্য-অনটনের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রায় বিলাসিতার সামিল। তবু সেই বহু কষ্টের পয়সায় কেনা দুধের ভাঁড় যখন একদিন একটা ধেঁড়ে ইঁদুর দুধ খেতে এসে সেটিকে উল্টে দিয়ে মাটিতে সাদা একটা সরু রেখাপাত সৃষ্টি করে চকিতে পালিয়ে গেল তারপরের ঘটনাবলী। গল্পের কথক সুকুমার বলছে—"দেখতে পেলাম, আমার মা'র পাতলা কোমল মুখখানি কেমন এক গভীর শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে. চোখ দুটি গরুর চোখের মতো করুণ, আর যেন পদ্মপাত্রে কয়েক ফোঁটা জল টল টল করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন।...দুধ যদি বিশেষ একটা খাদ্য হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে কখনো দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যদি অকস্মাৎ কোন কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করার অযোগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেললেন, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই।"

এর পরের ঘটনা আরও মর্মবিদারক। সুকুমারের বাবা যখন আপিস থেকে এসে ইঁদুরের দুধ নষ্ট করার বৃত্তান্ত শুনলেন তখন প্রথমটায় কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন, পরে স্ত্রীর উপরে অকারণে রেগে উঠে তাঁকে "শয়তান মাগী" ইত্যাকার যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে ওকে চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে বললেন। স্ত্রী তবু মূক অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তাকে "বেরো, এখুনি বেরিয়ে যা বলছি" বলে বার বার তাডনা করতে লাগলেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কেন এই অভাবনীয় আকস্মিক অর্থহীন ক্রোধের বিস্ফোরণ, নিদারুণ দারিদ্র প্রপীডিত মধ্যবিত্ত সংসারের কর্তাদের পদে পদে বিপর্যস্ত-লাঞ্ছিত-ব্যর্থতাবোধ ক্ষুব্ধ জীবনের বার্তা যাঁরা জানেন তাঁরাই শুধু তার মর্ম সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন, অন্য কারও পক্ষে তা ঠাহর করা সম্ভব নয়।

এরপর মা কী করলেন? মা নিরুপায়ের মত স্বামীর সম্মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ছেলের ঘরে এসে ঢুকলেন এবং "ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করলো। কেমন অসহায় দেখালো ওকে, ছোটবেলায় যাকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি তাঁকে এমনভাবে দেখে এখন কত ক্ষীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে।"

এর পরের কিছু অনুচ্ছেদ ডিঙিয়ে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় অনুপ্রবেশ। গল্পের কথক সুকুমার লিখছে—

"এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলাম। শুনতে পেলাম :বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, 'কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছো?'

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে! ভারী চমৎকার মনে হলো। মনে মনে

বাবাকে আমার বয়েস ফিরিয়ে দিলাম। ...যুবক সুকুমার একদিন তার বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চীৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

কনক? ও কনক?

'প্রৌঢ়া কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন উত্তর দিলেন না, কঁকিয়ে উঠলেন, কোনবার উঃ আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিম্নগামী হলাম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলাম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলাম। শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটলো।

পরের দিন ভোরের দৃশ্যান্তর।

পরদিন কার প্রাণখোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলাম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ীর ইটগুলি কাঁপছে।

বাবা বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই, উঠুন। আর কত ঘুমুবেন? সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায় কী? উঠুন।"

অপূর্ব! অনবদ্য এই পারিবারিক জীবননাট্যের একটুকরো ছবির চিলতেটুকু। সোমেন চন্দ যে কতবড় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনস্তাত্ত্বিক শিল্পী ছিলেন 'ইঁদুর' গল্পের এই অংশটির রূপায়ণের মধ্যে তার অনংশয় স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

আসলে 'ইঁদুর' গল্প রূপকের আড়ালে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বিষামৃতময় সংসারনাট্যের চিত্রায়ন শতবিধ অবদমন-পীড়ন-শোষণ-অত্যাচার-অবিচার-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-অনাচার মধ্যবিত্ত জীবনকে পদে-পদে কুড়ে খাচ্ছে। 'ইঁদুর' তারই প্রতীক। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের এমনতর মর্মান্তিক নিয়তি অবধারিত। আর এই অনিবার্যের বোধটিকেই গল্পটির ঘটনাবৃত্তের ভিতর অতিশয় নিপুণ করে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তবে কখনও কখনও এরই বিষের পাত্রের ধার ঘেঁষে অমৃতের ছিটেও লেগে থাকে—সোমেনের শিল্পীর তুলিকাপাত্রে তারও আভাস বয়ে আনা হয়েছে এই অনিন্দ্য গল্পটিতে। বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলির ভিতর সেই অমৃতেরই কতক ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে সুকুমারের বকলমে সোমেনের মন্তব্য: "দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে তবে তা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী।... বন্ধুকে এক ধোঁয়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলাম: "এরা কে জানো? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফল অনাদরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে, এরা তাই। এরা তৈরী করছে বাগান, অথচ ফুলের শোভা দেখেনি। পেটের ভিতর ছুঁচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নয়। পরিহাস! পরিহাস!"

'দাঙ্গা' গল্পটি 'ইঁদুর' গল্পের সমতুল্য মানবীয় রসের গল্প নয় তবে তারও আবেদন যথেষ্ট মূল্যবান। এই গল্পে মানবিকতার চিত্রণ অপেক্ষা তাত্ত্বিকতার দিকটি

সমধিক পরিস্ফুট। হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষ শ্রেণীস্বার্থে অভিন্ন, তাদের মধ্যে ধর্ম বা সম্প্রদায় গত বিরোধের কোন উপলক্ষ্যই থাকতে পারে না তবু দেখা যায় কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায় মাঝেমাঝেই তাদের ভিতর অনর্থক দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারামারি-কাটাকাটি রক্তারক্তি বেঁধে যায় এই তথাকথিত ধর্মীয় সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই। এরই নাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা যারা বাধায় তারা সব উপরতলার জীব, তাদের ভিতর হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকও আছে। শোষিত নিপীড়িত খেটে খাওয়া মেহনতী শ্রেণীর মানুষেরা যেমন শ্রেণীস্বার্থে সব অভিন্ন এক জাতের লোক এরাও তেমনি সব শ্রেণীস্বার্থে অভিন্ন এক জাতের মানুষ। তবে এদের শ্রেণীস্বার্থ হলো শোষিত শ্রেণীর মানুষজনদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়ে দূর থেকে মজা দেখা এবং তা থেকে ষোল-আনা অর্থ নৈতিক ফায়দা তোলা। সমাজ গোল্লায় যাক জাহান্নামে যাক তাতে এদের কিছু যায় আসে না, শুধু নিজেদের স্বার্থের ষোলআনা গুছিয়ে নিতে পারলেই এরা সন্তুষ্ট। এবং সব কুচক্রীর দল তাদের ওই আত্মতৃপ্তি সংসাধনের জন্য অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ভ্রাতৃঘাতী হানাহানির সৃষ্টি করে স্রেফ আপন অস্তিত্ব রক্ষার গরজে এবং ছলে-বলে কৌশলে যে কোন-প্রকারে স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখে প্রাণান্তিক শ্রেণীস্বার্থের কুমন্ত্রণায়। ঠিক যেমন ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার ধ্রুব অভিসন্ধি থেকে ভেদ-নীতির আশ্রয়ে এদেশ শাসন করে গেছে বরাবর। তারাও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের কৌশল গুঁজে দিয়ে দুই সম্প্রদায়কে সতত কলহ-বিবাদে উদ্‌ব্যস্ত ও পরস্পর থেকে পৃথক রাখবার চেষ্টা করেছে।

ঠিক এই ভাবটিকেই 'দাঙ্গা' গল্পের মূল উপজীব্য করে তোলা হয়েছে এবং একটি হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই ভাইয়ের মতাদর্শগত বিরোধের মধ্য দিয়ে তাকে একটা তাত্ত্বিক আচ্ছাদন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়াসটি শিল্পগত ভাবে যত-না তার চেয়ে বুদ্ধিগতভাবে সমধিক সুফলপ্রসূ হয়েছে বলা যায়। কেন না তত্ত্ব গল্পটির মূলকায়াকে একপ্রকার ঢেকে দিয়েছে বললেও অন্যায় বলা হয় না। এছাড়া দাঙ্গার বিস্তারে গুজবের বিধ্বংসী ভূমিকা, জনগণের একাংশের মধ্যে দাঙ্গাকে একটা 'স্পোর্ট' হিসাবে গ্রহণ করার মানসিকতা (অবশ্য দাঙ্গার আঁচ যতক্ষণ না নিজের গায়ে এসে লাগে ততক্ষণ)—এ সবও কাহিনীর ঘটনায়নের ধারার ভিতর কৌশলে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছে।

ছোটভাই অজু অর্থাৎ অজয় এক কট্টর হিন্দু মহাসভাপন্থী যুবক, মুসলমানী অত্যাচারের তাত্ত্বিক সমর্থন সে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে হিন্দু জঙ্গীবাদের ('শভিনিজম') ভাবনা-ধারণার মধ্যে। পক্ষান্তরে বড় ভাই অশোক ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির যুবক এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের কল্যাণে তার এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল যে দাঙ্গা বাঁধানোর পিছনে থাকে স্বার্থান্ধ চক্রান্তকারীর

দল যায়। জাতিতে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। পরন্তু মনুষ্যাকারে হাঙর বললেই যাদের সঠিক বর্ণনা দেওয়া হয়। এই সব মনুষ্যবিরোধী, সভ্যতা বিরোধী মতলবী সমাজশত্রুরাই হলো দাঙ্গার আসল নায়ক। অশোক এটা জানে বলেই সে দাঙ্গার মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যেই তার আসল কারণানুসন্ধানের সূত্রটি খুঁজে পায়। অজয় ও অশোকের ভাবদ্বন্দ্ব যেন পরবর্তীকালীন উপন্যাস জাগরীর (সতীনাথ ভাদুড়ী কৃত) নীলু ও বিলুর ভাবদ্বন্দ্বের একটা অগ্রিম প্রতিরূপক। তবে ছকটি সেখানে উল্টানো, এই যা তফাৎ।

সোমেন-বর্ণিত দাঙ্গা ঢাকা শহরের পৃষ্ঠপটে সংঘটিত। তবে ওই দাঙ্গা ভারতের যে-কোন শহরে সংস্থাপন করা যেতে পারে। মোরদাবাদ, মীরাট আমেদাবাদ, দিল্লী, কলকাতা, বহরমপুর—সর্বত্র দাঙ্গার এক চেহারা।

কৃষণ চন্দরের গল্প

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙালী গল্পভুক পাঠকের কাছে ভিন্-প্রদেশের যে-কজন লেখকের নাম বেশ পরিচিত, তাঁদের মধ্যে মুন্সী প্রেমচন্দ্ ও কৃষণ চন্দর অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। দুজনের মধ্যে কিছু মিলও আছে। প্রেমচন্দ হিন্দী সাহিত্যের সেরা লেখক হলেও সারস্বত জীবন শুরু করেন উর্দু ভাষায়। তাঁর প্রথম গল্প চয়ন 'সোজেওতন' (জন্মভূমির জ্বালা) উর্দু গল্পের ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ধিক্কার, ঘৃণা, প্রতিশোধ সোচ্চার হয়ে ওঠার প্রেরণ ঐ গল্পচয়ন পাঠের ফলশ্রুতি। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেজন্যই বইটি নিষিদ্ধ করতে বিলম্ব করেনি। 'অনমল রতন' পুরনো রীতির গল্প, কিন্তু সেখানেও বক্তব্য নতুন— স্বাধীনতার আকাংক্ষাই সেরা রতন।

মনে রাখতে হবে, ১৯০৩ থেকে ১৯১৮-১৯ পর্যন্ত উর্দু কথাসাহিত্যে একটা প্রবল ভাঙা-গড়া চলেছিল। প্রেমচন্দ, মজনু গোরখপুরি, হজাব ইসমাইল, সাজ্জাদ হায়দর প্রভৃতি কথাসাহিত্যকে ঢেলে সাজালেন। তার পূর্বে উর্দুতে ছোটগল্প ছিল না। এই লেখকদের বলা হত 'রুমানবী' গোষ্ঠী। ঝরঝরে লেখা, পরিচ্ছন্ন প্রকাশভঙ্গি—কিন্তু পরিস্থিতি সৃজনে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব ঘটত। বাস্তবতা বিষয়ে তেমন আগ্রহও ছিল না। প্রেমচন্দ অল্পদিনেই 'রুমানবী' সীমা ছাড়িয়ে নেমে এলেন নির্মীয়মান বাস্তব জীবনের পটভূমিতে।

কৃষণ চন্দর ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তখন যুদ্ধ চলছে। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে কাশ্মীরে ও পুঞ্চে। হিন্দী শিক্ষিত সমাজের মুখের ভাষা, কিন্তু অনুশীলনের ভাষা উর্দু। আভিজাত্যের সঙ্গে তার যোগ। কৃষণজী অভিজাত সমাজে অবাধে মিশেছেন বাবার দৌলতে। অল্প বয়স থেকেই নাটকের নেশা সাহিত্যের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। বাবা-মা দুজনেই খরদৃষ্ট অভিভাবক। তবু তাঁদের নজর এড়িয়েই নাটক দেখা, ছবি আঁকা, সাহিত্য রচনা চলতে লাগল। এম. এ, এল. এল. বি কৃষণজীর রাজনীতির হাতে খড়ি হয় ভগত সিং গোষ্ঠীর গদরপার্টির সংস্পর্শে। হাওয়াই কিলা (১৯৩৬) রম্য রচনা থেকেই কৃষণজীর খ্যাতির বিস্তার। 'তিলিসম্-এ-খেয়াল', 'শিকাস্ত' থেকে 'ফুটপাথকে ফেরেশতে' পর্যন্ত কৃষণজীর কথাসাহিত্য জীবন-সংগ্রামী বাস্তবতা আত্মীকরণের পরিচয় দেয়।

এই সেদিনও জয়প্রকাশ নারায়ণ ও বিনোবাভাবে ভূদান আন্দোলন নিয়ে মেতেছিলেন। বস্তুত গান্ধীর অছিতত্ত্বই হল ভূদানের দার্শনিক ভিত্তিভূমি। ভূমিহীন ভূমি পাবে, জমিদারের হৃদয় বদলাবে। এ যে একধরণের আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র, তা দেখিয়েছেন কৃষণজী তাঁর 'ভূমিদান' গল্পে। নিকৃষ্ট পাথুরে জমি, জমিদারের পুরনো বাড়ির আনাচ-কানাচ—সেখানে নিশ্চিন্তে সাপের দল আড্ডা

গেড়েছে, সেই জমি দান করেছে জমিদার রামুকে। কারণ নোংরা সাফ করতে ঠিকেদার চেয়েছে তিন হাজার টাকা। কিভাবে শ্রমের বিনিময়ে সাপের আস্তানা এবং পোড়ো পাথুরে জমি হয়ে উঠল শস্য-শ্যামলা, কত স্বপ্ন রামুর। তবু ঋণে জর্জরিত রামুর সব গেল—শরীর, মন, দশাইয়া, জমি, ফসল এবং সবচেয়ে দামী পাট্টানামা। চাষীর ঘরে আগুন লাগাতে কোনদিন জমিদারের দ্বিধা হয়নি এবং পুলিশের এ বিষয়ে কিছুই করনায় নেই। রামু পাগল হয়ে গেছে। আচারিয়াজী বিচারিয়াজী আসলে কেনারাম সর্দার-গোত্রীয়। এই দুটি চরিত্রের এক্সপোজার, রামুর সততা এবং জমিদারের নির্লজ্জ রক্তচোষা স্বভাব নিপুণ কৌশলে বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত মানসিকতায় 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' এত ক্লিন্নভাবে সত্য যে, আমাদের মনুষ্যত্ববোধের গর্বও ধুলোয় মিশে যায়। 'লাষ্ট বাস' গল্পে একমুহূর্তেই সেই ক্লিন্নতা ধরা পড়েছে। আসনের বেশী যাত্রী যাবে না। নিয়মের কথা। দেশের যানবাহনের আইন। কণ্ডাক্টর আবেদন করছে, বাড়তি লোক নেমে যাও। কিন্তু লাষ্ট বাস যে, কেউই নামতে চায় না। অতঃপর সেই মুহূর্তটি এল। মধ্যবয়সী এক শিক্ষিকা তাঁর নাইটস্কুল সেরে হন্তদন্ত হয়ে এসে উঠেছেন। তিনিও বাড়তি আরোহী। কারণ আগেই আসনগুলি পূরণ হয়ে গেছে। মাহলার পক্ষে অতখান পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। পুলিশ আইন মোতাবেক জানাল, তাঁকে নেমে যেতে হবে। আবেদন করা হোল, কেউ স্বেচ্ছায় ঐ শিক্ষিকার জন্য জায়গা ছেড়ে হেঁটে যান। সকলেই উদাসীন, যেন কেউ শুনতে পাচ্ছে না, সকলেই জানলার বাইরে তাকিয়ে কি বন দেখছেন? শেষে একজন ক্লান্ত, জীর্ণশীর্ণ প্রতিবন্ধী রেলমজুর মহিলাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেমে গেল—ধন্যবাদের জন্যও পরোয়া করল না। 'আমার বন্ধুর ছেলে' গল্পটি শ্রেণীসচেতন লেখকের পর্যবেক্ষণের ফল। লেখকের বন্ধু কি রকম লোক? যাতে হাত দেয় সে, তাই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। মানে রুটি, চাল, সিমেণ্ট, লোহা, কাগজ, মোটর কারবাইড, লিপিষ্টিক—সবকিছুরই সে ব্ল্যাকমার্কেট করে। অনেক সৎপরামর্শ দেয়। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করলে সাহিত্য হয়ে পড়ে প্রচার পুস্তিকা—এই তার মত। অথচ তার নিজের কথা লিখলেও সেটা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে। গুলবাবু, রামপিয়ারী বা মিস্ সোফিয়া—একই মেয়েকে নানাজনে নানাভাবে ভোগ করেছে। বন্ধুর ছেলে হয়েছে ঐ বারবনিতার গর্ভে। বন্ধু পলাতক। লেখক তাঁর সন্ধান নিয়েছেন, জেনেছেন তার বর্তমান দুর্গতির কথা, তার ছেলের মনো-কষ্ট। ফয়েজের কবিতা আর বন্ধুর ছেলের হাতে ছুরি মস্তাজ আশ্চর্য রমণীয়। কি করে লঘুভার গল্প লিখবেন তিনি?

চাকু হাতে ছেলেটির ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অভিমানের মানে খুঁজতে গেলেই গল্প আর শৌখীন ফানুস থাকতে পারে না।

'শূন্য কবর' বিদেশের পটভূমিতে লেখা। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ। ইহুদীনিধন চলছে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বসেছে। ইহুদীদের দিয়েই তাদের কবর খোঁড়ানো হচ্ছে। আকাশ জুড়ে মানুষ-পোড়ানো ভাটিখানার বিশ্রী গন্ধ। লিবন লেখকের ভালোবাসার সৃষ্টি। সমাজতন্ত্রকে ভালোবাসার ফসল। লিবন কৌশলে বন্দী শিবিরের কাঁটাতার ডিঙিয়ে পালিয়েছিল। চাষীরা কোন ভয় বা বিরক্তি প্রকাশ করেনি লুকিয়ে রেখেছিল পালানো বন্দী লিবন উইলস্‌কে। কিন্তু লোকের ক্যাম্পের বাইরেও জগত আছে, সেখানে লালফৌজ আছে—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ফ্যাসী-বিরোধী লড়াই আছে। তাই যোসেফ হয়ে আবার লিবন ফিরে এসেছে। তবু চরিত্রের বদল হয়নি। সার্জেন্ট কাইটেল অনেক মানুষকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে—শেষে ঘাড় ধরে যোসেফ ওরফে লিবন শেখালো, স্বাধীনতার আকাংক্ষাকে, মনুষ্যত্বকে কখনো কবর দেওয়া যায় না।

এইরকম সব আশ্চর্য উজ্জ্বল গল্প উর্দু গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বাস্তব সত্যের দিকে। শুধু উর্দু কেন, বাংলা গল্পের পাঠকদেরকে এসব ছোটগল্প বাস্তবসত্যের কাছে নিয়ে এসেছে। কৃষণ চন্দরের বৈশিষ্ট্য—বেশি ভূমিকা না করে সরাসরি বিষয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়া; লু শুনের গল্প বলার ভঙ্গির সঙ্গে আশ্চর্য মিল। অবশ্য বলা যেতে পারে, সব বাস্তববাদী লেখকরাই লোকায়ত কথকতার রীতিকে গল্পে মান্য করেন, তাই সরাসরি জীবন থেকেই গল্প উঠে আসে। কৃষণ চন্দরের ছোটগল্পের বাংলায় অনুবাদ একটি বাড়তি পাওনা এই যে কেউ না ধরিয়ে দিলে বোঝার উপায় নেই, গল্পগুলি ভাষান্তরিত হয়েছে। যেখানে পরিবেশ অন্য, সেখানে ভিন্নপ্রদেশের নিসর্গ-বৈশিষ্ট্য তো থাকবেই যা বাঙালী পাঠকের সঙ্গে প্রতিবেশীর পরিচয় ঘটাবে। যেমন দাঁতনওয়ালা বা ইউক্যালিপ্‌টাসের শাখা। ভবঘুরে দাঁতনওয়ালাগোষ্ঠী বনে বনে দাঁতনযোগ্য ডাল কেটে সারাদিন জড়ো করে, তারপর হাটে বিক্রি করে বা সস্তায় মহাজনের হাতে তুলে দেয়। দাঁতনের যোগ্য ডালে ঘাটতি পড়লে আবার অন্য বনে যায়। এরকমই একজন দাঁতনওয়ালা চন্দা, তার সহযোগী কামিনা, তার বৌ। বউ গান গেয়ে গেয়ে দাঁতন বিক্রি করে। সবাই কেনে। তবু অভাব ঘোচে না। সামান্য আয়। কোনমতে চলে। কামিনার বাবার অসুখ; ডাক্তার দেখাতে পারছে না। টাকা নেই। দিন রুজি দিন খেয়ে চিকিৎসা চালানো যাচ্ছে না। এমন সময় এলেন নসরোয়ানজী। ধনী লোক, এ তল্লাটের মেহমান। অনেক জমিরও মালিক। ঘটনা গড়াতে লাগল অভাবের সূত্র ধরেই। চন্দার সোহাগের কামিনী পর হয়ে গেল। ছেড়ে গেল। চন্দার গভীর ভালোবাসাই কি সব নয়? ভালোবাসা কি খাদ্য? আশ্রয়? পরনের কাপড়? কামিনা শুধু ভালোবাসা নিয়েই বোধহয় টিকে থাকতে পারল না। প্রলোভন এসে পড়ল কিন্তু চন্দা সে আঘাত সহ্য করতে পারল না। সমুদ্রের গভীরে নিজেকে সঁপে দিল। নসরোয়ানজী বাঁচতে

বলেছিলেন, চন্দা কথা শোনেনি। গল্পটি লেখক বাঁচিয়েছেন—চন্দা জেনে মরেনি যে, নগরোয়ানজী কামিনাকে নিয়ে গেছেন।

ইউক্যালিপ্‌টাসের পাতা মাটির কাছাকাছি থাকে না। সমাজসেবী বা দেশব্রতী মানুষের মনও ঐ বনস্পতির মতো। তার আত্মমগ্ন মন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ভালোবাসার মাটি জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন। তার ফল ভালো না মন্দ, সে প্রশ্ন জরুরী নয়। জরুরী হল ভালো মানুষও তো নশ্বর, তাঁদের ভালোবাসা, আদর্শ, দেশব্রতই তো পরের প্রজন্মেও যথার্থ মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখবে। নতুবা একজন বা একাধিক সৎ ডাক্তার হলেই কি চারিপাশের আধি-ব্যাধির জগৎকে বদলানো যাবে! নিজের জীবন দিয়ে ডাক্তার যা বুঝেছেন, মানুষের মধ্যে তা সত্য হয়ে উঠুক। রোগীর সেবায় ব্যস্ত থাকুক মানুষ, কিন্তু ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে নয়। একেবারে সাধারণ গড়পড়তা বিষয়, কিন্তু সাহিত্যের লক্ষ্যমাত্রা এমন নৈপুণ্যে ধরে রেখেছেন লেখক যে গল্পটি মর্ম স্পর্শ করে। সরলা সুন্দরী যে নাজ্‌াঁকে দেখে ডাক্তারের তরুণ হৃদয় আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে যে ডাক্তার, কর্তব্যই তার সীমা, সেই এখন মন্ত্রী ফিরোজ চাঁদের রক্ষিতা। গোরাগহিলের নাজ্‌াঁ এখন বিলাসবতী। সুখে নয়. স্বেচ্ছায় নয়, গভীর দুঃখে। লেখকের অনুসরণে বর্ণনা—'সে এমন নীরব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল, যেন তার চোখের ভিতরে খুলে গেছে সোপান শ্রেণী। আর সে তাকে বলছে নেমে আসতে তার প্রাণের গভীরে।...'

'ফুলের রঙ লাল' পুরোদস্তুর কমিটেড রচনা। বলা যায়, রাজনৈতিক গল্প। তবু সার্থক, শিল্পোত্তীর্ণ। দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক চাচা ফজলুর ছেলে এক অন্ধ তরুণ এই গল্পের কেন্দ্রীয় ফোকাস। চারপাশে শ্রমিক, কারখানা, ধর্মঘট ইত্যাদি। ধর্মঘট বিরোধীদের অভিযোগ এবং তার উত্তর অবশ্যই রাজনৈতিক জবাব, যা গল্পের শরীরে ভালোভাবেই মানিয়ে গেছে। সিনেমার ছবি ও গান কেন জনপ্রিয় তার আলোচনা আছে। যা বাস্তবে অসম্ভব, স্বপ্নে তাকে চাই, সিনেমায় সেই স্বপ্নমুখ আলো ঝলমল রূপোলি পর্দায় চিত্রিত। সিনেমার গানের চটুল আনন্দই বা মন্দ কি। কিন্তু সিনেমার গানের নায়ক ও শ্রোতা উভয়েই বাস্তব পরিস্থিতির চাপে গণসংগীতে স্থায়ী আশ্রয়ভূমি পেল। অন্ধের কাছে চামেলির রঙও লাল. হৃদপিণ্ডের রঙ, রক্তের রঙ, পতাকার রঙ একাকার সবাই জীবনসত্যে এক।

'চাবুক' অন্য মেজাজের গল্প। টাকার 'পাহাড় জমানো মানুষের মূল্যবোধ থাকে না। আর ধনীলোকের বিলাসের অন্যতম উপকরণ তো নারীদেহ। কিন্তু কয়লা সিমেণ্ট লোহা ম্যাঙ্গানীজের রাজা লোক নেহাৎ খারাপ নয়। সে রেয়নের রাজা হয়ে বসে। কেবল ব্যক্তি স্বাধীনতা নামে একটা ভুয়ো ধারণা যা পৃথিবীতে কোথাও নেই, কোনদিন ছিল না তার জন্য চিৎকারটা রাজার অপছন্দ। তাই সাহসী সৎ সাংবাদিক রাহী পর্যন্ত রাজাকে নত হয়ে সেলাম জানিয়ে ব্যক্তি

স্বাধীনতার পক্ষে জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখেছে রাজারই কাগজে। একটিই শুধু তার মানসিক রোগ, স্যাডিজম্—সে সুন্দরী মেয়েদের ভালোবেসে চাবুক মারে, সুস্থ হলে অঢেল টাকা দেয়। টাকার লোভেই সুন্দরী মেয়েরা নগ্ন শরীরে চাবুক খেতে আসত স্বেচ্ছায়। রেয়ন রাজার ধারণা হয়ে গেলে, মেয়েদের সুখের জন্যই চাবুক মারাটা আবশ্যক। রজনীর মতো গেঁয়ো সরলা সুন্দরীর হাতেই চাবুক ন্যায়ের চাবুক হয়ে উঠল। তার স্বামীর বাড়ি, গাড়ি, নিজের বিজনেস চাই। সুতরাং তিন লাখ টাকা চাই। তার জন্য স্ত্রী রজনীকে রাজার কাছে পাঠালো রজনীর আপত্তি সত্ত্বেও। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নারী তো পণ্য, এমনকি স্বামীর কাছেও। কুশ্রী বাস্তব সত্য। গল্পের turning point সমাজসত্য উদ্ঘাটনে নয়, অন্য কোনখানে। রজনী স্বরাতেও নিজেকে হারায় নি। মনুষ্যত্ব ও আত্মরক্ষার জিদ প্রচণ্ড হয়ে উঠে তাকে সাহস দিয়েছে চাবুক কেড়ে নিয়ে রাজাকেই চাবুকে নাজেহাল করার।

এখনও তিনি কয়েক কোটি টাকার মালিক, অঙ্ক কেবলি লাফিয়ে চলে। কিন্তু মনে সর্বদা ভয়। চাবুকটা যে এখন অপরের হাতে। ছোট্ট একটি বাক্যের মোচড়ে গল্প নতুন মাত্রায় পৌঁছে গেল।

নতুন ঘাস পুরনো ঘাস, গর্ত, ককটেলও সামাজিক রসোত্তীর্ণ গল্প। প্রত্যেকটি গল্পেই কৃষণজীর সচেতন সজাগ সামাজিক মন এবং শিল্প চেতনা সমান সক্রিয়। লেখকের অজান্তেই দুইয়ের অন্বয় সাধিত হয়েছে। তবে চাঁদরুর পৃথিবী ছোট গল্পটি একটু ব্যতিক্রম। সরল প্রতিবন্ধীর কৈশোরক প্রেমের গল্প। কৃষণ চন্দরের মুখেই তার বক্তব্য শোনা যাক :

'যদিও জীবনের নাটকীয়তা ও দ্রুত পরিবর্তনশীলতার ওপর লেখা খুব দরকার, কিন্তু আমার ধারণা, জীবনের পরিবর্তন ও বিকাশ, যাকে আমরা বিপ্লব বলে থাকি, সেই পরিবর্তন ও বিকাশের এক মহান রূপ আছে। এই পরিবর্তন, এই বিপ্লব প্রাত্যহিক জীবনে খুব ধীরে ধীরে মৃদুভাবে এগোতে থাকে। সেজন্য যদি সাধারণ মানুষের জীবনের সাদাসিধে ছবিও আঁকি, সেটা জলরঙেই হোক কিংবা তেলরঙেই হোক, তাতে পরিবর্তন ও বিকাশের দিকটাই চোখে পড়বে। তাতে দারুণ তত্ত্বকথার সৃষ্টি না হোক, যা বুর্জোয়া সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে আমাদের শুনিয়ে আসছে, গল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে এবং তা অবশ্য করণীয়। উদাহরণ হিসাবে ও হেনরি ও মপাসাঁ যেখানে পৌঁচেছিলেন, গল্প এখন সেখানেই থেমে থাকতে পারে না। ওঁরা এখন আর গন্তব্যস্থল হয়ে নেই। পথের চিহ্ন হয়ে গেছেন। আমরাও একদিন এমনি পথের চিহ্ন হয়ে দাঁড়াব। একেই প্রগতি বলে, আর সেটাই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ গল্প।'

দেনাপাওনা : বিষামৃতের ফসল

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা বেরিয়েছিল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেড় মাসের মধ্যে সাতটি গল্প লিখেছিলেন। [রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ছ'টি গল্প। সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন সাতটি গল্প। কোনও সংখ্যাতে যে একাধিক গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল তা 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'জনৈক ব্রাহ্মণ' এইটুকু পরিচয়ের আড়ালে লেখা কোনও পাঠকের চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে। পরে বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে সুকুমার সেন মশাই অবশ্য জানিয়েছেন সংখ্যাটি ছয়ও হতে পারে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর প্রথমবারের দেওয়া সাতটি গল্পের নামই আমরা গ্রহণ করব।] কিন্তু পত্রিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক মাস তিনেকের বেশি স্থায়ী হয় নি। প্রভাতকুমারের মতে—

> কর্মকর্তাগণের ফরমাশ হইয়াছিল যে গল্পগুলি আরও লঘুভাবে লিখিলে ভালো হয়। তাঁহারা সাপ্তাহিকের জন্যে বোধহয় হালকা গল্প চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আর্টিষ্টের পক্ষে ফরমায়েশি গল্প লেখা অসম্ভব, অল্পদিনের মধ্যে হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।

কোন্ কোন্ গল্পের জন্য হিতবাদীর কর্মকর্তাদের অস্বস্তি হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। গল্পগুলির নাম হল দেনাপাওনা, পোষ্টমাস্টার, গিন্নী, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নর কীর্তি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা এবং খাতা। এ সব গল্পের বদলে আর কোন্ গল্প চেয়েছিলেন তাঁরা? 'হালকা গল্প' বলতেই বা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? আরও 'লঘুভাবে লিখিলে ভালো হয়' এরই বা অর্থ কি?

'হিতবাদী' প্রচারের জন্য একটি যৌথ কারবার গঠিত হয়েছিল। সে যৌথ কারবারে অংশীদারগণের মধ্যে ছিলেন নবীনচন্দ্র বড়াল, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ন' দিদি স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে চিঠিতে লিখেছিলেন :

> আমাদের 'হিতবাদী' বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫,০০০ টাকা মূলধন। ২৫০ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমলবাবুকে (ভট্টাচার্য) প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য

সম্পাদক এবং মোহিনীকে (চট্টোপাধ্যায়) রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।

আরও জানা যাচ্ছে যে পত্রিকার নামকরণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নামের সঙ্গে একটি Motts ও তিনি লিখে দেন। সেটি হল 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'— সেই বাক্য দুর্লভ যা একই সঙ্গে মনোহর অথচ হিতকারী।

যে সাতটি গল্প প্রকাশিত হতে না হতেই হিতবাদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হল তাতে যে কা এমন বিষয় ছিল তা আজকের পাঠকের বুঝে ওঠা কঠিন। এর মধ্যে শিল্পগুণে 'ব্যবধান' এবং 'গিন্নী' হয়ত উঁচুস্তরের নয়—কেননা গল্প দুটি যাঁদের মনে আছে তাঁরা ভেবে দেখবেন যে একমুখিনতা ছোটগল্পে প্রত্যাশিত তা 'ব্যবধানে' বা 'গিন্নী'তে নেই। কেননা 'ব্যবধান' গল্পে মামলার ফলের দ্বারা দুই পরিবারের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হবার সাতদিন পর একটা হতাশা ব্যক্ত হয়েছে। আর 'গিন্নী' ছোটগল্পে আশু নামে নিরীহ ভালমানুষ ছোট ছেলেটি 'গিন্নী' বলে নামকরণ করলেন পণ্ডিতমশাই। তার মানসিক কষ্টও অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে—সকলের সামনে নামকরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই—ছেলেদের তামাসায় সে কষ্ট আর কোনও চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছতে পারে না। অন্যদিকে পোষ্টমাস্টার, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, দেনাপাওনা, তারাপ্রসন্নর কীর্তি এবং খাতা নামের গল্পগুলিতে যে সহৃদয়তা প্রকাশিত হয়েছে, সাধারণ ও তুচ্ছতম মানুষের মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে অসাধারণ পরিচয় ধরা পড়েছে তার তুলনা নেই। তথাপি এ সব গল্পের মধ্যে এমন কিছু নতুন জিনিস ছিল যা সে আমলের কর্মকর্তাদের মনঃপূত হয় নি। এই নতুন উপাদানগুলির সন্ধান নেওয়ার সূত্রেই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত করব 'দেনাপাওনা' গল্পটির মধ্যে। তার আগে অন্য গল্পগুলি সম্পর্কেও একটু বলে নিই।

পোষ্টমাস্টার গল্পটিতে বালিকা রতনের কষ্ট উপলব্ধি করে কোনও সহৃদয় পাঠকের মনে কি প্রশ্ন জাগে নি যে সেই দরিদ্র অনাথা বালিকা যে পোষ্টমাস্টার বাবুর সঙ্গে তাঁদের কলকাতার বাড়িতে চলে আসতে চেয়েছিল তাকে কলকাতায় নিয়ে এলে কী এমন ক্ষতি হত? লক্ষ্য করা যাবে এদের মধ্যে কোনও প্রেমের প্রশ্ন সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। এদের মধ্যে কোনও আত্মীয়তা স্থাপনের প্রসঙ্গ যেমন দাদা ও বোনের সম্বন্ধ তাও এমন জায়গায় পৌছোয় নি যে এই স্নেহ সম্পর্কে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পোষ্টমাস্টার তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার প্রস্তাবে রাজী হবেন। একজন নিঃসঙ্গ মানুষ অপর এক অনাত্মীয় সঙ্গীহীনা বালিকা পরস্পরের কাছে এসেছিল শুধু সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষায় এ রকম ভাবলেও যা বোঝা যায় না তা যে এই ক্ষেত্রে এই সঙ্গ লাভ প্রত্যাশা বাড়ি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ব্যস্ত হল না

কেন? যদি বলা হয় যে এ গল্পে অন্য কোনও প্রসঙ্গ নয়, কেবল মনিব ও দাসীর প্রসঙ্গই বলা হয়েছে, শুধু এই বালিকা দাসী তার সরল হৃদয়টি নিয়ে দাসীর প্রত্যাশিত নিঃস্পৃহতার চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছিল, তার স্নেহ ও ভালবাসা পোষ্টমাস্টারকে ঘিরেই দানা বেঁধেছিল, সে পোষ্টমাস্টারকে অনুরোধ করেছিল তাদের বাড়াতে নিয়ে যাবার জন্য—তাহলেও বলা যায় কাজের লোককে বাইরে থেকে নিয়ে আসার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার থাকে না যে পোষ্টমাস্টার হেসে বলতে পারে 'সে কী করে হবে।'

পোষ্টমাস্টারের মনে কি একটা উভয়ের অবস্থান-পার্থক্য-জনিত মর্যাদাবোধ বা Status consciousness কাজ করছিল? ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে যদি প্রতিতুলনায় শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসের সতীশ সাবিত্রীর সম্পর্কের কথা ভাবি। সেখানে সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে না উঠতেই দেখি যে অবস্থান-পার্থক্যের চেতনা বা status consciousnes দুজনকে পীড়িত করেছে। মেসে সাবিত্রী তার অধিকারকে একটু প্রসারিত করে সতীশকে ভৎর্সনা করেছিল যে লেখাপড়ায় মন না দিয়ে মেসে অলস হয়ে পড়ে থেকে মেয়েদের আঁচল ধরে টানার মত ব্যাপার করাটা কোনও ভাল কথা নয়। এ কথা শুনে সতীশ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছিল:

> যা মুখে আসে তাই যে বল দেখচি? প্রশ্রয় পেলে শুধু কুকুরই মাথায় ওঠে না, মানুষকে মনে করিয়ে দিতে হয়।
>
> এ যে গালি গালাজ! সাবিত্রী মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, হয় বৈকি সতীশবাবু। না হলে আপনাকেই বা মনে করিয়ে দিতে হবে কেন, এটা ভদ্রলোকের বাসা, বৃন্দাবন নয়।

এ সব উক্তি-প্রত্যুক্তি, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক্রোধ-অনুতাপ--উপেক্ষা-অভিমান এ সবের টানাপোড়েন নিয়ে উপন্যাস অগ্রসর হয়ে কোন্ খাতে গিয়ে মিশেছে সে বিষয়ে পাঠকেরা অবগত আছেন। কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্ক যে গড়ে উঠতে পারে নি তার মূলে তাদের এই অবস্থান-পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতা। তারা হৃদয়ের দিক থেকেও এগিয়েও সামাজিক দিক থেকে এগোবার কথা ভাবে নি। কাজেই হৃদয়-সম্পর্কে বলবতী হয়ে সাবিত্রী মঙ্গল ও কল্যাণ-আকাজ্ক্ষায় যতটুকু ভৎর্সনা করেছিল তা মুহূর্তমধ্যে একটা বিষবাষ্প সৃষ্টিকারী পরিবেশে রূপান্তরিত হল।

এই অবস্থান-পার্থক্য, ভদ্রলোক ও কাজের লোকের এই শ্রেণীগত পার্থক্য এটা নতুন যুগেরই বৈশিষ্ট। যুগ মধ্য হলে সতীশ এরকম অবস্থায় হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপনের কথা চিন্তা না করে দাসী বা ঝিকে সোজাসুজি উপপত্নীরূপে পরিণত করতে যেত। কিন্তু নতুন যে যুগ মানুষকে সম্মান দিতে শিখেছে তাতে এ জাতীয় সম্পর্কের কথা সে চিন্তাই করতে পারে না—উপরন্তু পাছে এ জাতীয় চিন্তা অন্য কেউ করে

এ জন্য সর্বদাই সে এত অধীর হয়ে থাকত যে তা অনেকগুলি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব করেছিল। এসব কথা যাঁরা উপন্যাসটি পড়েছেন তাঁদের জানা আছে। 'পোষ্টমাস্টার' গল্পে এত কথার কোনও অবকাশ হয় নি যেমন সত্য তেমনি এ কথাও সত্য 'সে কী করে হবে' এই কথাটি বলার পর গল্পকারকে একটি পংক্তি লিখতে হয়েছে। তা এই—

> ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

'পোষ্টমাস্টার' গল্পের আবেদন এই অবস্থান-পার্থক্যের তুচ্ছতায় ছড়িয়ে গেছে। সেখানে বালিকা রতনের বেদনা পোষ্টমাস্টারের ব্যথিত হৃদয়ে যা শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা পেয়ে যায় তাকেই শুধু অতিক্রম করে যায় না—তার আর্তি পৃথিবীতে নিয়ত যে প্রিয়জন বিচ্ছেদ বেদনা অনুভূত হয় তার সঙ্গে মিশে যায়। তথাপি গল্পটি গড়ে তোলার পিছনে একদিকে হৃদয় বৃত্তির প্রসার ও অন্যদিকে একটা অবস্থান পার্থক্য-বোধ জনিত কুণ্ঠা এই দুটি অংশের বিরোধ ক্রিয়াশীল।

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে এই বিরোধ নেই। বরং দেখি যে অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেও কখনও মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। রামকানাই hero নন—তুচ্ছ নগণ্য বিষয়ী মানুষ। ছেলে নবদ্বীপচন্দ্রকে বড় ভাই বিষয় লিখে দেন না বলে ক্ষুণ্ণ হন—স্ত্রীর মুখের সামনে দাঁড়াতে পারেন না, সেই রামকানাই আদালতে সোজা সত্যকথা প্রকাশ করে দেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই যে দৃঢ়চিত্ততার প্রকাশ দেখা দিল এতেও ধরা পড়ল এক নতুন যুগ যে যুগ মানুষকে মানুষ হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে, তা রতন নাম্নী উলাপুর গ্রামের সামান্য দাসীকেই হোক বা শহরের মধ্যবিত্ত বিষয় চিন্তাপরায়ণ সাধারণ গৃহস্থকেই হোক। গোষ্ঠী-মানুষ নয়, ব্যক্তি মানুষের এই যে আবির্ভাব তাও এক নূতন মূল্যবোধ ছাড়া আর কিছু নয়।

এই নতুন মূল্যবোধই রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ করে তুলেছে নারী জাতির প্রতি। এটা স্পষ্ট হয় যখন 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পটি পড়ি। যে সশ্রদ্ধ সহানুভূতিতে তিনি দাক্ষায়ণীকে আঁকেন এই গল্পের মধ্যে তার তুলনা নেই। দাক্ষায়ণী গড় মেয়েদের চেয়ে আলাদা নন। সাধারণ এক স্ত্রীর মতোই তিনি, কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধাযুক্ত ভালবাসার দিকটি তাঁর আচার-আচরণ বিশ্বাস ছাপিয়ে ধরা পড়েছে। কন্যা সন্তানের প্রতি মধ্যযুগীয় মানুষের যে অবহেলা সেটা যে মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়েছিল তা হল সমাজের মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই বেশি সম্মান। মেয়ে সন্তান কেবল দুঃখই বরণ করে নিয়ে আসে। তারা শুধু ব্যক্তির বিলুপ্তির মধ্য দিয়েই সংসারে সুখ আনতে পারে। সুতরাং দাক্ষায়ণী দুঃখ অনুভব করত, সে স্বামীকে পুত্র সন্তান এনে দিতে পারছে না। বারেবারেই তাঁর গর্ভে জন্ম নিচ্ছে কন্যা সন্তানেরা। এ ঘটনা যেন শুধ

তারই অপরাধ। সেই দাক্ষায়ণী স্বামীর গ্রন্থটির নামে শেষ কন্যাটির নামকরণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

নারী জাতির প্রতি পুরুষদের অবজ্ঞার দিকটি অন্য যে গল্পটিতে ভৎর্সিত হয়েছে তা হল 'খাতা' গল্প। উমা যখন যা ভাবত তা তার খাতায় লিখে রাখত। শ্বশুর বাড়িতেও সে গোপনে লিখে রাখত তার ভাবনা কিংবা গান অথচ যে বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে সেখানে উমার লেখার কথা শুনে তার ননদেরা অবাক হয়েছিল। তাদের অন্তঃপুরে কথনও সরস্বতীর প্রবেশ লাভ ঘটে নি। তার বর প্যারীমোহন এই সংবাদে বিচলিত হয়ে ভেবেছিল :

> পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।
>
> তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রী শক্তি এবং পুং শক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়,—কিন্তু লেখাপড়া; শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রী শক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

সুতরাং গল্পের শেষে দেখি উমার বর প্যারীমোহন তার খাতা কেড়ে নিয়ে জোরে জোরে লেখাগুলি পড়তে লাগল আর উমার ননদেরা হেসে হেসে অস্থির হয়ে গেল এবং

> শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল।

শেষ পর্যন্ত উমা আর তার খাতাখানি ফেরত পায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিশীল মন যে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেছে তা বোঝা গেল শুধু উপরে উদ্ধৃত প্যারীমোহনের সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনায়। পরোক্ষে তীব্র বিদ্রূপের দ্বারা নয় শেষ পংক্তির মধ্যে প্রকাশিত প্রত্যক্ষ উক্তির দ্বারাও :

> প্যারীমোহনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব কণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।

এর থেকে বোঝা যায় নতুন যে যুগ এসেছে তাতে ব্যক্তিমানুষ এবং বিশেষ ভাবে নারীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তা আমাদের পুরুষ-শাসিত মধ্যযুগীয় সনাতন মূল্যবোধের চেয়ে আলাদা। শুধু তাই নয় প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নতুন যুগের মূল্যবোধকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন

এ সব গল্পের মধ্যে। সম্ভবত 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষ এসব বস্তুকে নিতে পারেন নি সর্বাংশে। তাই সম্ভবত তাঁদেরই কাউকে ছদ্মনামে চিঠি লিখতে দেখি 'নব্যভারত' নামে সমকালীন কাগজে। সেখানে জনৈক 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ' (এই ছদ্মনামে) লিখেছিলেন :

> গল্পগুলিতে একটু প্লট না থাকিলে তাহা প্রায়ই মনোহর হয় না। তারপর কি হইল, তারপর কি হইল জানিবার ইচ্ছা যে গল্পে উদ্দীপিত না করে সেই গল্পই অধিকাংশ স্থলে প্রায় পঠিত হয় না। যেরূপ গল্প বাহির হইতেছে, ভরসা করি তদপেক্ষা শীঘ্র মনোহর গল্প বাহির হইবে।

বোঝা যাচ্ছে এ সব গল্পের গল্পত্ব সমকালীন পাঠক বুঝতেই পারেন নি। এমনও হতে পারে যে বুঝতে চায়নি তাঁরা। নতুন যুগের মূল্যবোধকে সর্বাংশে তাঁরা নিতে পারেন নি সেটাও একটা কারণ হতে পারে। তা না হলে পোষ্ট-মাস্টার, দেনাপাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্তির মত গল্প পড়েও তাঁরা খুসি হন না—বরং অস্বস্তি বোধ করেন এবং হালকা গল্প লিখতে বলেন!

রবীন্দ্রনাথের এই অসাধারণ গল্পগুলির শক্তির উৎস নিহিত আছে নতুন যুগের মূল্যবোধগুলির সঙ্গে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের সংঘর্ষের মধ্যে। তাতে কখনও ব্যক্তি মানুষের স্বীকৃতি আছে, কখনও আছে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত দৃষ্টি। তাতে অবস্থান-পার্থক্যজনিত চেতনা কখনও পরিস্ফুট, কখনও বা পরিস্ফুট নারীকে অবমাননাকারী পুরানো মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নারীর প্রতি সহানুভূতির নতুন মূল্যবোধকে সমর্থন। এই সংঘর্ষ থেকে কখনও বা নিদারুণ ট্রাজিডির সূত্রপাত হয়েছে। এই নিদারুণ ট্রাজিডির পরিচয় আছে 'দেনাপাওনা' গল্পটির মধ্যে।

'দেনাপাওনা' গল্পটির মূল বিষয় পণপ্রথা এবং পণ অনাদায়ের জন্য গৃহবধূর প্রতি অত্যাচার ও পরিণতিতে করুণ মৃত্যুর ঘটনা। এ জাতীয় ঘটনার কথা আজও শুনতে পাওয়া যায়। সমস্যার তীব্রতা ব্যাপকতা এবং সমস্যার অনবসানই এতে সূচিত হয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য 'দেনাপাওনা' গল্পটিকে এত সহজ ছকে ধরে ফেলা যায় না।

প্রমাণস্বরূপ বলা যায় নিজে ধারদেনা করেও রামসুন্দর মিত্র যে পণের বাকি টাকা শোধ করতে আসেন নি তা নয় কিন্তু তা শোধ না দিয়েই তিনি চলে আসেন। কাজেই পণের টাকার অনাদায় নয়, পণের বাকি টাকা দিতে অস্বাকৃতিও এই ট্রাজিডির কারণ বটে। যদিও অস্বীকার পিতা রামসুন্দর করেন নি। করেছে বধূ নিরুপমা স্বয়ং। তার কারণ হিসাবে প্রাথমিকভাবে দেখানো হয়েছে যে ঘটনা তা হল রামসুন্দর টাকাটা যোগাড় করেছিলেন তাঁর বসত বাটী বিক্রি করে, এটা নিরুপমা মেনে নিতে পারে নি।

রামসুন্দরের বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত। তাদের কেউ কেউ সন্তানের পিতা। তারপরে আরও দুটি ছেলের পর এক মেয়ে নিরুপমা। পাঁচ ছেলের পর এই মেয়ে জন্মেছে বলে তার আদর বেশি। এইজন্যই ঠাকুর দেবতার নামে নাম না রেখে নিরুপমা নাম দিয়ে বাপ মা তাদের আদরের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারই বিয়ের সময় স্নেহে অন্ধ হয়ে রামসুন্দর রায়বাহাদুরের বনেদী ঘর দেখে সম্বন্ধ করেছিলেন। সমান অবস্থার দিকে নজর না রেখে [১২৯৮ সালের বা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের] দশ হাজার টাকা পণ এবং প্রচুর দানসামগ্রীর দাবী মেনে নিয়েছিলেন অবিবেচকের মত। সেই দশ হাজার টাকার পুরোটা যোগাড় না হওয়াতে বিয়ে ভণ্ডুল হবার উপক্রম হলেও শেষপর্যন্ত বরের নির্বন্ধে বিয়েটা হয়ে যায়—কন্যা চলে যায় তার শ্বশুর বাড়িতে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে সুরু হয়ে যায় নিরুপমার উপর মানসিক নির্যাতন। নিরুপমার পিতাও সে নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তিনি ইচ্ছে হলেও কন্যার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না। নিরুপমার বর এই উৎপীড়নের হাত থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে পারে নি কারণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়ে বিয়ের পরই সে বাইরে চলে গেছে। অনুমান করা যায় নিরুপমা এ সম্বন্ধে তাকে কিছু জানাতে পারে নি। স্বাভাবিক সঙ্কোচ তার কারণ হতে পারে তাছাড়া তার বাবা যে প্রতিশ্রুতি মতো দশ হাজারের সবটা দিতে পারে নি এ জন্য তার মনে সঙ্কোচ বা অপরাধ বোধও থাকতে পারে।

বাড়ির সকলেই এমন কি দাসদাসীও যে তাকে হীন চক্ষে দেখে এটাও নিরুপমা তার পাওনা বলে মনে করেছিল :

> সে যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তা গৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে।

কাজেই কোনও অভিযোগই সে করে নি কারও কাছে। বাবার দৈন্য-পীড়িত চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে সে কষ্ট পায়, বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজেই বাপের বাড়ি যাবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করে। কিন্তু রামসুন্দর তাকে নিয়ে যেতে পারেন না।

> নিজের কন্যার উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন, সেও অতি সসঙ্কোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময় বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

ব্যাপারটা আর সহ্য করতে না পেরে রামসুন্দর তাঁর বাড়ি বিক্রি করলেন। আগেও একবার এ চেষ্টা করেছিলেন। ভেবেছিলেন বাড়ি বিক্রি করে সেই বাড়িই ভাড়া নিয়ে বাস করবেন এবং এমন কৌশলে চলবেন যে ছেলেরা সে কথা জানতে পারবে না। কিন্তু সেটা তখন সম্ভব হয় নি। অতএব এবার

আরও গোপনতা অবলম্বন করে সেই কাজই করলেন। পণের টাকা নিয়ে তিনি একদিন হাজির হলেন মেয়ের বাড়িতে। সে দিন মাথা উঁচু করে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ঢুকলেন। শুনলেন রায়বাহাদুর বাড়িতে নেই। তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। তাই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন অন্তঃপুরে। এবার 'আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে; দুই জনে আর কথা কহিতে পারে না।' কিছুক্ষণ যাবার পর রামসুন্দর বললেন 'এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোন গোলই নাই।'

'গোল নাই' মানে আর কোনও বাঁধা উপস্থিত হবে না—এবার তিনি বাকি টাকা শোধ করার ব্যবস্থা করেছেন। যে কথা তিনি গোপন করতে চেয়েছিলেন সেই টাকা যোগার করবার উপায় হিসাবে নিজের বসতবাড়ি বিক্রী করার খবর কিন্তু সেকথা ছেলেদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বড়ছেলে হরমোহন তার দুটি ছেলে রামসুন্দরের দুই নাতিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে রামসুন্দরকে বললেন : 'বাবা এবার তবে আমাদের পথে ভাসালে।'

এসব কথা শুনে নিরুপমা সব ব্যাপার বুঝতে পেরে বলেছিল :

> বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।

ছেলেদের দিক থেকে চাপ ছিল বটে, তবু রামসুন্দর অনেক ভেবে চিন্তে বসত বাড়ি বিক্রি করে ছেলেদের না জানিয়ে গোপনে টাকা নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেকে জানিয়েছিলেন :

> তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?

অর্থাৎ ছেলেদের চাপকে অতিক্রম করার মত মানসিক শক্তি তিনি অর্জন করেছেন, বরের পিতার বাকি টাকাটা এবার তিনি দেবেনই। কিন্তু এবার যে কড়া শপথ করে নিষেধ করেছে মেয়ে স্বয়ং। নিরুপমা পরিষ্কারভাবে পিতাকে এ টাকা দিতে বারণ করল। রামসুন্দর বললেন টাকা না দিতে পারলে তাঁর অপমান, মেয়েরও অপমান। কিন্তু মেয়ে বলল :

> টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনও মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।

রামসুন্দর একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিলেন টাকা না দিলে মেয়েকে যেতে দেবে না বলে। কিন্তু নিরুপমা সোজা জানিয়ে দিয়েছিল 'না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিতে চেয়ো না।'

রামসুন্দর শেষপর্যন্ত কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলে চোরের মত বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন।

এর পরের ইতিহাসও সবার জানা। রামসুন্দর টাকা দিতে এসে মেয়ের নিষেধে টাকা না দিয়ে চলে গেছেন। 'দ্বারলগ্নকর্ণ স্বভাবকৌতূহলী' দাসীর মাধ্যমে এ খবর নিরুপমার শাশুড়ীর কাছে চলে গিয়েছিল। ফলে তার উপর নির্যাতনের আর সীমা ছিল না। অসুস্থ হলেও তার চিকিৎসা হয় নি, পথ্য জোটে নি। গুরুতর পীড়িত হয়ে বাপভাইদের দেখতে চেয়েও সে দেখতে পায় নি। ডাক্তার এসেছিলেন তাকে দেখতে সেই দিন যে দিন তার শ্বাস উঠেছিল। আর তারপরই তার মৃত্যু হয়েছিল।

তার বর বোধহয় সে খবরও জানতে পারে নি। তাই সে যখন নিরুপমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবার কথা চিঠিতে লিখল তখন তার মা তাকে জানিয়েছিল আর একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করা হচ্ছে—'এবার বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।'

বাড়ি বিক্রি করে হোক ছেলেদের পথে ভাসিয়ে দিয়ে হোক রামসুন্দর যে বাকি টাকা যোগাড় করে এনে বেয়াইকে দিতে এসেছিলেন তা না দিয়ে চলে যাবার ঘটনাই পরবর্তী ট্রাজিক পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছিল—এতে কোনও সন্দেহ নেই। টাকাটা দিতে না করেছে নিরুপমা। উৎপীড়িত হয়ে নির্যাতন অপমান সহ্য করেও এই নিষেধ করার জোরটা সে কোত্থেকে পেল? কোন জোরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে :

> 'আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।'

অর্থমূল্যে কেনা মর্যাদার বিরুদ্ধে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যু পণে নিরুপমার এই বিদ্রোহই এই গল্পের আশ্চর্য প্রাপ্তি। পণের টাকা আদায় না হওয়ার জন্য উৎপীড়ন মাত্র নয়—পণের টাকা দিতে মেয়ের এই নিষেধ করার ব্যাপারই আশ্চর্য একটা ঘটনা। পরিণতিতে তা চূড়ান্ত ট্রাজিডি বহন করে এনেছিল সত্য তবু আজকের দিনের বধূহত্যার ঘটনার চেয়ে এ ঘটনা আলাদা। কারণ এতে যে একটা নতুন মাত্রা যোজনা হয়েছে তা মেয়ের এই বিদ্রোহের দ্বারাই আনীত হয়েছে। মানুষের মর্যাদা তো অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না। এ রকম ধারণা করাই যে অনুচিত তা নিরুপমার মুখ দিয়ে ১৮৯১ সালেই উচ্চারিত হয়েছিল। ব্যক্তিমানুষের বিদ্রোহ, মানুষ হিসাবে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী নতুন করে শোনা গেল 'দেনা-পাওনা' গল্পের মধ্যে।

পুত্রবধূর উপর শ্বশুরবাড়ির বিশেষভাবে শাশুড়ীর নির্যাতন এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ আগেও দেখিয়েছেন। পাঠকের মনে পড়বে এর আগে লেখা 'বৌঠাকুরাণীর

হাট' উপন্যাসটির কথা যেটা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সন ১২৮৮ (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ) সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১২৮৯ সালের (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের) আশ্বিন মাস পর্যন্ত। সেখানে প্রতাপাদিত্য ও তাঁর মহিষী নির্যাতন চালিয়েছিল পুত্র উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমার উপর। নিরুপমার বর যেমন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলে নিরুপমাকে অপমানের হাত থেকে একবার অন্তত বাঁচিয়েছিল বিয়ের আসরে, এ ক্ষেত্রে দুর্বল স্নায়ুর মানুষ উদয়াদিত্য তার পত্নীকে রক্ষা করতে পারে নি। অন্যপক্ষে প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভার স্বামী রামচন্দ্রও বিভাকে চরম অপমান করেছিল। সুরমাকে বিষ খেয়ে মরতে হয়েছিল যদিও সে বিষ প্রতাপাদিত্য বা তার মহিষী যোগান নি কিন্তু বিষ দিয়ে মারবার মত আবহাওয়া তৈরি করে রেখেছিলেন। সুরমার দিক থেকে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। যেমন ওঠে নি নীলদর্পণ নাটকে সরলতার দিক থেকে। সরলতাকে গলা টিপে মেরেছিলেন তার শাশুড়ী—যদিও উন্মাদ অবস্থায় তিনি এ কাজ করেছিলন তবু শাশুড়ী বলেই যেন তার এ কাজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টাই সরলতা করেনি। অথচ জৈবধর্মবশত নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করাটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আসলে পুত্রবধূ হিসাবে শাশুড়ীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করবে কেউ—সে আমলের মূল্যবোধের মধ্যে এ ধরণের কোনও ব্যাপারই ছিল না।

যুগের হাওয়া কিন্তু একই ধারায় বইছিল না। মানুষ হিসাবে নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবতে সুরু করেছিল। তার বিদ্রোহও যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অন্তত একজনের মধ্যে সেই মূল্যবোধের প্রকাশ দেখা দিয়েছিল যে মূল্যবোধে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সমান মর্যাদাযুক্ত আচরণ দাবী করেছিলেন। সে চরিত্রটি হল কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথের আচরণে আহত হয়েছিলেন। সপত্নীকে মেনে নিতে চায় নি—কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের দুর্বলতা জেনে তিনি কষ্ট পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত ফিরেও এসেছিলেন। ঘরের বাইরে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে—বোধহয় এই কথা উপলব্ধি করে যে স্ত্রী লোকের স্বাধীনভাবে বাঁচবার কোনও উপায়ই [সে যুগে অন্ততঃ] নেই। অগত্যা কি আর করা যায়। কিন্তু ভ্রমর সোজাসুজি চিঠিতে লিখেছিলেন গোবিন্দলালকে :

> তুমি মনে জান বোধহয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম কিন্তু এখন বুঝিলাম তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।

এই চিঠি এবং ভ্রমরের পিত্রালয়ে চলে যাওয়া এবং গোবিন্দলালের অভিমান—অভিমান থেকে প্রতিহিংসা এ সবই পরবর্তী পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু যে প্রশ্নটা থেকেই যায় তা হল ভ্রমর এরকম চিঠি লেখার শক্তিটা পেল কোত্থেকে? অনুরূপ প্রশ্নই হল নিরুপমাই বা টাকা দিতে নিষেধ করার জোর পেল কোত্থেকে?

এর উত্তর আমরা আগেই বলেছি নতুন যুগের মধ্যেই সেই শক্তির উৎস নিহিত ছিল। ইংরেজদের আসার পর থেকেই নতুন ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়াশক্তির অভ্যুদয়ে তাদের সঙ্গে নতুন উদার গণতন্ত্রের বাণী—সকল মানুষের মধ্যেই বিকশিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনার স্বীকৃতি এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে মেয়েদের মধ্যেও নিজেদের মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা যুগের হাওয়ার মধ্যেই ছিল। মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই অন্য মানুষের সচেতনতাও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের কোনও কার্যকলাপের কোন তাৎপর্যই ধরা পড়বে না যদি এই সত্যকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারি।

আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সুষমভাবে সম্পন্ন হয় নি। আমরা একই সঙ্গে মধ্যযুগকে লালন পালন করে চলেছি আমাদের কৃষি-অর্থনীতির মধ্য দিয়ে। সেখানে কোনও টেকনোলজিকাল অগ্রগতি সম্পন্ন করিনি। উৎপাদন সম্পর্কেও নতুন প্রতিবিন্যাস করি নি। ফলত সেই উদারনীতিক মানবতাবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে মধ্যযুগীয় চিরাচরিত রক্ষণশীল মূল্যবোধ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরেছে। বস্তুত এই দুই স্তরের মূল্যবোধ একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থানে ও বিরোধে আমাদের সমাজ ও পরিবারকে বহুবিরোধের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি আসলে এই দুই স্তরের মূল্যবোধের সংঘর্ষে গড়ে ওঠা বিষামৃতের ফসল। আর এই দুইস্তরের মূল্যবোধের দ্বন্দ্বেরই একদিকে রবীন্দ্রনাথের গল্পের উদারনীতির বাণী অন্যদিকে 'হিতবাদীর' কর্তৃপক্ষের হিন্দু রক্ষণশীল সংস্কারবাদীদের অস্বস্তি।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও তাঁর ছোটগল্প

দীপেন্দু চক্রবর্তী

এক

এক যে ছিল লেখক, তাঁর নাম স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য··· ·····আজকের তরুণ পাঠকের কথা মনে রেখে বোধহয় এ ভাবেই শুরু করা উচিত হবে। কারণ যে লেখকের বই লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় না বড় একটা, এমন কি পুরনো বই-এর দোকানেও না এবং যার নাম বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত হতে দেখা যায় না, তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে প্রমাণ করার ভাষা আর কি হতে পারে তা এই মুহূর্তে মনে আসছে না। যদি কোনো তরুণ পাঠক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য নামে সত্যই কোনো লেখক ছিলেন কিনা তার প্রমাণ চেয়ে বসেন তবে নিশ্চয়ই নাজেহাল হতে হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে তাঁর মাত্র একখানি বই 'তীর ও তরঙ্গ' আছে। বাকী বইগুলো—তথাপি, অন্ত্যেষ্টি, কথাপ্রসঙ্গে, সবার সাথে, ছোটবড় মাঝারি, পড়ার জন্য আমাকেই ছুটতে হয়েছিল গড়িয়ায় স্বর্ণকমলের স্ত্রী শান্তি ভট্টাচার্যের কাছে।

সম্পত্তিহীন ও ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক নয় এমন মৃত লেখককে মনে রাখার দায়িত্ব প্রকাশকরা কেন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজেও কোনদিন নেয় নি। বাংলা সাহিত্যে খুঁজলে অনেক অনেক স্বর্ণকমল পাওয়া যাবে, যাঁদের লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় না, এমন কি কি থান ইটের মত ভারী ভারী সাহিত্যের ইতিহাসেও না। বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে সেই স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য সম্বন্ধে লেখার অনুরোধও এলো শেষপর্যন্ত, এবং তা একটি ছোট ও নতুন পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে। অথচ স্বর্ণকমল তো তাঁর কোনো উপকার করেন নি, শুধু তাই নয়, স্বর্ণকমলকে তিনি জানতেন না ব্যক্তিগতভাবে। অতএব প্রবন্ধের এই ভূমিকা।

দুই

স্বর্ণকমলের মৃত্যুর দু'বছর পর ১৯৬০ সালে উৎপলেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত 'স্মরণে' নামে একটি পত্রিকায় স্বর্ণকমলের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে যে আলোচনা বেরিয়েছিল তাই বোধহয় তাঁর সম্পর্কে প্রথম ও শেষ আলোচনা যদিও সেই আলোচনার বৃহদাংশই ছিলো স্মৃতিচারণা। ১৯৬০ থেকে ১৯৬০ এই দশবছরে অবশ্য এখানে ওখানে তাঁর নাম ছাপার অক্ষরে দেখা গেছে। কিছুদিন আগে 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় সুবোধ ঘোষ স্মৃতিচারণায় তাঁর নাম

উল্লেখ করেছেন। ধনঞ্জয় দাশের প্রবন্ধে (নতুন পরিবেশ ৬) ও ফ্যাসীবিরোধী রচনা সংকলনে (প্রতিবাদ প্রতিদিন) দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় টিকায় তাঁর বিশেষ ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে। 'কথাপ্রসঙ্গে' থেকে কোনো কোনো অংশ পুনর্মুদ্রিতও হয়েছে কোনো কোনো পত্রিকায়। কিন্তু গল্পকার ও ঔপন্যাসিক স্বর্ণকমলের কোনো মূল্যায়নই চোখে পড়ে নি। সে কারণে তাঁর ছোটগল্পের বর্তমান মূল্যায়নে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা বড় বেশী। আশা করবো তাঁর জীবিত সুহৃদবর্গ তা সংশোধনে এগিয়ে আসবেন।

বয়সের দিক থেকে স্বর্ণকমল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতির সমসাময়িক। তাঁর জন্ম ১৯০৮ সালে। তাঁর অধিকাংশ লেখাই প্রকাশিত হয়েছে তিরিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে পঞ্চাশের প্রথম দিক পর্যন্ত। পেশায় তিনি ছিলেন সাংবাদিক। আনন্দবাজার, যুগান্তর, অরণী, অগ্রণী প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করে শেষে যোগ দেন 'সোভিয়েত দেশ'-এ, যার ফলে তাঁকে দিল্লীবাসী হতে হয় এবং তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে কলকাতার সাহিত্য জগতের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে।

লেখক হিসেবে তার ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই যে কথা মনে আসে তা হলো কল্লোলরীতি থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে যে কয়েকজন লেখক সফল হয়েছিলেন স্বর্ণকমল তাঁদেরই একজন। পান্নালাল দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'স্বর্ণদা যদিও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক নন—'তবুও বলা চলে যে কল্লোলের ফ্রয়েডীয় যুগের পরে সাহিত্যে মার্কসীয় যুগ আসে—তার একজন পথিকৃৎ আমাদের গ্রামেরই আমাদের স্বর্ণদা (আমার চোখে স্বর্ণদা, স্মরণে, ১৯৬০)।' এ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে স্বর্ণকমলের রচনায় ফ্রয়েডীয় যুগের কোনো প্রভাবই নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা যেরকম একটি ফ্রয়েডীয় পর্ব পেরিয়ে মার্কসীয় পর্বে যেতে হয় স্বর্ণকমলের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। তবে মার্কসীয় উত্তরণেই তাঁদের উভয়ের বৈশিষ্ট।

বস্তুতঃ লেখক হিসেবে স্বর্ণকমলের সঙ্গে মানিকের মিল শুধু কল্লোলের প্রভাবমুক্তি বা মার্কসীয় অবস্থানেই নয়। তাঁদের মিল অন্য একটি ক্ষেত্রেও—নিরাসক্ত, নির্দয় বিশ্লেষণের আগ্রহ; বা তাঁদের ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক পর্বেও যেমন মার্কসীয় পর্বেও তেমনি আগ্রহ সবল ও সতেজ থেকে গেছে, কখনই ম্লান হয়ে আসে নি। নায়ক-নায়িকার সঙ্গে পাঠকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করার দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তাঁরা উভয়েই এমন গল্প, এমন উপন্যাস লিখেছেন সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রকেও লেখকের সূচীভেদ্য গোয়েন্দা চোখের কাছে নাজেহাল হতে হয় তার নানান দ্বন্দ্বের জন্য। মানিকের ছিলো বিচিত্র ও বিপুল অভিজ্ঞতা, তাঁর গল্পের জগতে বিচিত্র স্তরের অসংখ্য মানুষের মিছিল, স্বর্ণকমলের জগত মূলতঃ গ্রামীন ও শহুরে চাকুরে

মধ্যবিত্তের। এ দিক থেকে তাঁর মিল পরবর্তী কালের লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে। দুজনেরই বিচরণ আমাদের চেনামহলে। নরেন্দ্রনাথের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবদ্ধ করলে যা দাঁড়ায় বোধহয় সেটাই হবে স্বর্ণকমলের নিকটতম বিবরণ। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, ভাষার মিতব্যয় ও মননশীলতায় এবং সমাজ চেতনায় তিনি মানিকের আত্মীয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর সাধারণত্বকে এবং সেই সাধারণত্বে অসাধারণ কিছু আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় তিনি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট প্রতিবেশী। 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তি ছিলো এক্তিয়ারের বাইরে। তবে ভিখিরি জগতে বেঁচে থাকার সংগ্রামে কত অমানবিক রূপ নিতে পারে তা তিনি বলতে পেরেছেন 'রুটি আর বেটি' গল্পে, কিন্তু গোটা ব্যাপারটা দেখিয়েছেন একজন মধ্যবিত্ত সাংবাদিকের চোখ দিয়ে, যিনি গোটা ঘটনার অক্ষম সাক্ষী। এই মধ্যবিত্তের চোখে অন্যকে দেখা এবং নিজেকে দেখা—স্বশ্রেণীর এই দ্বৈত ভূমিকা এবং সে ভূমিকাদ্বয়ের নিরন্তর সংঘর্ষ, স্বর্ণকমলকে বেশী আকৃষ্ট করেছে এই বিষয়টিকে।

এ কথা তাঁর মনস্তাত্ত্বিক পর্বে যতটা সত্যি রাজনৈতিক পর্বেও ঠিক ততটাই সত্যি। মধ্যবিত্ত চরিত্রের অসংখ্য বৈপরীত্য আবিষ্কারে তিনি মনে হয় প্রথমে সাহায্য নিয়েছেন ফ্রয়েডের, পরে নিয়েছেন মার্কসের। কিন্তু কারুর প্রভাবই উগ্রভাবে জাহির হয় নি, যে সময় ফ্রয়েডের যাদুস্পর্শে বাঙালি লেখকেরা যৌন কামনার অন্ধকার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এমন কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ক্রমেই এই অন্ধকার জগতের নেশায় মশগুল থাকতে দেখা গেছে, তখনও স্বর্ণকমল ভারসাম্য হারান নি ফ্রয়েডের কাছে। মাতা-পুত্রের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ তিনি দিয়েছেন গল্পে ও উপন্যাসে। বিধবার অবদমিত কামনার জ্বালাময় ছবি এঁকেছেন, কিন্তু তার জন্য অস্বাভাবিক অবস্থার কথা ভাবতে হয় নি, চরিত্রকে অস্বাভাবিক করে তুলতে হয় নি, এবং বর্ণনায় কোনো রকম মরবিড ভাব ফুটিয়ে তুলতে হয় নি। অতি তুচ্ছ একটা ঘটনার সহৃদয় শ্লেষ মিশ্রিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া স্বর্ণকমলের ফ্রয়েডীয় গল্পে বাড়াবাড়ি কিছু পাওয়া যায় না। আবার যখন মার্কসীয় ঢেউ এলো বাংলা সাহিত্যে, সেখানেও তিনি আগের মতই স্থিতধী থাকতে পেরেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প লিখেছেন, কিন্তু তাকে ইস্তেহার করেন নি, সাহিত্য ব্যাপারটাকে মার্কসবাদীদের কীর্তনের আসর বলে ধরে নেন নি ; তাই তিনি যে সমাজটিকে জানতেন তাদের নিয়েই লিখেছেন, পরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরে যান নি। কৃত্রিম কল্পনার সাহায্যে আদর্শবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বড় প্রতিভা। কিন্তু তিনি দুই পর্বেই কিঞ্চিৎ ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। স্বর্ণকমল হারান নি, অন্ততঃ গল্পের ক্ষেত্রে। এর কারণ অবশ্য এটাও হতে পারে যে স্বর্ণকমল লিখতেন কম, এবং লেখার ক্ষমতাও হয়তো ছিলো মানিকের চেয়ে অনেক কম।

ছোট প্রতিভার এক একটা গুণ থাকে যা বড়দের মধ্যেও অনেক সময় পাওয়া যায় না। স্বর্ণকমল যদি ছোটপ্রতিভা হন তবে তার বড় গুণ ছিলো এই পরিমিতিবোধ। গল্প লেখার সময় ফ্রয়েড বা মার্কস কেউই তাঁর ওপর ভর করতে পারে নি ; যা জানতেন না বা জানা সম্ভব ছিলো না তা নিয়ে তিনি লেখেন নি। তাঁর গল্পগুলির আকারেও এই পরিমিতিবোধ স্পষ্ট—কোনোটাই ফেনিয়ে বলা গল্প নয়। কোথায় শুরু করতে হবে এবং বিশেষ করে কোথায় থামতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি ; ভাব আছে, ভাবালুতা নেই, ব্যঙ্গ আছে কিন্তু বিকট মুখব্যাদান করে নয় ; গল্পের আবেদন হয় হৃদয় ছুঁয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয়, নয় মস্তিষ্ক ছুঁয়ে হৃদয়ে আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেজ ও অনুভূতির তীব্রতা তাঁর নেই। কিন্তু মানিকের ক্ষুরধার অন্তর্দৃষ্টি তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত মমত্ববোধ তাঁর নেই, কিন্তু ঘরোয়া গার্হস্থ্য বাস্তবের উপেক্ষিত খুঁটিনাটি বিষয়কে গুরুত্ব দেবার যে সাহস দেখিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকমলের গল্পে তার উপস্থিতি সর্বত্র।

তিন

স্বর্ণকমলের ছোটগল্পের মাত্র দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো—'সবার সাথে', এবং 'ছোট বড় মাঝারি'। এর বাইরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়ানো তাঁর কিছু গল্প যা আছে তা নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়, কেন না তা দুষ্প্রাপ্য।

যা গেছে তাতে স্বর্ণকমলের শ্রেষ্ঠ রচনা ছিলো কিনা সে ঔৎসুক্য যদি কোনো ভাবী ঐতিহাসিক কখনো অনুভব করেন তবে সেটা তাঁর দায়িত্ব। আপাততঃ একেবারেই ভুলে যাওয়া স্বর্ণকমলের যেটুকু হারায় নি তাঁরই কেবল আলোচনা হতে পারে।

তাঁর দুটি সংকলনের মোট গল্প সংখ্যা সতেরো কি আঠেরো হবে। দুটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান দশ বছর—সবার সাথে ১৩৪৬ এবং ছোট বড় মাঝারি ১৩৫৭। এই দশ বছরে স্বর্ণকবল বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও সমাজ চেতনায় স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। 'ছোট বড় মাঝারি'র গল্পগুলির অধিকাংশই সমাজচেতনায় আরো তীক্ষ্ণ, আরো গভীর ; অবশ্য 'ছোট বড় মাঝারি'র গল্পগুলির রচনাকাল জানা না থাকায় এই বিকাশের ধারাটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ যদিও স্বর্ণকমলের লেখক জীবনকে ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় এই দুই পর্বে ভাগ করেছি কিন্তু যেভাবে 'সবার সাথে' ও 'ছোট বড় মাঝারি'র গল্পগুলি সাজানো তাতে এমনই মনে হয় যে এই পর্ব-ভাগটি ঠিক নয়, ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর মার্কসীয় চেতনায় সমাজ-সমীক্ষা এ দুটি ধারাই কম-বেশী দুই সংকলনে দেখা যায়, তবে এটা ঠিক যে প্রথমটিতে যেমন মনস্তাত্ত্বিক ধারাটিই প্রধান, দ্বিতীয়টিতে প্রধান সামাজিক ধারাটি। 'সবার সাথে' সংকলনে যেমন দেখি 'হাতেখড়ি'

'কালীয়দমন' 'বধূ' 'নাছোড়' 'পহেলা' ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক গল্প, 'ছোট বড় মাঝারি' তে পাওয়া যাবে 'দরদী' 'যযাদি' 'বন্দিনী'। আবার সংকলনে তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা ও আত্মবিশ্লেষণের গল্পও আছে, যেমন 'রুটি আর বেটি' বা 'অকৃতজ্ঞ'। এতে মনে হয় গল্পগুলি রচনাকাল অনুসারে সাজানো নয় কিম্বা হয়তো এই যে যাকে বলছি ফ্রয়েডীয় আগ্রহ তাকে স্বর্ণকমল অন্য চোখে দেখেছেন, দেখেছেন একজন সমাজসচেতন পর্যবেক্ষকের স্বাভাবিক কৌতূহল হিসেবে, তাই প্রত্যক্ষভাবে সমাজবিশ্লেষণের গল্পগুলির পাশাপাশি ব্যক্তির চেতনান্তরের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব বিরোধ নিয়েও তিনি লিখেছেন।

'হাতেখড়ি' ও 'দরদী' (দুটি সংকলনের দুটি গল্প) একই বিষয়বস্তুর দুই দিক। প্রথমটিতে ছেলেকে প্রথম স্কুলে পাঠিয়ে মা ভাবে খোকা বোধহয় মায়ের জন্য কেঁদে কেটে আকুল, পরে যখন জানতে পারা গেল সে দিব্যি বন্ধু পাতিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে খেলাধুলোয় মশগুল ছিলো তখন মা ভাবে 'বাঘের বাচ্চা রক্তের স্বাদ পাইয়াছে' এবং সেই আশংকা থেকেই মা ছেলেকে আরো আঁকড়ে ধরতে চায়। দ্বিতীয়টিতে ছেলের পালা। শিশুপুত্র মাসীর বিয়ে দেখে এসে মাকে জানাচ্ছে মাসীকে তার বর যেভাবে নিয়ে গেছে সে বাবাকে ওমান করে তার মাকে নিয়ে যেতে দেবে না কথনো। মাকে ঘিরে পিতার সঙ্গে পুত্রের একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব থাকে, কিন্তু মূল বিষয় এখানে মা'কে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ভাবা, ঠিক এর বিপরীত মনোভাব ফুটে উঠেছে মায়ের দিক থেকে 'হাতে খড়ি' গল্পটিতে। অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা ও আলাপের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক মাতা-পুত্রের সম্পর্কের জটিল দাবীদাওয়ার সনাতন ছবিটি ধরে ফেলেছেন। সাগরময় ঘোষ যে 'শতবর্ষের শতগল্প' সংকলনে 'হাতেখড়ি' গল্পটি স্থান দিয়েছেন তার কারণ বোধহয় এটাই 'হাতেখড়ি' ভালো গল্প হলেও স্বর্ণকমলের সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। যাই হোক, মাতাপুত্র সম্পর্কের নানান দিক—পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অথচ বিরোধ—ইত্যাদি যে স্বর্ণকমলের অনেকখানি সময় ও মনোযোগ দাবী করেছিলো তার প্রমাণ একই বিষয়ের আবির্ভাব নানান্ ক্ষেত্রে। তাঁর উপন্যাস 'তীর ও তরঙ্গ' 'হাতেখড়ি' আর 'দরদী'র যোগফল বলে মনে হয়। খুব স্পষ্টভাবে ফ্রয়েডীয় ছাপ ফুটে উঠেছে 'কালীয়দমন' গল্পে। মানিকের 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলির মতো এটি। বিধবা নারীর অবদমিত কামনা ও তার প্রভাবে মানসিক বিপর্যয়—এ গল্পের বিষয়। স্বপ্ন এখানে গল্পের গড়নে সবচেয়ে বড় উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। বিধবা অতসী কেবলই কাঁদে, তার এই কান্নার মূলে আছে অপমান, কারণ তাদের জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী যতীন ঘোষাল তাকে প্রেম নিবেদন করে ফেলেছে। অতএব অতসীর কৃষ্ণপূজার ঘটা বেড়ে যায়। কিন্তু রাত্রে বিছানার পাশে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে যে কালীয়দমনের ছবিটি জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখে যে তা আসলে যতীন ঘোষাল। 'কালীয়দমন' নামটিও

ব্যঞ্জনাময়। অবচেতনের যৌন-কামনার সাপটিকে অত সহজে দমন করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম শ্লেষ প্রথম থেকেই উঁকি দেয় এবং তা একজন সমাজ সচেতন লেখকের। অতসী তার শ্রেণীচেতনাকে জাগ্রত অবস্থায় ত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু ঘুমের মধ্যে অধঃস্তন কর্মচারী যতীন ঘোষালকে সে আলিঙ্গন করে।

স্বর্ণকমলের এই সূক্ষ্ম শ্লেষ ও বাঁকা হাসি তাঁর ফ্রয়েডীয় বিষয়বস্তুকে নিরাসক্ত ও সকৌতুক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে সাহায্য করে পাঠককে। পাঠক চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে হাঁপিয়ে ওঠে না। 'পহেলা' নামক গল্পটির বিষয়বস্তু হাস্যকর রকমের একটা তুচ্ছ ঘটনা—একটি চুম্বন। তরুণী নায়িকাকে প্রতিবেশী এক যুবক ঘরে একা পেয়ে প্রায় চোরের মত একটা চুমু খেয়ে পালিয়ে গেছে, আর মেয়েটি বসে বসে ভাবছে : 'এরই নাম চুমু? তাই লইয়া এতকাণ্ড চিরটা কাল? ফুঃ।' জীবনে প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতা তাকে যেন হতাশই করে কারণ সাহিত্যে বর্ণিত চুম্বনের সঙ্গে এর মিল নেই। কিন্তু গল্প যতই এগোয় দেখা যায় এই 'ফুঃ' করে উড়িয়ে দেবার মতো 'চুমু' ব্যাপারটা নিয়েই সে ভেবে চলেছে, এবং তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম সবই পড়ে থাকছে। তারপরের স্তরে নায়কের প্রতি তার অভিমান কেন সে ওমনি চুমু খেয়ে চোরের মত পালিয়ে গেলো, এবং তার নালিশ 'চুম্বন যেন অত সস্তা'। গল্পের শেষে সেই মেয়েকেই দেখা গেলো সে এক নতুন তৃপ্তি নিয়ে ঘরোয়া কাজ করে চলেছে।

স্বর্ণকমলের মনোবিদসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর একটি লক্ষণ জীব-জন্তুর সঙ্গে মানব-ব্যবহারের তুলনা। তাঁর উপন্যাসে, বিশেষ করে 'তীর ও তরঙ্গ'তে মার্জার মাতা-পুত্রের ছবিটি যেন মানব মাতা-পুত্রের কাহিনীটিরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। 'নাছোড়' গল্পটি নাছোড় বেড়ালের কাহিনী নয়, তাকে ঘিরে জনৈকা মাতার জটিল প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব সমাধিক। কিন্তু এ ধরণের গল্প-পদ্ধতি সবচেয়ে সফল হয়েছে 'বধূ' গল্পে। সেখানে দুটি কাহিনী পাশাপাশি—মৃত টিকটিকির জন্য আর একটি টিকটিকির শোক এবং একজন ঘরোয়া বধূর তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা। একদিন টিকটিকিটি আর এলো না। বউটি তবুও তাকে খোঁজে। একদিন হঠাৎ টিকটিক আওয়াজে সে চমকে যায়। কিন্তু সেটা টিকটিকি নয়, ঘড়ির আওয়াজ। এ গল্পটি মনস্তত্ত্ব ছেড়ে যেন এক দার্শনিক স্তরে পৌঁছে গেছে। প্রেম, মৃত্যু ও আসক্তির স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি এক হাল্কা ঢঙের গল্পে এত ভয়ংকর একটা ছায়া ফেলতে পারে তা না পড়লে ভাবা শক্ত।

স্বর্ণকমলের পরবর্তী গল্পগুলিতে মনোবিকলন আছে, কিন্তু তাকে ঘিরে সামাজিক ব্যঞ্জনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'বন্দিনী' গল্পটি জনৈকা অসতীর মনোকষ্ট ও ফিটের অসুখ শুধু এই নিয়ে যদি হতো তবে তা হয়ে যেত তৎকালীন

অসংখ্য ফ্রয়েডীয় স্টাডির একটি, কিন্তু এর পাশে যখন এই অসতীর স্বামীর একই রকম কেচ্ছায় গ্রামীন সমাজকে অনেক সহিষ্ণু হতে দেখা যায় তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না লেখকের আসল লক্ষ্যটি কোথায়। 'যযাতি'তে মনোবীক্ষণের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেকে পাশের বাড়ির মেয়ের সাথে প্রেমালাপ করতে দেখে বাবা আতঙ্কিত। তিনি অনেক চেষ্টা করেন তার মনকে ঘুরিয়ে আনতে। কিন্তু গল্পের শেষে বাবাকেই দেখা যায় পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তিনি ঐ পাশের বাড়ির ছাদেই যেন তার স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছেন। যে-ভাবে গল্প শেষ হয়েছে তা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। এটা পিতার স্মৃতিচারণা হতে পারে কিম্বা একটা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার ছবি। পিতা-মাতা প্রেম করে বিয়ে করলেও পুত্রের বেলায় রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পে; পিতা যাই চান পুত্রের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। ভবিষ্যতের গতি কেউ রুখতে পারে না। রক্ষণশীল মনোভাবের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং এই 'অবশ্যম্ভাবী'ই স্বর্ণকমলের একটি লঘু গল্পের নাম, সেখানেও রক্ষণশীলতার পরাজয় হয় শেষে।

মধ্যবিত্ত চরিত্রের আত্মরক্ষাজনিত অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বর্ণকমলের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী তা আগেই বলেছি। 'সবার সাথে' সংকলনে 'অকৃতজ্ঞ' গল্পটি। এ গল্পে দুটি চরিত্রের ব্যবহারই শেষে বদলে যায় শুধু কিছু সময়ের ব্যবধানে। মধ্যবিত্ত বাবুকে ধরে এনেছে হাফগেরস্ত একটি মেয়ে যার স্বামী পঙ্গু ও বাকশক্তিহীন এবং শিশুপুত্র খাদ্যহীন। এ দৃশ্য দেখে মধ্যবিত্তবাবু দয়াবশতঃ স্ফূর্তির বদলে টাকা দিয়ে চলে যায় এবং মেয়েটি আবার আসতে অনুরোধ করে। বাইরে বেরিয়ে লোকটি আবার ফিরে আসে বাকী টাকা কটিও মেয়েটিকে দেবার জন্য। দরজায় কড়া নাড়ে। কিন্তু এখন যে-মেয়েটি বেরিয়ে আসে তাকে চেনা যায় না। সে গামছা পরে পঙ্গু স্বামী ও পুত্রকে খাওয়াতে বসেছিলো। এ সময়ে ভদ্রলোকের পাড়ায় হামলা করার জন্য সে কর্কশ গলায় চেঁচায়, যদিও লোকটির কাছ থেকে এবারেও টাকা গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। লোকটি বেরিয়ে এসে ভাবে, মেয়েটি কি অকৃতজ্ঞ, এবং সেই কারণে ভিখিরি পয়সা চাইলেও সে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায়।

মেয়েটি হাফ-গেরস্ত, তাই তার দুটি ভূমিকা। পতিতা হিসেবে সে খদ্দের ধরে এবং তাদের আবদার সহ্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু যখন সে স্ত্রী বা মা, তখন সে আগের ভূমিকাকে কোনো মতেই মেনে নেবে না। মধ্যবিত্তবাবু তা বুঝতে পারে না। সে তার উদারতার সুযোগটির চূড়ান্ত ব্যবহার করতে চায় এবং প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়। সিচ্যুয়েশন ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে দেবার এই পদ্ধতি চেখভকে মনে করিয়ে দেয়, মনে করিয়ে দেয় ব্রেখ্‌টের পদ্ধতিকে। 'উত্তমপুরুষ' গল্পটি পড়লেই আমার 'পুনটিলা'র কথা

মনে আসে। ব্রেখ্‌টের 'পুন্‌টিলা' মদ খেলে সর্বত্যাগী নেশা কেটে গেলে সর্বগ্রাসী জমিদার 'উত্তর পুরুষের পঞ্চম পুরুষ' এবং তারই গরবে স্ত্রীকে গরীবের মেয়ে বলে গঞ্জনা দেয়, কিন্তু রাত্রে কামনায় দগ্ধ হয় সেই স্ত্রীর কাছে। 'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি' গোছের সংকল্প করে বসে, কিন্তু আবার দিনের আলো ফুটলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেই ডাকসাইটে জমিদার বংশের পঞ্চমপুরুষ। শুধু সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার দ্বন্দ্ব নয়, অতি-আধুনিক প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও কর্মের অসঙ্গতিও স্বর্ণকমলের নজর এড়াতে পারে নি। তিনি সরষের মধ্যে ভূত দেখিয়েছেন যখন কমিউনিস্টদের মধ্যে উন্মাদনা ও আত্মতৃপ্তি ছিল তুঙ্গে। আলোচ্য গল্পটি হলো 'ওঝা'। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ডজন দেড়েক ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ লিখেছেন যিনি, সেই অধ্যাপক পরিতোষ সেনকে মুসলমান বলে ভুল করে বসলো কোনো এক মুসলমান ব্যক্তি। ব্যাস্‌, সমাজতত্ত্ববিদ সারা রাস্তা দুঃখ পেতে পেতে বাড়িতে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করে পারেন না. 'বল তো আমি কি সত্যই মুসলমানের মতো দেখতে?' স্ত্রীর নেতিবাচক উত্তরে খুশী হয়ে তিনি তখন সেই মুসলমান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন 'ব্যাটা কী মিথ্যাবাদী'।

সত্যি কথা বলতে কি 'ওঝা' ধরণের গল্প লেখার জন্য যে সাহসের দরকার তা বাংলা সাহিত্যে খুব কম বামপন্থী লেখক দেখাতে পেরেছেন। শ্রেণীশত্রুকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করবার হিম্মত রাখে না এমন বামপন্থী লেখক আমি দেখি নি, এবং অবশ্যই তাতে তৃপ্তি পাবার কথা। কিন্তু আত্মদর্শন আত্মসমীক্ষায় আগ্রহী এমন বামপন্থী লেখকের দেখা পাওয়া যায় না বড় একটা। এজন্য স্বর্ণকমলের কিছু গল্পকে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে হয়। যেমন 'ওঝা' এবং 'পোষ্টার'।

'পোষ্টার'কে নিঃসন্দেহে এক নতুন ধরণের বিপ্লবী গল্প বলা চলে এবং নিঃসন্দেহে স্বর্ণকমলের শ্রেষ্ঠ গল্প। এ গল্পে তিন শ্রেণীর মানুষকে পাওয়া যায়, একদল দেওয়ালে সরকার বিরোধী পোষ্টার লাগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তারা গল্পেও অদৃশ্যই থাকে, শুধু পোষ্টার পড়তে দেখে বোঝা যায় তাঁরা আছে। দ্বিতীয় দল হলো আইন-শৃঙ্খলারক্ষক যারা পোষ্টার ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এবং তৃতীয় দল হলো, আমাদের মতো চাকুরীজীবী ভীতু অথচ সর্বজ্ঞ আড্ডাবাজ বাঙালী মধ্যবিত্ত। তাদেরই একজন বক্তা এখানে—'সামনের দেওয়ালে আবার একটা পোষ্টার পড়েছে···কে বা কারা মারে জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না। ছা পোষা কেরাণী।···যার খুশি মারুক, যার ভালো লাগে পড়ুক।

তবু না পড়ে পারি না। এত কাছে, একেবারে মুখোমুখি, তাই। যখন এই পোষ্টার ছেঁড়া নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধে তখন এঁরা সবাই আড্ডা ছেড়ে ঘরে চলে যান এবং সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফিরে খোঁজ নেন

ছেলেরা ঠিকমত ফিরেছে কিনা। কিন্তু পোষ্টার ছিঁড়লেও পোষ্টার আবার পড়ে। এবং সেখানেই বিপ্লবী শক্তির মরণজয়ী রূপ।

আজ যখন রাজনৈতিক গল্প মানেই আর একটা বৃহৎ পোষ্টার তখন স্বর্ণকমলের 'পোষ্টার' সবার কাছে একটা মডেল হতে পারে, কারণ তা প্রমাণ করে যে পোষ্টারের বিষয় নিয়েও এমনভাবে লেখা যায় যা আর একটা পোষ্টার হয়ে দাঁড়ায় না, হয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য। একটি ছোটগল্প ছোট ছোট কথায় সমাজের তিন তিনটে শ্রেণীকে আনা এবং তাদের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার এই উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে বিরল বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না।

চার

স্বর্ণকমল বিস্মৃত লেখক, তাঁর লেখার সঙ্গে আজকের পাঠকের কোনো পরিচয়ই নেই, তাই আজকের গল্পের মানদণ্ডে তাঁর লেখার বিচার করার ইচ্ছে অসচেতনভাবে এসে যেতে পারে পাঠকের। যেহেতু তাঁকে 'আজ' জানছি তাই তিনি যে আজকের লেখক নন এই কথাটা মনে নাও থাকতে পারে। যদি অন্যান্য লেখকের মতো তাঁর বই গত কয়েক দশক ধরে পঠিত হ'তো, যদি তাঁর লেখা আলোচিত হতো, তবে নিশ্চয়ই এই আশংকার সম্ভাবনা থাকতো না।

যাঁরা আজকের বামপন্থী তরুণ পাঠক তাঁরা অবশ্যই স্বর্ণকমলের গল্পে একটি বস্তুর অভাব দেখে কিঞ্চিৎ হতাশ হবেন, তা হোলো বিপ্লবী ক্রোধ। তাঁরা স্বর্ণকমলের 'কথাপ্রসঙ্গে' পড়ে খুশী হবেন, কারণ তাতে বিপ্লবী আক্রোশ ও ঝাঁঝ 'প্রত্যাশিতের চেয়ে কম, তাই তাদের শিল্পরস অপ্রত্যাশিতের চেয়েও বেশী'—জগন্নাথ চক্রবর্তীর এই অভিমতে (স্মরণে, ১৯৬০) তাঁরা সায় নাও দিতে পারেন।

কিন্তু কেন এমন ঘটলো? যাঁর কলম 'কথাপ্রসঙ্গে'র পাতায় এমন অগ্নি বর্ষণ করতো, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে যিনি এতটা উগ্রপন্থী হয়ে উঠতে পারতেন, তিনি গল্পে এতটা শান্ত, এতটা পরিশীলিত কেন? তাঁর আক্রমণের ভঙ্গী বড়ই সূক্ষ্ম, তাই ভাষাও বড় বেশী সতর্ক ও মাপা-মাপা, যেমন—

'অভিমতটা গৃহিনীর, সুতরাং নগেনবাবুরও'।

কিম্বা—

'আমরা যে যার ঘরে ফিরে যাই। কেন-না থানা বেশী দূরে নয় (পোষ্টার)।' এ যেন তীক্ষ্ণ ব্লেডের ছোঁয়া, কখন যে হাত কেটে যায়, বোঝা যায় না। কিন্তু চারপাশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে কম্যুনিস্ট লেখক এতটা নীচু গলায় শুধু বাঁকা বাঁকা কথা বলেই ক্ষান্ত হ'লেন কি করে?

শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীঘৃণার লাল টকটকে প্রকাশ, অনেকের মতে বিপ্লবী সাহিত্যকে অনেক বেশী উদ্দীপক ও আকর্ষণীয় করে। কিন্তু স্বর্ণকমল বিপ্লবী সাহিত্যের এই ধারাটির দিকে এগোন নি। অথচ তিনি তাঁর সময়ে যে গোষ্ঠীর লোক ছিলেন তাঁরা নাকি সবাই তখন উগ্র মতামতের জন্য বিখ্যাত

ছিলেন। ধনঞ্জয় দাশের মতে (নতুন পরিবেশ, ১৩৮২ শারদীয়)—'চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল এবং কিছুটা পরিমাণে চিন্মোহন সেহানবীশ অনেক বেশী পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন…।' অবশ্য ধনঞ্জয় দাশ নিজে এই 'উগ্র' লেবেলটি দেন নি, ওটা জনশ্রুতি। তাঁর প্রবন্ধ থেকে জানতে পারলাম 'নবান্ন' নাটককে নিয়ে যখন প্রথম বিতর্ক শুরু হয়েছিলো তখন স্বর্ণকমলই প্রথম 'নবান্নের' পক্ষ নিয়েছিলেন। প্রচণ্ড আবেগের নাটক 'নবান্ন'কে যিনি প্রশংসা করেন তাঁর নিজের গল্পে সেই আবেগের অভাব কেন হলো ?

ঐ প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে ভালো দিতে পারতেন স্বর্ণকমল নিজেই, যদি তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত 'কেন লিখি' গোছের কোনো জবানী লিখতেন। কোথাও লিখে গেছেন কিনা তা জানি না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নানান মুহূর্তে আত্মসমালোচনা করেছেন স্বর্ণকমল কি সে রকম আত্ম-সমালোচনার চেষ্টা করেছিলেন কখনো, লিখিতভাবে কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের কাছে ? উপযুক্ত তথ্যের অভাব থাকলেও অবশ্য এটুকু অনুমান করা একেবারে ভিত্তিহীন হবে না যে তখনকার কম্যুনিস্টদের চিন্তা ও কাজে যেসব ফারাক ও অসঙ্গতি ছিলো স্বর্ণকমল তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই তাঁর সাহিত্য-চিন্তা ও সাহিত্য-কর্মে একটা অসঙ্গতি থেকে গেছে। তাত্ত্বিক স্বর্ণকমলকে শিল্পী স্বর্ণকমল বিশেষ আমল দেন নি বলেই মনে হয়। তাত্ত্বিক স্বর্ণকমল সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ অবক্ষয় সাহিত্যের সমর্থকদের দলে যোগ দিতে চান নি, কিন্তু লেখক স্বর্ণকমলের 'রুটি আর বেটি', 'অকৃতজ্ঞ' 'উত্তর পুরুষ' 'ওঝা' প্রভৃতি গল্প শেষ বিচারে উত্তরণের নয়। ঠিক এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন—যদিও তিনি ও স্বর্ণকমল 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছেন বিপ্লবী সাহিত্যের পথে, স্বর্ণকমল তখন এগিয়ে চলেছেন তাঁর সাহিত্য- কর্মে ইতি টানবার দিকে।

আজ অনেকেরই মনে হয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে যতটা আদর্শ মার্কসবাদী ব্যক্তিগত জীবনে ও গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে ততটা ছিলেন না। স্বর্ণকমল লেখায় যতটা না মার্কসবাদী তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নানান স্তরে তার চেয়ে অনেক বেশী আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন, অথচ দুজনেই ছিলেন দুরারোগ্য রোগের শিকার, দারিদ্রের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত।

কম্যুনিস্ট স্বর্ণকমল আগেই মারা গিয়েছিলেন, লেখক স্বর্ণকমল তারও আগে, কিন্তু ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যে স্বর্ণকমল বেঁচে ছিলেন তিনি কিছু হারালেও অক্ষয় রেখেছিলেন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের স্পৃহা, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির আশায় তিনি আজকের বহুল প্রচলিত মুখোশগুলির একটিকেও গ্রহণ করেন নি।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার এবং একটি সমীক্ষা   অলোক দাস

রবীন্দ্রোত্তর কালের ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত কল্লোলেরই লেখক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিষবাষ্পে সারা পৃথিবী জুড়ে অনিশ্চয়তা, হতাশা, গভীর অস্থিরতা দানা বেধে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদগ্র কামনায় ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের মতো স্থিতধী শিল্পী আপনার রচিত কল্পলোকে বিচরণ করতে সক্ষম হলেও বেশ কিছু তরুণ যুবক কবি-সাহিত্যিক এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুললেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই অনিশ্চিত বিভ্রান্ত যুগের শিল্পী। ফলে যুগ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতা এবং গল্পে অতিরিক্ত একটি মাত্রা সংযোজন করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা এবং সুন্দরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সমানুপাতিক। তার যন্ত্রণা-বিদ্ধ হৃদয় অনিশ্চয়তার অন্ধকার থেকে আলোর পথ খুঁজেছে কিন্তু সমুদ্র মন্থন করে অমৃত সংগ্রহ করার মতো তেজস্বিতা এবং বলিষ্ঠতা তার মধ্যেই নেই। অথচ তার কাছ থেকে তা ছিল প্রত্যাশিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' প্রচলিত গল্পধারায় একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প। গল্পের কাঠামো অত্যন্ত বলিষ্ঠ। আয়োজনে বাড়াবাড়ি নেই যেন একটি রহস্যঘন পরিবেশে সমস্ত পাঠকও গল্পের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে অভিযাত্রী হয়েছেন।

শহরের উজ্জ্বল পরিবেশ থেকে অনেক দূরে কোন এক অকিঞ্চিৎকর গ্রাম। হঠাৎ একদিন 'বিকেল বেলার রোদে' তিন বন্ধু মিলে সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ঘণ্টা কয়েক পরেই ভাদ্রের ভ্যাপসা গরম আর ধুলোয় ভরা চটচটে শরীর নিয়ে আলো-আঁধারে রোমাঞ্চিত বিস্ময়কর অনুভূতির মদিরতা পান করতে করতে তারা হাজির হয় তেলেনাপোতা গ্রামে। তিন বন্ধু এক জীর্ণ জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাদের দেখাশোনা আর আহারের ব্যবস্থা হয় তাদেরই মধ্যে একজনের আত্মীয়ার বাড়িতে—যারা সেই জীর্ণ জমিদার বাড়ীর উপর তলার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে।

চারদিকে ধ্বংস আর অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, এখানকার মানুষগুলোও যেন সেই অবক্ষয়ের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত। নোনা ধরা ইটের ফাঁকে ফাঁকে আগাছার মতো এখানকার মানুষের দেহ-মনে একটি অবসন্নভাব, যেন অতীতের পরাজয়ের সুস্পষ্ট ছাপ। গল্পকার গ্রামটির বিশেষ কোন বর্ণনা দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। যে-দুই নারীকে তিনি ভগ্নপ্রায় প্রেতপুরীতে অবস্থান করিয়েছেন তারা আসলে তেলেনাপোতা গ্রামেরই প্রতিনিধি।

যামিনী অনূঢ়া গ্রাম্য যুবতী, তার বয়স কত তা লেখক বলেন নি—বলেছেন কৈশোরের শেষ এবং যৌবন স্থগিত। তার সারা দেহে-মনে অতীত পরাজয়ের ছাপ। আর একজন তার অন্ধ মা যিনি শয্যাশায়ী, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। কিন্তু মরেও যেন সে শান্তি কামনা করে না। চরম দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেও মনের মধ্যে একটি স্বপ্নসাধ জিইয়ে রেখেছে। তার দূর সম্পর্কিত বোনপো নিরঞ্জন তাকে কথা দিয়ে গেছে সে আসবে। তার সঙ্গে যামিনীর বিবাহ দিয়ে তার স্বপ্ন সাধ পূরণ করবে। কিন্তু সে যে আর আসবে না সে কথা যামিনীর মতো গল্পের মনিদাও জানে। গ্রাম জীবনের নির্বোধ সরলতা যামিনীর মাকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে সে যদি কখনো দৃষ্টি শক্তি ফিরেও পেত তাহলেও তার অন্ধত্ব অপবাদ ঘুচতো কিনা বলা শক্ত।

গ্রামে বেড়াতে আসা তিন সঙ্গীর মধ্যে একজনের সঙ্গে পুকুর পারে যামিনীর সঙ্গে দেখা। মাছ ধরতে গিয়ে সে যখন অত্যন্ত ভাবুকের মতো হয়ে ছিপে টান দিতে ভুলে গেছে—সেই মুহূর্তে গ্রাম্য সরলতায় সমস্ত অপরিচয়ের আবদ্ধতা ভেঙে তাকে বলেছে—'বসে আছেন কেন? টান দিন।' পুকুর পাড়ের নির্জনতাভঙ্গকারিনীর এই গায়ে পড়ে আলাপ নায়কের প্রত্যাশিত না হলেও অপছন্দ হয়নি। মুহূর্তের মধ্যে এক বিহ্বল রোমান্টিক আবেগময়তা তার হৃদয় জুড়ে থাকে। ডুবে যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠে। ছিপ তুলে অকৃতকার্যতার অপমান মাথায় নিয়ে আস্তানায় ফিরে এসে শোনে ইতিমধ্যে তার কৃতিত্বের কথা সকলেই জেনে ফেলেছে। রহস্যের জাল বেশী দূর বিস্তৃত হবার আগেই মনিদার কথায় জানা যায় সেই বারি-বহনকারিণী আসলে আর কেউ নয় মনিদার জ্ঞাতি যামিনী।

যামিনীর মা শুনেছে তিন বন্ধু এসেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস এই তিন জনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই তার দূর সম্পর্কিত বোনপো। যামিনী তাকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। অসহায়ার মতো মনিদার সাহায্য প্রার্থনা করে। হঠাৎ সেই মৎস্য শিকারী বন্ধুও মনিদার সঙ্গে গিয়ে বৃদ্ধার সম্মুখে হাজির হয়। হয়তো বা মনের অজান্তেই নিতান্ত আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজেকে নিরঞ্জন বলে পরিচয় দিয়ে ফেলে। যামিনীকে বিবাহ করার সংকল্প গ্রহণ করে। এই প্রতিশ্রুতি মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধাকে শুধু সান্ত্বনা দেবার কৌশলমাত্র নয়। যামিনীর মুহূর্তের দর্শনে শিকারী বন্ধুর জীবনে যে রূপোর কাঠি ছুইয়ে দিয়েছিল, এ তারই সার্থক রূপ। মাছ ধরার সরঞ্জাম ভবিষ্যতে সাফল্য লাভের আশায় তেলেনাপোতা গ্রামে রেখে তিন বন্ধু যাত্রা করে শহরের অভিমুখে। রাস্তায় আসতে আসতে তার মনে তেলেনাপোতা গ্রামের স্মৃতি আরও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। তারপর একদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে তেলেনাপোতা গ্রামে ফিরে যাবার শেষ বাসনাটুকুও অন্তর্হিত হয়ে যায়। রূঢ় বাস্তবের কঠিন

গড়িয়াবাড়ে নায়কের ঘর শাখ এক সময় অন্তর্হিত হয়ে যায়। তেলেনাপোতার স্মৃতি শেষবারের মতো জলে উঠে 'আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যায়।'

এই গল্পের অধিকাংশই জুড়ে রয়েছে মৌন প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধতা এই প্রকৃতিতে নেই। মশাদের ঐকতান, কাদা-জলের পথ সেখানে জঙ্গলের আঁধারে হারিয়ে গেছে। সেই অরণ্য পরিবেশ কারও মনে রহস্য উন্মোচনের আগ্রহ জাগায় না। গরুর গাড়ির ক্রন্দন ধ্বনি এক বিষণ্ণময়তার ইঙ্গিত দেয়। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য। মানবিক জগৎ যেন দূরে কোথায় নির্বাসিত। কুয়াশাময় একটি জগৎ যেন গল্পের পাত্র পাত্রীকে ঘিরে রয়েছে। সময় সেখানে স্তব্ধ। নিতান্ত স্রোতহীন সেই জীবনে শুধু মানুষ নয় পশুও যেন তাদের প্রকৃতিকে হারিয়ে ফেলেছে। 'নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হলে ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।' আকাশে পূর্ণ চাঁদ যেন এখানে কখনো দেখা যায় না। কৃষ্ণ পক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ, প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, মন্দিরের ভগ্নদশা অশেষ যন্ত্রণায় মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় জেগে আছে। 'জাদুঘরের নানা প্রাণিদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে' তেমনি নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন নিমগ্ন। এই মরা দেশে ফুলও যেন ফুটতে ভয় পায়; যদিও বা ফোটে তার গন্ধ ছড়ানোর ক্ষমতাও যেন হারিয়ে যায়। সর্বত্র বিচরণ করে পচা কচুরি পানার উগ্র গন্ধ। শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র তার লক্ষ্যে স্থির। গল্পের মেজাজটিকে ঠিক রেখে প্রকৃতিকে তিনি কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি প্রেমের গল্প লিখতে বসেন নি, তাই তীব্র রোমান্টিক আবেগ তাঁর গল্পে নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যুগ যন্ত্রণা এবং সমাজের অবক্ষয়িত রূপ তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। জীবন শিল্পী প্রেমেন্দ্র সেই যুগ যন্ত্রণাকে (তেলেনাপোতা আবিষ্কার) গল্পে রূপ দিয়েছেন। তাই তার গল্পে স্নিগ্ধতার পরিবর্তে একটি ধ্বংসময় প্রকৃতির রূপ প্রকটিত হয়েছে।

অভিযাত্রীদের জন্য তিনি যে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করেছেন তা ঐ 'ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য' একটি ঘর। বহুদিনের অব্যবহারে তা জীর্ণ হয়ে গেছে। ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো পরিষ্কার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যে মুমূর্ষু সহানুভূতির ইঙ্গিত মেলে। সামান্য পদচারণায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলেস্তরা রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে বর্ষিত হয়। তাদের এ প্রতিবাদ অভিনব হলেও মর্মান্তিক। সামান্য আয়োজন এবং কতকগুলি প্রতীকী ঘটনার সংমিশ্রণের দ্বারা লেখক গল্পের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দিকে পাঠকের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে লেখক শুধুমাত্র অবক্ষয় আর ধ্বংসের চিত্র অঙ্কনেই ব্যস্ত। ধ্বংসের রূপ অত্যন্ত কঠিন। যামিনী

যামিনীর 'সলজ্জ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো।' তার 'হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে' যেন বলতে চায়—তেলেনাপোতার মাছতো তোমায় ফাঁকি দিতে চায়নি। সে তো ধরা দিয়েই চেয়েছিল। কিন্তু তোমার তাকে গেঁথে তুলবার সামর্থ ছিল না।

কুসুমের মতোই যামিনীর ভালবাসার পরশে বিষণ্ণ শ্রীহীন গ্রামটিও যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে মুগ্ধ রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অতীত ভবিষ্যতের সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়ে নিজের হৃদস্পন্দনে শুধু একটি ধ্বনিই জেগে ওঠে—“ফিরে আসব, ফিরে আসব।”

কিন্তু সময়ের ব্যবধান তাঁর মনের সাময়িক উচ্ছ্বাস কাটিয়ে দেয়। কঠিন বাস্তবের রূঢ় রূপ তার স্বপ্নসাধকে চিরতরে মুছিয়ে দেয়। তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার ইচ্ছা আর কোনদিন সে অনুভব করে না।

গল্পটি যেন ঘুমের ঘোরে দেখা একটি স্বপ্ন। বাস্তবের কঠিন আলোর মুখোমুখি হয়ে যা ম্লান হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে গল্পটি যেখান থেকে সুরু হয়েছে সেখানেই তার সমাপ্তি। মাঝে কেবল কয়েকটি স্বপ্নময় মুহূর্ত যা শিউলী ফুলের মতো প্রভাতী আলোর পরশ পেয়ে বৃন্তচ্যুত হয়ে গেছে।

সমগ্র গল্পটিতে লেখকের জীবনবোধ কখনো প্রত্যাশিত মাত্রা পায়নি। গল্পের সমস্ত পাত্র-পাত্রী যেন অবসাদগ্রস্ত, তা এতই কৃত্রিমতা সম্পৃক্ত যে পাঠকের সহানুভূতি পর্যন্ত আদায়ে ব্যর্থ। চরিত্রের কায়া আছে সত্য কিন্তু তাদের দেহের স্নায়ুগুলি যেন অচঞ্চল, স্থবির, রক্তেও যেন কোন উত্তেজনা নেই। সমস্ত গ্রামের প্রতীক রূপে লেখক ধ্বংস প্রায় রাজবাড়িটিকে কাজে লাগিয়েছেন। আর ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ি যামিনীর দেহ-মনে ফেলেছে গভীর ছায়া। যামিনী যেন তাদেরই প্রতিনিধি যারা পুরানো স্মৃতিকেই আকড়ে বাঁচতে চায়। ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানসিকতা হারিয়েছে, কেবল করুণা প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছুই কামনা করতে শেখেনি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন—“বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাইনা কোন আনন্দ।”

এটি শিল্পী প্রেমেন্দ্রের একমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামগ্রিক বাংলাদেশের যন্ত্রণাবিদ্ধচিত্র শিল্পী প্রেমেন্দ্রের লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলাদেশের অবসাদ, ব্যর্থতা এবং হতাশা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে গভীর ভাবে আহত করেছিল—যা তার রচনায় কৃত্রিম ছাপ রেখে গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের লেখক। জীবনের অবসাদ অবসন্নতা তাকে আক্রমণ করলেও তার উপর প্রভুত্ব করতে পারবে না এমন বিশ্বাসের পরীক্ষায় প্রেমেন্দ্র সর্বদা জয়ী হতে

পারেন নি। যে জীবনাভিজ্ঞতা সংগ্রামশীলতা তার রচনায় থাকা উচিত ছিল তা থেকে তিনি পাঠককে বঞ্চিত করেছেন। তিনি সব্যসাচীর মতো বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করেছেন। উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন আর লিখেছেন অসংখ্য ছোটগল্প, ছোটদের গল্প, রহস্য গল্প। কিন্তু উপন্যাসে তো নয়ই এমন কি তার গল্প-কবিতাতে ও তিনি বলিষ্ঠ জীবনবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বটি বেশ স্পষ্ট। মানিকের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সে দ্বন্দ্ব যতটা স্পষ্ট অবশ্যই ততখানি নয়; হবার কথাও নয় কারণ 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস আর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' ছোটগল্প। উপন্যাসের ব্যাপ্তি এবং তীব্র Action ছোটগল্পে প্রত্যাশিত নয়। তাই 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের মানদণ্ডেও বিচার্য নয়। তেলেনাপোতা নামে কোন গ্রাম হয়তো বাংলাদেশে নেই। কিন্তু শহর থেকে ৩০-৪০ মাইল দূরে এই রকম অরণ্যবেষ্টিত গ্রামের সংখ্যা বাংলাদেশে বড় কম নেই।

শহরের সঙ্গে গ্রামের রয়েছে একটি চিরন্তন দ্বন্দ্ব। গ্রাম তার শান্ত রূপের ঐশ্বর্য্য দিয়ে শহরের মানুষকে আকর্ষণ করে। চোখে মোহিনী মায়ার অঞ্জন পরিয়ে তার মোহময় রূপ বিস্তার করে, তার আলো-আধারী খেলায়, পাখির কূজন আর কলতানে এতই মুগ্ধ করে রাখে যে বাস্তব জগৎ তার দৃষ্টিতে আসতে পারে না। একটি স্বপ্ন মেদুর পরিবেশে স্বর্গ সুখ লাভ করে মানুষ। তাছাড়া গ্রামের রাজনীতি অর্থনৈতিক কাঠামো প্রথাগত শিক্ষা সর্বত্রই দ্বন্দ্বের বীজ থাকে উপ্ত। গ্রামের চিরন্তন ট্র্যাজেডি হল—স্বপ্নময়ী-মায়াবী গ্রাম্য প্রকৃতি বেশীক্ষণ তার মায়ার জালে কাউকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। স্বপ্ন ভেঙে যেতেই মুহূর্তের মধ্যে তার কদর্য, ক্লেদাক্ত রূপ প্রকটিত হয়ে ওঠে। স্বপ্নের মায়াডোর ছিন্ন করে শহর তখন পতাকা নিয়ে বিজয় নৃত্য করতে থাকে। এ-গল্পে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বটি ততখানি তীব্র মাত্রা না পেলেও আছে। গ্রামের মায়াময় আলো আঁধারী রূপ কঠিন বাস্তবের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যে তেলেনাপোতা গ্রাম, যে গ্রাম্য রমণী যামিনী নায়কের চোখে মায়াঞ্জন পরিয়ে তার সামনে নিজের মোহিনী রূপ মেলে ধরেছিল সেই রঙিন আবরণ সরে গেছে। বাস্তবের কঠিন সত্যারূপ তার ভালবাসা তো দূরের কথা সামান্যতম সহানুভূতিও আদায় করতে অসমর্থ হয়েছে। অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি তার চোখে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে।

—"তেলেনাপোতা বলে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংস পুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি... (তার) কোন দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনামাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্ত আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যায়।"

এই গল্পে আরও একটি দ্বন্দ্ব আছে—ভাব বনাম বাস্তবের দ্বন্দ্ব। সমস্ত গল্পটি লেখক ভাববাচ্যে ব্যক্ত করেছেন। গল্পের নায়ক মনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস এবং ভাবের দ্বারা চালিত হয়ে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে গেছে। রোমান্টিক কবির মতো লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই অভিযানের বর্ণনায় তার রোমান্স সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাবের বশেই গল্পের নায়ক বলে উঠেছে—'না মাসিমা, আর পালাব না।'

কিন্তু ভাবের যেমন স্থায়িত্ব নেই। তেমনি নায়কও তার সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত অটল থাকতে পারেনি। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে নিজের গড়া কাল্পনিক সাম্রাজ্য নিজেই ভেঙে ফেলেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেক দূর পর্যন্ত নায়কের চোখে রোমান্সের আবরণ পরিয়ে তাকে ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি। একদিকে কল্পময় জগৎ অন্তদিকে রূঢ় বাস্তব গল্পের রচনাশৈলীতে বিশিষ্টতা এনেছে। গল্প হয়েছে সম্পূর্ণ ইঙ্গিতধর্মিতা। গল্পের পরিবেশ রচনায়ও তিনি সার্থক শিল্পী। রোমান্টিকতা, কবিত্ব শক্তির ঐকান্তিক প্রয়োগ এবং ম্যালেরিয়া-রূপ বাস্তবের আঘাত গল্পের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুটিত করে 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটিকে প্রচলিত গল্পের বিচারে একটি সার্থক ব্যতিক্রমী গল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' নামকরণে লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি চোখে পড়ে। 'আবিষ্কার' কথার অর্থ, যা বাস্তবে আজও অজানা অবস্থায়, তাকেই খোঁজা। 'তেলেনাপোতা' শুধুই একটি নাম। এই নামে কোন গ্রাম বাংলাদেশে হয়তো নেই। কিন্তু এহেন গ্রাম বাংলাদেশে খুঁজলে দু'চারটে নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। গল্পের পরিবেশ এবং লেখকের রচনা গুণে 'তেলেনাপোতা' বিশ্বাস্ত হয়ে উঠেছে। চেষ্টা করলেই এইরকম গ্রামের সঙ্গে আমরাও পরিচিত হতে পারি, তাকে আবিষ্কার করতে পারি। আসলে এটি গল্পের 'আবরনিক' অর্থ, প্রকৃত অর্থ নয়। অর্থের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করে গল্পের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে—আসলে লেখক তেলেনাপোতা বলতে নায়ক-নায়িকার মনের গভীরে অনাবিষ্কৃত সুপ্ত কোমল যে হৃদয় বৃত্তি, ভালবাসার জগৎ তাকেই বুঝিয়েছেন।

মার্কসবাদী গল্পকার সৌরী ঘটক — সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মার্কসবাদী সাহিত্য এবং কমিউনিস্ট সাহিত্য সমার্থক নয়। মার্কসবাদকে একটা দর্শন হিসেবে নিয়ে শোষক শ্রেণীর বিপক্ষে শোষিত মানুষের মুক্তির মনোভাব নিয়ে লিখলেই তা মার্কসবাদী সাহিত্য হয়। কোনো মার্কসবাদী দলের সদস্য ও কর্মী না হয়েও লেখক প্রগতিবাদী গল্প কবিতা লিখে থাকেন। কিন্তু সৌরী ঘটককে আমরা মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট সাহিত্যিক বলতে পারি।

সৌরী ঘটক সেই অঙ্গুলিমেয় মার্কসবাদী দায়বদ্ধ গল্পকারগণের অন্যতম ও অনন্য যাঁরা শ্রেণীসচেতনতা কি বলতে পারেন। তাঁর নিজস্ব গল্পসংকলন 'কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প' এর জন্যে সৌরীবাবু সম্পর্কে এই প্রশংসা অকুণ্ঠভাবে উচ্চারণ করছি।

সংকলনটিতে গল্প আছে চোদ্দটি। প্রথম গল্পের নাম কমরেড, শেষটির নাম কমিউনিস্ট পরিবার। চমৎকার পারম্পর্য বজায় রেখে সংকলনে গল্পগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে পড়লে গল্পগুলির এই বিন্যাস থেকে ক্রমান্বয় নিয়ে কিছুটা সামগ্রিকতা বা ঔপন্যাসিক সংহতি অনুভব করা যায়।

গল্পগুলির রচনাকালীন সময় সীমা এক যুগ, ১৯৬০ থেকে ১৯৭২। লেখককে ধন্যবাদ যে প্রথমতঃ তিনি প্রতিটি গল্পের শেষে রচনাকাল দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ গল্প সাজানোর সময় কালগত উত্তরণের পারম্পর্য রক্ষা করে শেষ গল্পে পৌঁছেছেন। এর দ্বারা লেখক এবং গল্পগুলির চরিত্র বুঝতে ও স্বাদ গ্রহণ করতে যথেষ্ট সাহায্য মিলেছে।

চোদ্দটির মধ্যে অরাজনৈতিক গল্প কোয়াক ডাক্তার, লজ্জা, ভাঙা নৌকার মাঝি, ভিটে ছাড়া, কৃতজ্ঞতা, ধনপতির বিয়ে, অনূঢ়া, মোট এই সাতটি। অর্থাৎ সৌরীবাবু আধাআধি ভাগ করে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক থেকেছেন। সৌরীবাবুর অরাজনৈতিক সাতটি গল্পের প্রত্যেকটিরই বিষয় ও চরিত্র নিঃসন্দেহে মানবিক। মানবিক হলেই মার্কসবাদী হয়, এরকম একটা সরলীকরণ ব্যাপার প্রগতি সাহিত্যে গোড়া থেকেই চলেছে। এই সুবাদেই অনেকে মার্কসবাদী খেতাব পাচ্ছেন। বিশেষতঃ শোষিত শ্রেণীর নরনারীকে নিয়ে লিখলে তো কথাই নেই। সৌরীবাবু 'কৃতজ্ঞতা' গল্প লিখেছেন রাইচরণকে নিয়ে। রাইচরণ একজন সর্বহারা যুবক। ফেলে হকারি করে। ঘরে বউ, বাবা আছেন। 'ঝিরঝিরি ঝরম' বেচে গলাবাজি

করে। কথার কৌতুক ও কারিগরি তার হাতিয়ার। পুলিশের সাথে হকারদের মারামারিতে রাইচরণ ফাটকে আট্‌কা পড়ল। ভেন্ডি প্যাসেঞ্জার লেখক তাকে টাকা দিয়ে মুক্ত করলেন। কিন্তু রাইচরণ পুলিশের হাতে যে মার খেয়েছিল তাতেই মারা গেল। তার বিধবা বৌ ও বৃদ্ধ পিতা একদিন লেখকের দরজায় এসে রেখে গেলেন একটা ফুলদানি, একজন সর্বহারার কৃতজ্ঞতা বোধের স্মারক। 'ভিটে ছাড়া' গল্পে বর্ণিত হয়েছে একজন গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের ট্রাজেডি। স্কুল বাড়ীর চাল মেরামতের জন্য পণ্ডিতমশাইকেই খড় ভিক্ষা মাগ্‌তে দোরে দোরে ঘুরতে হচ্ছে। হৃদয়বান লেখক তাঁকে চার পণ খড় দান করলেন। পণ্ডিতমশায়ও স্কুলের দুর্গতির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিকার চেয়ে গভর্ণমেণ্টকে ইংরাজীতে চিঠি লিখে দিলেন। পরিণামে আশি টাকা বেতনের পণ্ডিতমশায় সরকারের রোষানলে পড়ে ভিটে ছাড়া হলেন। উপকার করতে গিয়ে একজন 'সর্বহারা'র অপকার করে বসলেন একজন মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী।

'কোয়াক ডাক্তার' গল্পে সৌরীবাবু গ্রামের সেবায় নিযুক্ত একজন হাতুড়ের ট্রাজেডি এঁকেছেন। খোকা ডাক্তার নামে পরিচিত একজন 'নগ্নপদ' ডাক্তার শহরের পাশ করা ডাক্তারের কাছে কিভাবে লাঞ্ছিত হল, সে গল্প লিখতে গিয়ে লেখক শহুরে ডাক্তারের প্রতি ঘৃণা ও 'নগ্নপদ' চিকিৎসকের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। গাঁয়ের একটি গরীব মেয়ে পুড়ে গেছে। খোকা ডাক্তার সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে আলু বাটা লাগিয়েছেন এবং দরজা জানলা বন্ধ করে কোরা-মিনের ও ব্রাণ্ডির অভাবে একটু চোলাই খাইয়েছেন রোগিনীকে চাঙ্গা রাখার জন্য। এতেই গৃহস্থের সর্বস্ব দিয়ে পাল্কী করে আনা শহরের ডাক্তার চটেমটে লাল। কোয়াককে তিনি পুলিশে দেবার হুমকি দিলেন।

মুনিষ খাটা ক্ষেতমজুর ধনা ডোম বিয়ের পণ দশ কুড়ি টাকা সঞ্চয় করতে মাথার চুল সব সাদা করে ফেলেছে। সাত কুড়ি টাকা পণ দিয়ে যদিও সে শেষপর্যন্ত একটি কনে পেল, তবু তার বিয়ের সাধ ও স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। বুড়ো বরের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে বেঁকে বসল, কনেপক্ষের মেয়েরা। বরযাত্রী ও কনেপক্ষের মারামারিতে আহত হল ধনা ডোম। বিয়ের আসন থেকে উঠে এসে ধনা নিজের কুঁড়েতে 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া, পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' একটি মেয়ের স্বপ্ন চোখে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। 'ধনপতির বিয়ে' গল্পটির এই হল বিষয়বস্তু।

বিয়ের সাধ অপূর্ণ থাকাটাকে সৌরীবাবু যে নিদারুণ ট্রাজেডি মনে করেন তা বোঝা গেল এই একই বিষয়ের ওপর লেখা তাঁর আরো দুটি গল্প 'অনূঢ়া' এবং 'লজ্জা' পাঠ কোরে। এই গল্প দুটিতে ধনা ডোমের ট্রাজেডি পুরুষের ক্ষেত্র থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েদের জীবনে। 'লজ্জা'

গল্পটি যেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতাটির বর্ধিত তরল সংস্করণ। নিম্নবিত্ত সংসারে অর্থাভাবে জর্জরিত তিনটি আইবুড়ি ধিঙ্গি মেয়ে। এদের মধ্যে যেটি কনিষ্ঠা, তার মনস্তত্ব নিয়ে সৌরীবাবুর গল্প। শাড়ি পরার বয়স হলেও শাড়ির অভাবে সে ফ্রকই পরে। অথচ শাড়ি পরার খুব ইচ্ছা। ওপরের দুই দিদির বিয়ের সম্ভাবনাই যখন দেখা যায় না, তখন নিজের উদ্ভিন্ন বিয়ের স্বপ্ন যে কত অর্থহীন, তা সে জানে। তবু একদিন লুকিয়ে সে মায়ের শাড়ি পরে কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ বিহ্বল হয়। আর তখনই তার এই আদিখ্যেতা দেখতে পেয়ে দুই দিদি এসে তাকে 'বেহায়া' বলে পিটতে থাকে।

'অনূঢ়া' গল্পে চাকুরীজীবী কয়েকজন অবিবাহিতার বিয়ে না হবার ক্ষোভ ও যন্ত্রণাবোধ নিতান্ত ফ্লাট ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো এক সেবাদি যিনি চাকরী কোরে বিস্তর অর্থ শাড়ি গয়না করেছিলেন শেষ বয়সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁর কি দুর্দশা হয়েছিল, কি রকম মানসিক রোগগ্রস্থ হয়েছিলেন, সেই 'বাস্তব' দৃষ্টান্ত দিয়ে রেখা, নন্দিতারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন।

অরাজনৈতিক মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন গল্প-সপ্তকের শেষটির নাম 'ভাঙ্গা নৌকার মাঝি।' আতর আলি আর সাকিনা নিতান্ত গরীব একটি চাষী দম্পতি। কুঁড়ে ঘরে সাপের গর্তভরা মেঝেয় শুয়ে তারা চাষের মরশুমে ফসল উঠলে কোন্ মহাজনের ঋণ কতটা শুধবে এবং তার তা কতটা হিসাব কষে আর ভাবে 'যেমন করে হোক্ বাঁচতে হবে আগামী ফসল ওঠা পর্যন্ত।'

এই সাতটি গল্পের মধ্যে 'অনূঢ়া' 'লজ্জা' মামুলি। 'কোয়াক ডাক্তার' গল্পে শহরের ডাক্তারকে অতটা অভব্য ও বেআক্কেল দেখানোর দরকার ছিল না। এই দোষই গল্পটায় রয়ে গেছে। 'ধনপতির বিয়ে' গল্পে একজন মুনিষ খাটা সর্বহারার জীবনের ব্যর্থতা পনের টাকা দিয়ে একটি অল্প বয়সের মেয়ে কেনার দায় না দেখালেই লেখক ভাল করতেন। কেননা এখানে ট্র্যাজেডি উত্তরত।

'ভিটে ছাড়া' গল্পটি বড় বেশী দুর্বল এবং গতানুগতিক। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য এ জাতীয় সহানুভূতি বড় বেশী সুলভ। তাছাড়া গল্পটির বাস্তবতা বিশ্বাস যোগ্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এই আতিশয্য বিশ্বাস-যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তাঁদের শুভ অভিপ্রায়কে অনেকখানি নষ্ট করে দেয়। 'মার্কসীয় মূল্যবোধ' উচ্চে তুলে ধরার জন্য যখন দায়বদ্ধ লেখকগণ সর্বহারা চরিত্রের গুণ দেখাতে চান, তখন তাঁরাও প্রায়শ ফিউডাল লেখকদের অনুরূপ ভাববাদী আদর্শবাদের রোমান্স সৃষ্টি করে বসেন। যেমন করেছেন সৌরীবাবু 'কৃতজ্ঞতা' গল্পে। রাইচরণের কৃতজ্ঞতা দেখানর জন্য তার দণ্ডকারণ্যগামী রাইচরণের বিধবা বৌ ও বৃদ্ধ পিতাকে দিয়ে ফুলদানি পাঠানোটা মার্কসীয় বাস্তবতা নয়।—এও একরকমের পেটি বুর্জোয়া রোমান্স।

এ সংকলনের সম্পদ এর রাজনৈতিক গল্পগুলি। একজন ভারতীয় কমিউনিস্টের ছত্রিশ বছরের জীবন ও মনের ক্রম-পরিণতি বিধৃত হয়েছে 'কমরেড' গল্প দিয়ে শুরু করে 'কমিউনিস্ট পরিবার'-গল্পে। সাতটি রাজনৈতিক গল্পের দুটিতে রয়েছে কাকদ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ, তে-ভাগা আন্দোলনের দলিল। 'কমরেড' এবং 'অরণ্যের স্বপ্ন' গল্প দুটি একটি গল্পেরই দুটি রূপ। অন্যগুলির মধ্যে 'পরিচয়' গল্পে রাজবন্দী লেখকের চোখে রেলের কামরায় পুঁজিপতি মালিকের সাথে শাসকশ্রেণীর প্রশাসন যন্ত্রের আঁতাতের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। বুর্জোয়াদের চোখে কমিউনিস্টরা যে কী ভয়ঙ্কর ভীতি ও বিস্ময়ের জীব, সে পরিচয়ও তিনি এই অভিজ্ঞতায় লাভ করলেন। গল্পটির উপস্থাপন চমৎকার, বক্তব্যটুকুও সার্থক। 'স্বাধীনতার বলি' গল্পে গৌরীবাবু সাহসের সঙ্গে কুকুরকে সারমেয় না বলে কুকুরই বলতে পেরেছেন। ভেঁটা নামে যে ছোঁড়াটা চোদ্দ বছর বয়সে চোলাই ধরে বাঁশবনে আট বছরের মেয়ে মঙ্গনি হাড়িকে ধর্ষণ কোরে গাঁ থেকে পালিয়েছিল, সে একদিন নিজের গাড়ি চালিয়ে গ্রামে ফিরে এল কংগ্রেস সেবাদলের নেতা হয়ে। এখন তার নাম হয়েছে স্বদেশসেবক রায়। ব্যঙ্গ এখানে তীব্র এবং আক্রমণটা তীক্ষ্ণ। এ রকম গল্পের দরকার ছিল এবং আছে। সেবাদলের নামে গ্রামে ফুর্তি করতে গিয়ে গরীবের পোয়াতি বউ এর খালাসের জন্ত অনিবার্য প্রয়োজনে বিক্রীর জন্য রাখা খাসিটা যারা পিকনিক করতে জবরদস্তি নিয়ে যায় সেই কংগ্রেস নামক স্বদেশসেবকরা এখনো আছেন বলেই এ রকম গল্পের এখনো থাকা দরকার।

রেল ধর্মঘটের ওপর লেখা একটি গল্প 'হারামের ভাত।' রহম শেখ ইঞ্জিন চালক। রেল কলোনীর সবাই যখন অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেও ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে তখন রহম শেখ বেইমানি করল, দালাল হয়ে গেল। তার এই বেইমানিকে কেবল সহকর্মী শ্রমিকরাই ধিক্কার দিল না; ধিক্কার দিল তার নিজের মা ফাতিমা আর মা-মরা মেয়ে লায়লা। দালালির উপার্জনে রান্না ভাত থুতু দিয়ে ফেলে দিলে বুড়ি ফতিমা। বললে—এত্‌নে সাথীকে সাথ তুম বেইমানি কিয়া! এত্‌না রোজ কা বাদ তোম হাম্‌কো দালাল কি আম্মা বানায়া! ছিঃ! এ খানা হারাম্‌কা খানা।'

গল্পটি মার্কসীয় নৈতিকতায় অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু এখানেই বাস্তবতাবোধকে ব্যাহত করেছে।

এই সংকলনের একেবারে সময়ের ফরমায়েসী গল্পটির নাম 'মা।' ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই গল্পে ইয়া খানের বর্বরতা দেখাতে বাংলাদেশিদের ভারতে পালিয়ে আসার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একজন মা তার দলের সকলকে খানসেনাদের হাত থেকে বাঁচাতে ক্রন্দনরত তার শেষ কোলের বাচ্চাটাকে গলা টিপে মেরে ফেললেন। এরকম ঘটনা একটা কেন, ঐ

সময় এবং তার আগে পরে আরো বহুবার ঘটতেই পারে। কিন্তু ঘটনা ঘটলেই, এমন কি মানুষের কুকুরকে কামড়ানোর মতো রোমহর্ষক ব্যতিক্রমী ঘটনা হলেও, তা নির্বিচারে শিল্পের বিষয় হয় না। 'মা' গল্পেও হয়নি। সংকলনের এটিই সম্ভবতঃ দুর্বলতম গল্প। বাংলাদেশী মুক্তি যুদ্ধের সময়ের অপরিমিত আবেগের ফল এটি।

এইবার ফিরে আসি সৌরী ঘটকের দুটি ক্লাসিক গল্প 'কমরেড' ও 'অরণ্যের স্বপ্নে'। কৃষক সমিতির আত্মগোপনকারী জঙ্গী কর্মী কালিপদ তার স্ত্রী সুন্দরীকে অমানুষিক মারধোর করেছে। সুন্দরী নিজেও একজন সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী। পার্টির কাজের চাপে সে তার পলাতক স্বামী যখন রাতবিরেতে ঘরে ফেরে তখন তার যত্ন আত্তি করতে পারে না। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্বে কালিপদ রাগের মাথায় বউকে বেধড়ক মেরে বসেছে। কৃষক সমিতিতে নালিশ জানিয়েছে সুন্দরীর হয়ে ভুতোর মা, মহিলা সমিতির সেক্রেটারী। এ নিয়ে কৃষক সমিতি বিচার সভা বসিয়েছে। মেয়েরা সব এক কাট্টা। তাদের দাবী কালিপদকে শাস্তি দিতে হবে। পুরুষরা দ্বিধা বিভক্ত। বাইরে যখন মিলিটারী বিপ্লবী কৃষক কর্মিদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রতি রাত্রে গ্রামে 'রেইড' করছে তখন সমিতি কমরেড্‌দের এই ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বে ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সৌরী ঘটক বাংলা ছোটগল্পে কমিউনিস্ট গল্পের পথিকৃত হিসাবে গণ্য হবেন কারণ তাঁর আগে কমিউনিস্ট পরিবারের ভিতরের দ্বন্দ্বকে এমন সদর্থক ভাবে কেউ তুলে ধরেন নি। কমিউনিস্ট লেখকগণ বহিঃশত্রুর সাথে লড়াই দেখানোটাই 'মার্কসবাদ' মনে করেছেন। কিন্তু একটা সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্নতার মোহ থেকে কমরেড হিসাবে যাদের রিক্রুট করা হবে তাদের পারিবারিক ও আত্মিক লড়াইটাও যে একটা মস্ত বড় ব্যাপার থেকে যায়, সে কথাটা বিশেষ কেউ খেয়াল করেন নি। সৌরীবাবুকে ধন্যবাদ যে তিনি কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তের লড়াইয়ে তাদের পারিবারিক পিছুটান দ্বন্দ্ব ও কনট্রাডিকশানগুলিকে নিয়ে সার্থক গল্প লিখতে পেরেছেন। 'কমরেড্‌' গল্পটি অনন্য হয়ে উঠেছে সেখানেই যখন সমিতির দ্বারা স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ধিক্কৃত হয়ে ঘরে ফিরে সুন্দরীকে কাছে টেনে নিয়ে কালিপদ সম্বোধন করছে—"বৌ, কমরেড্‌!" এই উচ্চারণের দ্বারা এক পলকে লেখক কমিউনিস্ট সমাজে সামন্ততান্ত্রিক দাম্পত্য দ্বন্দ্বের অবসান কিভাবে হয় তা বলে দিয়েছেন।

বৌকে কমরেড্‌ করে নেবার মহান মার্কসীয় পথনির্দেশকে আর একভাবে শিল্পসুন্দর করেছেন সৌরীবাবু 'অরণ্যের স্বপ্ন' গল্পে। ১৯৭১-তে লেখা এই গল্পের পটভূমি সুন্দরবন। মিলিটারির বর্বর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে

আত্মগোপন করে আছেন কৃষক কর্মী ও নেতাগণ। আত্মগোপনকারী নেতাদের একজন হরিপদ। তার পুত্রবধূ পাখিকে মিলিটারী সাত দিন ধরে ক্যাম্পে রেখে বলাৎকার করেছে। তারপর মুমূর্ষু মেয়েটাকে মাঠে ফেলে রেখে গেছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কৃষক সমিতির কর্মী ও নেতারা বিচার করতে বসেছেন পাখিকে তুলে এনে কি করা হবে। হরিপদ তাকে ঘরে নেবে না, কারণ তার সতীত্ব গেছে। তাকে ঘরে নিলে বংশমর্যাদা হানি হবে। কিন্তু তার পুত্র গুণধর স্ত্রীকে গ্রহণ করতে উন্মুখ। সমিতির নেতা ও যুবকর্মীরাও পাখিকে গুণধরের কাছে রাখার পক্ষে। কেবল শ্বশুর হরিপদ নাচার। শেষপর্যন্ত গুণধর বাবার বিপক্ষে গিয়ে পাখিকে ঘরে নিয়ে এল। পাখি যখন স্বামীর কোলে মাথা রেখে বলল—'কেউ যদি ছিঃ ছিঃ করে', গুণধর ধক্‌ ধকে চোখে বলে উঠল—'মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলব না তাদের—?'

এই গল্পে গুণধরের আচরণ বাস্তবতা বিরোধী হলেও লেখকের ট্রিটমেণ্ট অসামান্য ও অভিনন্দনযোগ্য। অবশ্য এরকম আচরণ বাস্তবতা বিরোধীও নয়, কেননা, কমিউনিস্ট সমাজ গড়তে গেলে কমিউনিস্ট পরিবার আগে গড়ে নিতে হবে। 'কমরেড' এবং 'অরণ্যের স্বপ্ন' গল্পে সৌরী ঘটক প্রথম কমিউনিস্ট পরিবার গঠনের পথনির্দেশ করেছেন।

প্রেমচন্দ ঃ নীতি ও আদর্শ বোধের সাহিত্য

মিহির ভট্টাচার্য

প্রেমচন্দ বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকার জীবন দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর বাবার এবং নিজের চাকুরীর সুবাদে।

তাঁর ছেলে, হিন্দীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমৃত রায় লিখেছেন : "স্কুল মাস্টারির এই দীর্ঘ সময়ে প্রেমচন্দকে বহু ঘাটের জল খেতে হয়েছে। ক'বছর বাদে বাদেই তাঁকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদলি হতে হয়েছে—প্রতাপগড় থেকে এলাহাবাদ, সেখান থেকে কানপুর, কানপুর থেকে হামিরপুর ও বস্তী হয়ে গোরখপুর। এই সব স্থান পরিবর্তনের ফলে শারীরিক কষ্ট তো ভোগ করতেই হয়েছে আর এটাও ঠিক, বিভিন্ন জায়গার জল-হাওয়ায় তাঁর এমন স্থায়ী রোগ হল যার হাত থেকে কখনও নিস্তার পেলেন না। তবে সময় সময় মনে হয়, দু-চার বছর পর পর এই যে স্থান পরিবর্তন, নতুন নতুন মানুষের সংস্পর্শে আসা ; নতুন নতুন পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করা, কখনও ঘোড়ায় চড়ে, কখনও গরুর গাড়িতে করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার সুবাদে নিজের দেশের জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া ; নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন রূপকে প্রত্যক্ষ করা, তাঁর মতো সাহিত্যিকের কাছে একটা আশীর্বাদ হয়েই এসেছিল। অন্য কোন মানুষকে যদি এভাবে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত তাহলে তার জীবনে স্থিতি আসত না ; কিন্তু শুরু থেকেই মুন্‌শিজী সাহিত্যচর্চায় যেভাবে নিবেদিত প্রাণ হয়েছিলেন তাতে এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান মানসিক সম্পদ হিসাবে নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয়ে থাকবে।"

অমৃত রায় আরো লিখেছেন : "কেউ জিগ্‌গেস করলে হয়ত বলে দিতেন : 'আমার জীবনে কি এমন আছে যে অন্যকে তা শোনাতে হবে। একেবারে সরল, সমতল জীবন, দেশের অন্য কোটি-কোটি মানুষের জীবনের মত। সাদাসিধে, সংসারের আবর্তে পর্যুদস্ত এক দরিদ্র শিক্ষকের জীবন, সারাজীবন যে কলম পিষেই গেছে, জীবনে হয়ত কিছু স্বস্তি মিলেছে, হয়ত তাও হয় নি। এতে আছেই বা কী যে আমি অপরকে তা শোনাব। আমি তো নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারকেল গাছ, হাওয়ার ঝাপটায় আমার ভিতরেও শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। এই তো কথা! আমার নিজের কিছু নেই, যা কিছু তা হল ঐ হাওয়ার, যে হাওয়া আমার ভিতরে বাজছে।' যে হাওয়া

তাঁর ভিতরে বেজেছে তা হল তাঁর সাহিত্য, ভারতবর্ষের জনসাধারণের সুখ-দুঃখের কথা, আমার আপনার সুখ-দুঃখের কথা।"

প্রেমচন্দ যতই বিনয় সহকারে নিজেকে তুলে ধরে থাকুন না কেন তিনি একটা গভীর সত্য উচ্চারণ করেছেন তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে। বড় মাপের সব লেখকেরই সাহিত্যে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ পড়ে। 'দেশের অন্য কোটি-কোটি মানুষের জীবনের মত' জীবন হওয়ার সুবাদেই তাঁর গল্পে আমরা পেয়েছি গ্রামীণ জীবনের, সাধারণ মানুষের নির্ভুল, নিখুঁত জীবনচিত্র। সে চিত্র উঠে এসেছে জীবনের মর্মমূল থেকে। তাতে ফুটে উঠেছে সমাজ, সংসার, শ্রেণী ও ব্যক্তির প্রবহমান জীবন, তার আস্তিত্বের সঙ্কট এবং ইতিবাচক জীবনবোধ। প্রেমচন্দ শুধু সমাজ ও জীবনকে দেখেছেন তাই নয় তাঁর ছিলো সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শ বোধ। তাই তাঁর বেশির ভাগ গল্পে দেখতে পাই লেখক প্রায় প্রচারক, তাঁর সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা কোথাও সামান্য বিচ্যুতির শিকার হয় নি। তিনি শ্রেণী হিসেবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর ও নিম্নবর্ণের নিষ্পেষিত হিন্দুদের পক্ষে থাকলেও কোনরকম অন্ধ ভাবালুতার কূপবাসী হন নি। তিনি মানুষকে শুধু সমষ্টি হিসেবে না দেখে ব্যক্তিরূপেও দেখেছেন। এইখানে গল্পকার হিসেবে প্রেমচন্দের মহত্ত্ব।

আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তথাকথিত প্রবক্তারা সাহিত্য-বিচারে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে এবং ব্যক্তিজীবনের একান্ত সঙ্কটকে সাধারণতঃ অস্বীকার করার চেষ্টা করে থাকেন। তাঁরা নিজেদের অন্ধত্ব ঘোচাবার জন্য প্রেমচন্দকে অধ্যয়ন করে দেখতে পারেন। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে হিন্দী সাহিত্যে তো বটেই, সমগ্র ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে প্রেমচন্দ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যতত্ত্বের পথিকৃৎ এবং হয়তোবা এখনও সর্বাগ্রগণ্য রূপকার।

হিন্দুস্থানের (হিন্দী ও উর্দুভাষী ভারত) জনজীবন, তার সংগ্রাম, তার সঙ্কট, গ্রামীণ সমাজ, ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, পশ্চাদ্‌পদতা যেভাবে তাঁর গল্পে উঠে এসেছে তা পড়ে ভাবতে অবাক লাগে যে সেই সত্য আজও কত নির্মমভাবে বহাল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের যে চরিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন তা এত বছর পরেও অপরিবর্তিত। কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এভাবে মানবচরিত্রের শ্লথপরিবর্তনশীলতা যথার্থে বিধৃত হয়। প্রেমচন্দ আমাদের কাছে এই ক্ষেত্রে শুধু সাহিত্যিক হিসেবেই শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন না, তিনি সামাজিক ইতিহাসকারের মহান ভূমিকায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর গল্পের সঙ্গে অর্ধশতাব্দীরও বেশি পরের ভারতের চিত্র মেলাতে গিয়ে দেখতে পাই আমাদের সমাজ ও

জীবন ব্যাপক জনসাধারণের ক্ষেত্রে কত সামান্যই না পরিবর্তিত হয়েছে বিশেষতঃ যে অঞ্চলকে অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই অঞ্চলে। প্রেমচন্দের চিন্তার বলিষ্ঠতা তাঁর স্বীয় জীবনের মতোই বলিষ্ঠ। নারীর সমানাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে সেইকালে দাঁড়িয়ে তিনি যে গল্প লিখেছেন তার সমকক্ষ গল্প সমকালে এক-আধটি চোখে পড়লেও তাঁর সমসাময়িককালে কটি লেখা হয়েছে তা গবেষণার বিষয়। আত্মগর্বী বাংলা সাহিত্যকেও বোধহয় সেখানে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

শুধু বিষয়বস্তুতে নয় গল্প বলার ঢংয়েও প্রেমচন্দ অনন্য। তিনি আগাগোড়া প্রাচ্যরীতিতে গল্প বলেছেন। প্রতীচ্যের টেকনিক-নির্ভরতা তাঁর গল্পে অনুপস্থিত। তিনি সর্বত্র পরম্পরাগত ভারতীয় কথক। মানবচরিত্র এঁকেছেন, মানবমনের জটিলতা ও বৈচিত্র্য উপস্থিত করেছেন আখ্যানে; মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নয়। তার কারণ কৈশোরে প্রধানতঃ ফারসি ও উর্দু রচনা অধ্যয়ন। প্রাচ্যের গল্পকথনে যে পরনকথাধর্মিতা ও সোজা সরল ভঙ্গিতে কাহিনী বর্ণনার ঐতিহ্য রয়েছে তা আমাদের স্বকীয় ঐতিহ্য ও জনজীবন তথা জনমানসের অঙ্গ। ফলে প্রেমচন্দের গল্পবলার প্রায় গ্রামীণ সারল্য এবং অন্তর্গূঢ় গভীরতা বিদগ্ধ ও সাধারণ উভয় পাঠককেই সমানভাবে ধরে রাখে। তিনি গল্প শুরু করেছেন আড়ম্বরহীনভাবে, কোনরকম চমক ছাড়াই আবার শেষও করেছেন সেইভাবে। অথচ পাঠশেষে পাঠক তৃপ্ত হন একটি নিটোল গল্প পেয়ে, কিছু ভাববার উপকরণ নিয়ে এবং একটি মূল্যবোধের মুখোমুখি হয়ে। এর ব্যতিক্রম প্রায় নেই। যেগুলিতে তিনি এই সীমানা ভেঙে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব ও জীবন বোধের সঙ্কটকে প্রবলভাবে উপস্থিত করেছেন সেই গল্পগুলি সর্বকালের আধুনিক (যেমন—পূস কী রাত, সুজান ভগত, সদ্‌গতি, কফন, অগ্নিসমাধি ইত্যাদি)।

পূস কী রাত বা পৌষের রাত গল্প শুরু করেছেন এইভাবে: "হলকু এসে বউকে বলল—'সেই সহনা-টা এসেছে। দাও, যে কটা টাকা দিয়েছিলাম, দিয়ে দিই ওকে। আপদ তো বিদেয় হোক।'

"মুন্নী ঝাঁট দিচ্ছিল। পেছন ফিরে বলল—'তিনটে তো মাত্তর টাকা, দিয়ে দিলে কম্বল কোত্থেকে আসবে শুনি? পৌষ-মাসের রাতে খেতের টঙে কী করে কাটাবে? ওকে বলে দাও, ফসল উঠলে টাকা চুকিয়ে দেব। এখন নেই'।"

শেষ করেছেন: "দুজনে আবার খেতের আলে এসে দাঁড়ায়। দেখে, সারাটা খেত তছনছ হয়ে গেছে, জবরা মাচার নিচে চিত হয়ে শুয়ে, যেন তার ধড়ে প্রাণ নেই।

"দুজনেই খেতের হাল দেখে। মুন্নীর মুখে বেদনার ছায়া। হল্‌কু কিন্তু খুসি।

"চিন্তিত হয়ে মুন্নী বলে—'এখন জনমজুর খেটে জমির খাজনা শুধতে হবে।'

"খুশিমুখে হল্‌কু বলে—'রাতে শীতের মধ্যে তো আর এখানে শুতে হবে না'।"

মাঝখানে পাঠক এমনি ভঙ্গিতেই বর্ণনা পায়—টাকা কটা দিয়ে দেওয়ার ফলে পৌষের ভয়ঙ্কর শীতের রাতে খেত পাহারা দেওয়ার জন্য হল্‌কু একান্ত প্রয়োজনীয় কম্বলখানা কিনতে পারলো না। কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়ে, পাতা পুড়িয়ে আগুন জেলেও হল্‌কু শীতের কাছে পরাজিত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ায় তার খেতের ফসল নীল গাইয়ের দল বরবাদ করে দিয়ে গেছে। সে জেনেশুনে তাড়া করতে পারেনি! একজন কৃষকের "জীবনের চেয়ে মূল্যবান ফসল"—এর যে ভাবনা আমরা ভেবে থাকি সেটা ধাক্কা খায়। প্রেমচন্দ আমাদের বিশ্বাস করিয়ে ছাড়েন যে ব্যক্তিমানুষের কাছে সকল ভাবালুতা ও আবেগের উর্ধ্বে জীবনপ্রীতি, বেঁচে থাকার তাগিদ ও দৈহিক নিরাপত্তা। তাই মুন্নী আর হল্‌কু স্বামী-স্ত্রী হয়েও, সমান বৈষয়িক স্বার্থের ভাগীদার হয়েও ফসল নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দু'রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ গল্পে আমরা যে মৌল প্রশ্নের সম্মুখীন হই তাহলো শেষপর্যন্ত যৌথ বা সমষ্টি মানসিকতার বাইরেও ব্যক্তিমানুষের স্বীয় অস্তিত্বের সঙ্কট পরিস্থিতিজনক কারণে বেশি গুরুত্ব লাভ করতে পারে।

সুজান ভগত গল্পের আরম্ভ: "সাদাসিধে চাষীদের হাতে টাকা এলেই তাদের মনটা ঝোঁকে ধর্মকর্ম আর কিছু না কিছু কীর্তি স্থাপনের দিকে। অভিজাত সমাজের মতো তারা নিজেদের ভোগ বিলাসের দিকে ধাবিত হয় না। সুজানের খেতে কয়েক বছর ধরেই সোনা ফলছে। পরিশ্রম তো গ্রামের সব চাষীই করত, কিন্তু সুজানের এমনই কপালগুণ ছিল যে সে শুকনো জায়গাতেও কিছু দানা ছাড়িয়ে দিলে সেখানেও কিছু না কিছু ফলত। পর পর তিন বছর একনাগাড়ে আখের ফলন হল। ওদিকে বাজারে গুড়ের দামও বেশ চড়া; ফলে কম করেও দু'আড়াই হাজার টাকা হাতে এসে গেল। অমনি তার চিত্তবৃত্তি ধর্মকর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সাধু-সন্তদের সেবা-সৎকার শুরু হল. দরজায় ধুনী জ্বলতে শুরু করল। আজকাল কানুন-গো এই এলাকা সফরে এলে সুজান মাহাতোর বার-বাড়িতেই বিশ্রাম করে। এলাকার হেডকনস্টেবল, জমাদার, শিক্ষাবিভাগের অফিসার প্রভৃতি একজন না একজন সব সময়েই সেই আটচালা অলঙ্কৃত করে। মাহাতোর আর আনন্দের সীমা নেই। ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন। তার বাড়িতে এখন

বড়ো বড়ো হাকিমরাও পায়ের ধুলো দেন। যে সব হাকিমদের সামনে তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোত না, সেই সব হাকিমরাই এখন দিনরাত মাহাতো মাহাতো করে। তার বাড়িতে এখন মাঝে মাঝেই নামগানের আসর বসে।"

এইভাবে সুজান মাহাতো সুজান ভগতে (ভক্তে) পরিণত হয়ে গেলো। নিজের কায়িক শ্রম ছেড়ে সে ধর্মকর্ম আর দানধ্যান নিয়ে থাকে। সে এতই ধর্মভীরু হয়ে উঠলো যে তার সব বৈষয়িক বুদ্ধি লোপ পেতে শুরু করলো। তার মহত্ত্বে গ্রামের লোকের কাছে, দশজনের মুখে সুনাম ও মান বেড়ে গেলো। কিন্তু নিজ পরিবারের কর্তৃত্ব তার হাতছাড়া হয়ে গেলো। ক্রমান্বয়ে সে তার ছেলে আর স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো। একদিন সে আবিষ্কার করলো তার ইচ্ছেমতো ভিখারীকেও দান করার ক্ষমতা নেই। সুজান নিজের কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মেহনতের জগতে ফিরে এলো এবং ফিরে পেলো কর্তৃত্ব। ফিরে পেলো স্বহস্তে স্বেচ্ছামতো দানধ্যানের অধিকার। প্রেমচন্দ গল্প শেষ করেছেন : "এই বলে ভগৎ সর্বশক্তি দিয়ে গাঁঠরি উঠিয়ে মাথায় নিল এবং ভিক্ষুকের পিছনে পিছনে চলল। যে দেখল সেই ভগতের পৌরুষ দেখে অবাক হল। কেউ জানতে পারল না কোন্ নেশার প্রভাবে ভগৎ এখন উজ্জীবিত। আটমাস ধরে অবিরত পরিশ্রমের ফল সে আজ পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া অধিকার। যে ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কলাও কাটা যেত না, শান্ দেওয়ার পর তা দিয়েই আজ লোহা কাটা যাচ্ছে। মানুষের জীবনে নিষ্ঠা একটা মহৎ ব্যাপার। যার নিষ্ঠা আছে, সে বৃদ্ধ হলেও যুবকের মতো সজীব। যার মধ্যে নিষ্ঠা নেই, মর্যাদাবোধ নেই, সে যুবক হলেও মৃতপ্রায়। সুজান ভগতের নিষ্ঠা ছিল, আর তা তাকে অমানুষিক শক্তি দান করেছিল। যাওয়ার সময় সে ভোলার দিকে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এখানে ভাট আর ভিক্ষুক যারা এসেছে, তারা যেন খালি হাতে কেউ না ফেরে।'

"ভোলা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাঁ না কিছুই বলতে পারে না। বৃদ্ধ পিতার কাছে সে ভীষণ ভাবে হেরে গেছে।"

এ গল্পে নীতিবাদী প্রেমচন্দ প্রচারে প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে আখ্যানভাগের মাধ্যমে জীবনের যে মহৎ সত্যটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে তাহলো ধর্মই বলো আর মাহাত্ম্যই বলো সবই বৈষয়িক কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল আর সে কর্তৃত্ব বজায় থাকে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ শ্রমের সাহায্যে। নিজের হাতে গড়া সমৃদ্ধি, পরিবার শ্রম থেকে সরে গেলে হাতছাড়া হয়ে যায় আর নিজেকে হতে হয় পরমুখাপেক্ষী। নিঃসন্দেহে বলা যায় ভাবালুতা ও ভাববাদী ভাবনার এই দেশে এমন বলিষ্ঠ জীবনবাদী চেতনার প্রবল উপস্থাপনা

আমরা খুব কম গল্পলেখকের কাছ থেকেই পেয়েছি। প্রেমচন্দের গল্পে এই দার্ঢ্য বার বার এসেছে। বার বার এসেছে শ্রমের প্রতি এই মর্যাদাবোধ। এ প্রসঙ্গে 'শান্তি', 'কুসুম' এবং 'মুক্তিমার্গ' গল্পের কথা এসে পড়ে।

প্রথম দুটি গল্প প্রধানতঃ নারীর মানমর্যাদার প্রশ্নকে অবলম্বন করে বলা। 'শান্তি' গল্পে লেখকের বন্ধু দেবনাথের স্ত্রী গোপা বিধবা হয়েও, নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও অবিচল থেকে নিজের মানমর্যাদা রক্ষা করে গেছে। সে কারো করুণাপ্রার্থনা করেনি। পারিবারিক বিশেষতঃ স্বামীর মর্যাদার কথা স্মরণ করে সে তার সাধ্যাতীত ব্যয় করে মেয়ে সুনীতার বিয়ে দিলো। কিন্তু সুনীতার স্বামী চায় সে নিজের মর্জিমাফিক চলবে আর স্ত্রী স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে মানবে। সুনীতা এইভাবে বাঁচতে চায়নি। সে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে না এসে তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে ফেলতে থাকে। তার স্বামী কেদার এক অভিনেত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেলে সে হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলেছিলো, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছিলো। সেখানেই শেষ নয়। সুনীতা যমুনায় ডুবে মরে গেলো। একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও গোপা শান্ত, ধীর। সে বললো—"···সুন্নীর মৃত্যুতে আমি খুশি হয়েছি। অভাগিনী, নিজের মানমর্যাদা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।" লেখক সন্দেহ করেছেন যে "গোপার মনের এই প্রশান্তি তার আকুল বেদনার নামান্তর নয়তো ?" কিন্তু গল্পের শেষে লেখকের উক্তিতে গোপা বা সুনীতার চরিত্রের দার্ঢ্য আমাদের কাছে আড়াল হয় না। প্রতিকূল সমাজমানস ও সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিমানুষের প্রতিবাদের ভাষা তো বিভিন্ন। ব্যক্তির নেতিবাচক প্রতিবাদের ইতিবাচক ফলই সমষ্টি বা প্রবহমান জীবনের রসদ।

প্রেমচন্দের জীবনবোধ ও মানবতায় যেহেতু নেতিধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই সেইহেতু সুনীতার ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে নারী আত্মমর্যাদার দীপ্ত প্রতীক হিসেবে আমরা পাই 'কুসুম' গল্পের কুসুমকে। লেখকের পুরনো বন্ধু নবীনবাবুর মেয়ে কুসুমের দেখেশুনে বিয়ে হলো ভালো বরে ভালো ঘরে। কুসুম স্ত্রী হিসেবে যেকোন যুবকের কামনার নারী। তবু তার স্বামী তাকে অবহেলা করে এবং শেষমেষ জানিয়েছে সে দ্বিতীয় বিয়ে করবে স্থির করেছে। কুসুম যৎপরোনাস্তি বিনীতভাবে স্বামীর দাসী হিসেবে নিজের জায়গা চেয়েছে। কুসুমের লেখা চিঠিগুলো তার স্বামী ফেরত পাঠিয়েছে। সেই চিঠি পড়ে লেখক ক্ষুব্ধ যে মেয়েটা এরকম নিষ্ঠুর স্বামীর করুণা কেন প্রার্থনা করছে। তিনি মোরাদাবাদে গেলেন ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর ধারণা হয়েছিলো যুবকটি "হয় চরিত্রহীন নয় বুদ্ধিহীন"। তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। "পাড়ায়, কলেজে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সবাই তাকে প্রশংসা

করছে।" ছেলেটির ব্যবহারে, বিনয়ে তিনি প্রীত। কিন্তু কথা বলে জানতে পারলেন যে নবীনবাবু তার বিলেতে পড়তে যাওয়ার খরচ দিচ্ছে না বলেই কুসুম অবহেলিত। তার বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই ছিলো না শুধুমাত্র ঐ খরচ পাওয়ার আশাতেই সে মেয়েটিকে বিয়ে করেছে এবং দ্বিতীয় বিয়ের পেছনে তার একই চিন্তা। অবশ্য বিয়ের আগে ঐ খরচের কোন কথা নবীন-বাবুর সঙ্গে তার হয়নি।

বন্ধুর মুখে কারণ জেনে নিজের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও নবীনবাবু মেয়ের জীবনকে সুখী করার জন্য ছেলেটির প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। সবাই স্বস্তি পেলো। কিন্তু কুসুম বেঁকে বসলো। যে কুসুম স্বামীর মনে ঠাঁই পাওয়ার জন্য ভিখারিণী হতে রাজি সে বললো—"যে লোক এত স্বার্থপর, এত দাম্ভিক, এত নীচ, তার সঙ্গে আমার পোষাবে না।···আমি এরকম লোকের মুখও দেখতে চাই না।" "কারণ এই যে, এটাও একরকমের ডাকাতি, যা শয়তান-বদমায়েসদের কাজ। যেন কাউকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে বাড়ির লোকেদের কাছে মুক্তিপণ হিসেবে বেশ বেশি টাকা আদায় করা।"

এই গল্পের স্বামী যুবকটির কোন নাম নেই। এদের নাম তো অজস্র এবং আজও। কিন্তু কুসুম? আজও কুসুমের গলায় আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয় না কেন—"আমি স্বাধীন থাকার সঙ্কল্প নিয়েছি?"

"মুক্তিমার্গ" গল্পে প্রেমচন্দ দেখিয়েছেন—মানুষ শ্রমজীবি হলে তার মধ্যে ঘুচে যায় স্বার্থের সজ্ঘাত, ফিরে আসে অকপটতা, সততা। ঝিঙ্গুর আর বুদ্ধু একই গাঁয়ের চাষী ও ভেড়াপালক। পরস্পরের বিরোধিতা করার জন্য উভয়েই চরম নীচতার আশ্রয় নেয়। ফলে তারা সব হারায়। "ঝিঙ্গুরের কোন সম্পদ নেই, বুদ্ধুরও নেই। কে কাকে হিংসে করবে, আর কেনই বা করবে?" তাই আমরা দেখি ওরা দুজনে একসঙ্গে রুটি তৈরি করে খায়। "খাওয়া হলে পর তামাক সাজাল কল্কেতে। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দু'জনে ধূমপান করতে লাগল পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

"বুদ্ধু বলল—তোমার আখের খেতের আগুনটা··ওটা আমিই লাগিয়েছিলাম।

"ঝিঙ্গুর হালকাভাবে বলল—জানি।

একটু পরে সে আবার বলল—বাছুরটাকে বেঁধেছিলাম আসলে আমি,··· আর হরিহর ওটাকে কি একটা খাইয়ে দিয়েছিল।

"বুদ্ধুও ঠিক সেইভাবে বলল—জানি।

"তারপর দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল।"

প্রেমচন্দ গ্রামীন জীবনের মহাকবি। স্থির নিস্তরঙ্গ বিশ্বাস, সরলতায় মানুষগুলো প্রকৃতির অঙ্গ আবার তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে

প্রকৃতিরই মতো। কিন্তু ক্রমে তাদের সখ্য দৃঢ় হয়, মানবিকতা সমৃদ্ধ হয়।

গ্রামীণ জীবনের কথা বলতে গিয়ে প্রেমচন্দ নিজেও গ্রামীন সরলতায় পৌঁছে গেছেন কোন কোন গল্পে। আখ্যান লোককাহিনীর রূপ নিয়েছে কিংবা কিংবদন্তি তাঁর হাতে গল্প হয়েছে। 'জাঁতা বুড়ির কুয়ো', 'নিমকের দারোগা', 'মন্ত্র ২' ইত্যাদি গল্প এই শ্রেণীভুক্ত। এর মধ্যে 'নিমকের দারোগা'-য় তিনি মানবিক গুণাবলীকে আদর্শায়িত করলেও বস্তুতঃ শ্রেণী-সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

'জাঁতা বুড়ির কুয়ো' গল্পে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের হাজির করেছেন প্রেমচন্দ। গোমতী মৃত্যুর সময় চৌধুরী বিনায়ক সিংহকে জীবনের সঞ্চয় তুলে দিয়ে অনুরোধ করে একটি কুয়ো খোঁড়ার জন্য যাতে গ্রামের লোকের জলের প্রয়োজন মেটে। গোমতী মরে যায়। চৌধুরীর ছেলে সে টাকা ব্যবসায় লাগায়। ফলে চৌধুরী বা তার ছেলের জীবনকালেও কুয়ো হলো না। ইতোমধ্যে বুড়ি গোমতীর ভূত দেখা দিয়েছে চৌধুরীর ছেলে ও স্ত্রীকে। চৌধুরী ও তার ছেলের মৃত্যুর পর তাদের পারবারে নেমে এলো দুর্যোগ। চৌধুরীর স্ত্রী মরে গেলো। রইলো অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ। দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত তার জীবনে এলো একটি মেয়ে। খেলতে খেলতে সেই মেয়ের হাতেই খোঁড়া হলো গোমতীর জমিতে সেই প্রতিশ্রুত কুয়ো। যারা খুঁড়লো সেই বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা জানতোও না সেই প্রতিশ্রুতির কথা।

'নিমকের দারোগা' বংশীধর "এলাকার সবচেয়ে মানী জমিদার" পণ্ডিত আলাপীদীনকে নুন চোরাইচালান করার সময় হাতে-নাতে ধরে। কোন প্রলোভনেই সে তাকে ছাড়লো না। কিন্তু বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন সব পণ্ডিতজীর পকেটে। সুতরাং পণ্ডিতজী সসম্মানে ছাড়া তো পেলেনই বংশীধরের চাকরী গেলো। আলাপীদীন এবার এলেন তার কাছে। বংশী-ধরের সততায় মুগ্ধ পণ্ডিতজী তাকে নিজের "সমস্ত সম্পত্তির স্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত" করলেন। "পরমেশ্বরের কাছে শুধু এটাই প্রার্থনা তিনি আপনাকে যেন চিরকাল নদীতীরের সেই স্পষ্টভাষী, উদ্ধত, কঠোর অথচ ধর্মনিষ্ঠ দারোগা করে রাখেন।" আজকের দিনে এ কাহিনী হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধরনের কিংবদন্তিমূলক উপাখ্যান এক সময় প্রচলিত ছিলো, হয়তোবা অত্যন্ত গ্রামীন প্রদেশে "বড় মানুষের" মহত্ত্ব এবং আদর্শায়িত রূপকথার নায়ক কর্ম-চারীর চারিত্রিক দৃঢ়তার গল্প আজও শোনা যেতে পারে। কিন্তু কোন বড় মাপের সাহিত্যিক যে এমন সরল বিশ্বাসে তাকে তুলে ধরতে পারেন— সেটা আমাদের কাছে বিস্ময় সৃষ্টি করে। তবে মানুষের মহত্ত্বে বিশ্বাসী প্রেমচন্দ তার সদ্‌গুণেরই জয়গান করতে চেয়েছেন। যেমন অনুরূপ ধর্ম ও

চরিত্রের গল্প লিখেছেন 'মন্ত্র ২'। এই গল্পেও আমরা দেখতে পাই মানুষের সদ্‌গুণের জয়। অথচ আখ্যানভাগে তিনি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চেয়ে ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের শক্তিকে ক্ষমতাবান বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ধরনের গল্পগুলোতে আমরা দেখতে পাই প্রেমচন্দের মানবতা ও বাস্তবচেতনা সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম-সমাজের যে সত্য দেখতে সাহায্য করেছিলো তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা সেই স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন এ কথা বলার ধৃষ্টতা কেউ দেখাবে না ঠিকই তবে হিন্দুধর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন এ কথা অস্বীকার করার উপায়ও নেই। 'মন্ত্র ১' গল্পে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে স্বধর্ম রক্ষার পথ দেখিয়েছেন। আর্যসমাজী তত্ত্ব এই গল্পে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। তিনি লিখেছেন—"কিন্তু এই নতুন দীপ্তি মোল্লাদের মুখ-চোখ বিবর্ণ করে দিলো। সেখানে এমন এক দেবতা অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি মরা লাশকেও বাঁচিয়ে দেন, যিনি তাঁর ভক্তদের মঙ্গলের জন্যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন। মোল্লাদের মধ্যে সেই সিদ্ধি, সেই মহিমা, সেই অলৌকিক ক্ষমতা কোথায়? এরূপ এক জলন্ত উপকারের সামনে জান্নাত আর ভ্রাতৃত্বের আনকোরা যুক্তি-প্রমাণ কি দাঁড়াতে পারে? পণ্ডিতজী এখন আর নিজের ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে দর্প করার পণ্ডিতজী নন। তিনি শূদ্র আর ভীলদেরও ভালবাসতে শিখেছেন। তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পণ্ডিতজী আর ঘৃণা বোধ করেন না। নিজেদের ঘর অন্ধকার দেখেই তারা ইসলামী প্রদীপের দিকে ঝুঁকেছিল। এখন তাদের নিজেদের ঘর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, অন্যের দ্বারে যাওয়ার প্রয়োজন কি তাদের। সনাতন ধর্মের জয়-জয়কার ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। গাঁয়ে গাঁয়ে মন্দির তৈরি হয়, সকাল-সন্ধ্যে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। লোকের আচার-ব্যবহার আপনা থেকেই মার্জিত হয়ে উঠতে থাকে। পণ্ডিতজী কাউকেই শুদ্ধ করেননি। এখন 'শুদ্ধি'-র নাম নিতেই লজ্জা বোধ করেন তিনি—আমি কেন ওদের শুদ্ধ করতে যাব বাপু, আগে নিজেকেই শুদ্ধ করে নিই। এমন নির্মল পবিত্র আত্মা যাদের, 'শুদ্ধি'-র ভণ্ডামিতে তাদের অপমান করতে পারিনে।" হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তথা ক্ষত্রিয়দের প্রতি তীব্র কশাঘাত প্রেমচন্দের বহু গল্পেই আছে। 'নিমন্ত্রণ', 'শ্রীমোটেরাম শাস্ত্রী', 'ঠাকুরদের কুয়ো', 'মন্দির', 'শূদ্রা', 'সদ্‌গতি' প্রভৃতি গল্পে এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

ভারতে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক আধিপত্যের ভিত হলো জাত-পাত ও ধর্ম। ধর্মীয় চেতনাকে আক্রমণ না করলেও প্রেমচন্দ সামন্ততন্ত্রের অন্যান্য সমস্ত ভিতকেই আক্রমণ করেছেন। তাঁর 'সওয়া সের গেঁহু', 'সদ্‌গতি' বা 'শৎরঞ্জ কে খিলাড়ী' যেকোন

সাহিত্যের গর্ব। ভারতীয় সমাজে সামন্ততান্ত্রিক নিষ্পেষণের নির্মম সত্য চিত্র প্রথম দুটি গল্প। শেষ গল্প ভেঙেপড়া সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের শূন্যতার মর্মভেদী রূপ। শেষ দুটি গল্পের চলচ্চিত্রায়িত রূপ আমাদের পরিচিত। 'সোয়া সের গম' মহাজনী অত্যাচারের এক বাস্তব রূপ। সামান্য সোয়া সের গম ধার নিয়ে কিভাবে এক ব্রাহ্মণের বেগার হয়ে গেলো শঙ্কর নামে এক চাষী। বিশ বছর বেগার খেটেও সে ঋণ শোধ হলো না। তার ছেলের ঘাড়ে চাপলো সে ঋণের দায়। সে-ও বেগার খাটতে বাধ্য। "এরকম শঙ্কর আর এরকম বিপ্রজী পৃথিবীতে কিছু কম নেই।"

একসঙ্গে প্রেমচন্দের বহু গল্প পাঠের শেষে আধুনিক পাঠকের তৃপ্তির হানি হতে পারে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আঙ্গিক ও শৈল্পিক বৈচিত্র্য তাঁর গল্পে অনুপস্থিত। তিনি সরাসরি কাহিনী বলেছেন এবং বিশেষ নীতি ও আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছেন। গল্পের শিল্পকর্মের প্রতি তাঁর কোন ঝোঁক দেখা যায় না। এ ব্যাপারে তাঁর কোন সচেতন অনুশীলনের ছাপও নেই। তবে কোন কোন গল্পের মানবিকতা এমন মাত্রায় উত্তীর্ণ যে শিল্পের নিপুণতা স্বাভাবিক ভাবে এসে গেছে। পূর্বে উল্লেখিত অনেকগুলি গল্প ছাড়া সাহিত্যকর্ম হিসেবে আমাদের মুগ্ধ করার মতো গল্প হচ্ছে 'অগ্নিসমাধি' এবং 'কফন'।

'অগ্নিসমাধি' গল্পের পয়াগ ও রুকিমন স্বামী-স্ত্রী। গাঁয়ের চৌকিদার পয়াগ নিজের রোজগারের পয়সায় নেশা ভাঙ তো করতোই সঙ্গে সঙ্গে বউয়ের রোজগারেও হাত দিতো। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী বিরোধ। সে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো। রুক্মিন উদ্বেগে দু'দিন কাটালো। তৃতীয় দিন ভোরে পয়াগ নতুন বউ সিলিয়াকে নিয়ে ফিরে এলো। এবার স্বামীর ওপর আধিপত্য রাখার জন্য দুই রমণীর রেষারেষি শুরু হয়ে গেলো। রেষারেষির পরিণতিতে পয়াগের হাতে একদিন বেদম মার খেলো রুক্মিন। সে নীরবে সেই লাঞ্ছনা সহ্য করলো। তারপর অন্ধকার হতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো। পাকা ফসলের খেত পাহারা দিতে এসে পয়াগ দেখে তার পাহারাঘরের চালায় আগুন। আপ্রাণ চেষ্টায় সেই চালাকে মাঠের সীমানার বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করে সে। ব্যর্থ হয়। সে নিজেই চালার নিচে পুড়তে থাকে। "হঠাৎ দেখা গেল একজন স্ত্রীলোক সামনের গাছতলা থেকে দৌড়তে দৌড়তে পয়াগের পাশে এসে দাঁড়াল। সে আর কেউ নয়, রুক্মিন। পলকের মধ্যে পয়াগের সামনে এসে মাথা হেঁট করে কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দু'হাত দিয়ে কুঁড়েটাকে উচু করে ধরল। সেই মুহূর্তেই পয়াগ সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার সারা মুখটা ঝলসে গিয়েছে। রুক্মিন পয়াগকে সরিয়ে নেবার জন্য সেকেণ্ডের মধ্যে খেতের ধারে এসে পৌছল। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই

রুক্মিনের হাত পুড়ে গেল, মুখ পুড়ে গেল, কাপড়ে আগুন ধরে গেল। তখন কুঁড়ের বাইরে বেরিয়ে আসার কথা তার চিন্তাতেও এল না। কুঁড়েসমেত মাটিতে পড়ে গেল। তারপর কুঁড়েটা বেশ কিছুক্ষণ কাঁপতে থাকল। রুক্মিন হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তবু আগুন এসে তাকে গ্রাস করে ফেলল। আগুনের সমাধির মধ্যে রুক্মিন আশ্রয় নিল।" সাত দিন পরে ঐ আগুনে পোড়ার ধাক্কায় ও শোকের আগুনে পয়াগও মারা গেল।

'কফন' গল্পের চামার ঘিসু ও তার ছেলে মাধব দারিদ্র্যের পেষণে মানবিক আবেগ হারিয়ে ফেলেছে। মাধবের গর্ভবতী বউ মারা গেল। সামাজিক রীতি অনুযায়ী লাশকে নতুন কাপড়ে ঢেকে নিতে হবে। কাকুতি-মিনতি করে জমিদারবাবুর কাছ থেকে দু'টাকা আদায় করে। তার ফলে বেনে মহাজনেরা দু' আনা চার আনা দেয়। এইভাবে পাঁচ টাকা জোটে। সেই টাকা নিয়ে বাপ-বেটায় বাজারে কাপড় কিনতে যায়। ঘিসুর মাথায় কুড়ি বছর আগে খাওয়া ভোজের স্মৃতি। বাজারে সাহুজির দোকানে ঢুকে একটা বোতল নিয়ে বসে। আধ বোতল শেষ করে দু' সের পুরি আনায়। ওদের হাতে কয়েকটা মাত্র পয়সা বাঁচে। কাপড় হবে না। "দু'জনে এখন এমন মেজাজে বসে পুরি খাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের বাঘ বনে বসে তার শিকার সাবাড় করছে। না আছে জবাবদিহি করার ভয়, না আছে বদনামের ভাবনা। এসব ভাবনাচিন্তাকে ওরা অনেক আগেই জয় করে নিয়েছে।

"ঘিসু দার্শনিকের মত বলে—'এই যে আমাদের আত্মা খুশি হচ্ছে, এতে কি বউয়ের পুন্নি হবে না?"

"মাধব ভক্তিতে মাথা নুইয়ে সায় দেয়—'খুব হবে, আলবাৎ হবে। ভগবান, তুমি অন্তর্যামী। ওকে সগ্‌গে নিয়ে যাও। আমরা দু'জনে মন খুলে আশীর্ব্বাদ করছি। আজ যে খাওয়াটা খেলাম অমনটা সারাজীবনে কোনদিন কপালে জোটেনি'।"

গল্পের শেষ দিকে "মাধব বলে—'বাবা, বেচারি কিন্তু জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। মরল, তাও কত যন্তনা সয়ে'।"

তার আগে ঘিসু ওকে ভরসা দিয়েছে ওর বউ বৈকুণ্ঠে যাবে। কারণ সে "কাউকে কষ্ট দেয় নি, দুখ্‌খু দেয় নি। মরতে না মরতে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সাধটি পুরিয়ে দিয়ে গেছে। ও যদি বৈকুণ্ঠে না যাবে তো কি ঐ ধুমসো ধুমসো লোকগুলান যাবে যারা গরিবগুলানরে দু'হাতে লুটছে আর নিজেদের পাপ ধুয়ে ফেলতে গঙ্গায় গিয়ে চান করছে, আর মন্দিরে পুজো দিচ্ছে'।"

এ এক মহান গল্প। কী মানবিক আবেদনে, কী চরিত্রচিত্রণে, কী শৈল্পিক বুননে যে কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্পের সমকক্ষ।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে প্রেমচন্দ তাঁর কালের জীবন, মানুষ ও সমাজকে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। যেখানে তিনি নীতি ও আদর্শবোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন (তাঁর বেশির ভাগ গল্প) সেখানে শিল্পকর্ম ক্ষুণ্ণ হলেও মানবতা ও মানবিক আবেদন আহত হয় নি। অন্য দিকে যে সব গল্পে মানুষ মুখ্য হয়ে উঠেছে সেখানে তিনি শিল্পকর্মেও সর্বকালের সেরাদের থেকে পিছিয়ে পড়েন নি। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর মহত্ত্ব—তিনি অকৃত্রিম গল্পকার।

—০—

[এই আলোচনা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত "প্রেমচন্দ: নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ" গ্রন্থকে ভিত্তি করে করা হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলিও সেখান থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দ

তপন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের আকাশে সর্বব্যাপ্ত কিরণ ছড়িয়ে প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলেন ঠিক সেই সময়েই হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যে এক ভিন্নতর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছিলেন মুন্সী প্রেমচন্দ। অথচ একই সময়ে দুই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব জীবিত ও কর্মরত থাকা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে কোন সান্নিধ্য ঘটেনি এবং পত্রালাপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে দুজনের যোগাযোগের বিশেষ কোন দৃষ্টান্তও আমরা খুঁজে পাই না। এ ঘটনা অবশ্যই আশ্চর্যের। তবু এ সত্যকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই কারণ এমন কোন ইতিবাচক তথ্য এখনো পর্যন্ত আমরা খুঁজে পাই না যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দের যোগাযোগের কোনো সামান্যতম সূত্র ও অনুমানও গড়ে তোলা যায়।

একথা বলাই বাহুল্য যে ভারতীয় সাহিত্যের এই দুই দিকপাল লেখক পরস্পরকে ভালই জানতেন। এবং রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভ ঘটেনি—এত বড় হিন্দী লেখক সে সময়ে খুব কম ছিলেন। প্রেমচন্দের জীবনেও বারবার রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে—তবু অজ্ঞাত কারণে প্রেমচন্দ বারবার রবীন্দ্র সাক্ষাতের সুযোগগুলি গ্রহণ না করে বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ ছিল কি-না আমরা জানি না—তবে আদর্শগত বা মনোভঙ্গিগত বহু কারণকেই অনুমান করা বিশেষ কষ্টকর নয়।

তাই রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দ প্রসঙ্গের শুরুতেই আমরা একবার দুজনের সাহিত্য আদর্শের পটভূমিটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। এবং সেই আদর্শগত মিল অমিলের প্রেক্ষাপটেই দুজনের দূরত্ব ও নৈকট্যের কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করব।

একথা আমরা জানি যে রবীন্দ্র আনন্দবাদের প্রভাব ও বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন যাবতীয় লক্ষণগুলি থেকে সচেতন ভাবেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন। যদিও বাল্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে শরৎ ও রবীন্দ্র রচনা তাঁর সামনে প্রয়োজনীয় প্রেরণা জুগিয়েছিল। তবু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তথা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের রচনা ভঙ্গি ও বিষয়গত চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে যে প্রেমচন্দ দ্বিমত পোষণ করতেন তা তিনি অস্পষ্ট রাখেন নি। এ সম্পর্কে হিন্দী সাহিত্যের

অন্যতম বিখ্যাত লেখক জৈনেন্দ্রর কথায় আমরা নিম্ন লিখিত কিছু তথ্য জানতে পারি।

জৈনেন্দ্র লিখেছেন—"আমি বললাম বাংলা সাহিত্য হৃদয়কে অধিকভাবে স্পর্শ করে—আপনি তো এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত তাহলে,—এর কারণ কি?

প্রেমচন্দজী বললেন—একমত তো বটেই। কারণ হলো বাংলা সাহিত্যে মেয়েলি ভাবনা বড় বেশি। আমার লেখায় তা বেশি নেই।

একথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—নারীত্ব আছে বলেই ঐ সাহিত্য স্থানে স্থানে স্মরণশীল হয়ে যায়। স্মৃতির মধ্যে ভাবনা অধিক তরল হয়ে যায় আর সংকল্পে ভাবনা হয় কঠিন। এ দুটোই চাই।......আমি বললাম—আমি বাঙালী নই। ওরা ভাবুক। ভাবুকতা দিয়ে ওরা যেখানে পৌঁছায়—সেটা আমার পৌঁছোবার জায়গা নয়। আমার অত জোর কই? জ্ঞানের দ্বারা যেখানে পৌঁছোনো যায় না—ভাবনা সেখানেও পৌঁছে দেয়। কল্পনাতেই সেখানে পৌঁছোনো যায়।

কিন্তু জৈনেন্দ্র, আমি ভাবছি—কাঠিন্যও চাই...জৈনেন্দ্র, রবীন্দ্র, শরৎ দুজনেই মহান। কিন্তু হিন্দীর জন্য কি ওটাই রাস্তা? আমার ক্ষেত্রে ওটা রাস্তা নয়।"

শুধু জৈনেন্দ্রর সঙ্গে উপরোক্ত কথোপকথনে নয়, উর্দু ভাষার প্রসিদ্ধ লেখক 'ইমতিয়াজ আলী তাজ'কে ১৯২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে প্রেমচন্দ যে মতামত তুলে ধরেছেন তার মধ্যেও আমরা সাহিত্য বিষয়ে প্রেমচন্দের পৃথক ধারণার ছবি দেখতে পাই। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"আমি সাহিত্যকে ম্যাস্‌কিউলিন দেখতে চাই। ফেমিনিজমতা যে রূপেই আসুক আমার পছন্দ নয়। এ কারণেই টেগোরের কবিতা আমাকে নাড়া দেয় না। এ আমার ভেতরের ব্যাপার—কি করব?"

ইন্দ্রনাথ মদানকে এক প্রশ্নের জবাবে একইভাবে বলেছিলেন—বাংলা সাহিত্যের একটা নারীসুলভ গুণ আছে—যাকে আমি আমার স্বভাবের প্রতিকূল বলে মনে করি।

আসলে এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে থেকে প্রেমচন্দ তাঁর লেখার সম্পর্কে যে ধারণাটা দিতে চেয়েছেন তা বুঝতে হলে আমাদের প্রেমচন্দের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির দিকে নজর দিতে হবে। এবং তাঁর সাহিত্য বিষয়ক লেখাগুলিকে ভিত্তি করেই আমরা রবীন্দ্রনাথ ও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রেমচন্দের পার্থক্যটা ধরতে পারব।

আমরা জানি যে রবীন্দ্র সমকালে শুধু প্রেমচন্দই নয় খোদ বাংলা সাহিত্য সংসারের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বর্জনের দৃষ্টান্ত আমরা কোন কোন লেখকের

ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্র, মোহিতলালের সঙ্গে প্রেমচন্দের একটা গুণগত ফারাক রয়েছে। এবং এই গুণগত দিকটার তাৎপর্য সঠিক ভাবে না ধরতে পারলে আমরা প্রেমচন্দের বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ধারণার অপব্যাখ্যা করে প্রেমচন্দ-মানসকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরতে পারব না।

বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলালসহ রবীন্দ্র সমকালীন বিভিন্ন লেখকদের রচনার বিষয় ও আঙ্গিকে যে পার্থক্য বা রবীন্দ্র বিরোধিতা আমরা দেখতে পাই তা অনেকাংশেই ছিল ব্যক্তিগত ভাবে উল্টো সুর গাইবার প্রবণতা সঞ্জাত এবং খানিকটা ইউরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাব ও চমক সৃষ্টির তরল চাটুল্যে সরলীকৃত। যে কারণে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বা মোহিতলালের ইন্দ্রিয়াসক্তি রবীন্দ্র আনন্দবাদও আদর্শবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে উল্টোস্রোত বইয়ে দেবার মত কোন ঝড়ই সৃষ্টি করতে পারেনি এবং শেষ দিকে রবীন্দ্র স্রোতের তীব্রতায় পথ হারিয়েছে। নজরুলের সাময়িক ঝোড়ো বাতাসও রবীন্দ্র প্রতিভার সামনে নতজানু হয়েছে এবং রবীন্দ্র আনন্দবাদকে তা কোন মতেই ছাড়িয়ে বা মাড়িয়ে যেতে পারে নি।

কিন্তু প্রেমচন্দের এই পার্থক্য রচনার ভিত্তিটা ছিল আরো গভীরে। কেবল সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রচনার জন্য আরোপিত কোন আদর্শে তা চালিত ছিল না। তৎকালীন সমাজ গর্ভ থেকে উদ্ভূত অনুভবের অমোঘ প্রভাবই প্রেমচন্দকে রবীন্দ্রপথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল এবং তার ফলে খুব বিনীত ও কুণ্ঠিত চরণেও প্রেমচন্দ শেষ পর্যন্ত তার গতিপথকে সঠিক ও অব্যাহত রাখতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রেমচন্দের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভার স্বীকৃতিতে প্রেমচন্দ কখনো কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রেমচন্দের বিভিন্ন মন্তব্যে, চিঠিপত্রে এবং রচনায় রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধকে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই।

১৯৩২ সালের ২৩শে মার্চ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ অস্ককে লেখা চিঠিতে প্রেমচন্দ মন্তব্য করেছেন—'ডঃ টেগোরের সাহিত্যিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধগুলি খুবই উচ্চমানের।' নিজের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রেও বার বার রবীন্দ্র প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। বিশেষতঃ গল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রগল্পের প্রভাবকে তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া অমৃত রায় তার 'কলমকে সিপাহী' গ্রন্থে লিখেছেন—প্রেমচন্দ তাঁর 'রঙ্গভূমি' উপন্যাসের উপর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস অন্য একটি বিদেশী উপন্যাসের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে যে প্রেমচন্দের সম্যক পরিচয় ছিল তা আমরা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখতে পাই এবং প্রেমচন্দ সম্পাদিত 'হংস'

পত্রিকার নানা স্তম্ভের প্রতিবেদন ও মন্তব্য থেকে বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। 'হংস' পত্রিকায় জানুয়ারী ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রেমচন্দ 'ডঃ টেগোর বোম্বাই মে' শিরোনামে শান্তিনিকেতনের সাহায্যার্থে রবীন্দ্রনাথসহ আশ্রমিকদের বোম্বাই সফর উল্লেখ করে লিখেছেন—'ডঃ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি ও উঁচু জাতের শিল্পী। কিন্তু 'ভিক্ষাচাওয়া' শিল্পে তাঁকে দুজন পূজ্য ভিক্ষুকের কাছে কিছু শিখতে হবে।......মালব্যজী অতীতের গৌরব আর নিজের সুললিত বাণীর চমৎকারিত্বে ভিক্ষে করেন, মহাত্মাজী ভিক্ষেও করেন আবার চোখও রাঙান—তাঁর ভিক্ষে চাওয়ার শিল্পে এটাই বিশেষত্ব। ডঃ টেগোর টিকিট বিক্রি করে শান্তিনিকেতনের বাচ্চাদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন এবং নিজেও অভিনয় করেছেন—কিন্তু শুনলাম পয়সাকড়ি বিশেষ লাভ হয় নি।'

জুন ১৯৩৩-এর সংখ্যায় 'দক্ষিণ বা শান্তিনিকেতন' নামক অন্য এক নিবন্ধে লিখেছেন—'কবিন্দ্র রবীন্দ্রের পরিশ্রম তথা দানের জন্য উত্তর ভারতে শান্তিনিকেতন এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য।' মার্চ ১৯৩২-এ 'পরিতোষ' শীর্ষক এক নিবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন—"গীতাঞ্জলীকে তো সাহিত্য বল্‌বেন? টলষ্টয় তো সাহিত্য লিখেছেন? তুলসী আর সুরদাসও তো সাহিত্য রচনা করেছেন?"

এই সমস্ত মন্তব্যে এবং রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র কর্মধারা সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় আমরা দেখতে পাই প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কত গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সাহিত্য আদর্শের ক্ষেত্রে প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ তো করেনই নি উল্টে রবীন্দ্র চিন্তা নমনীয় ধারা ও শিল্পীত আচার আচরণকে তিনি নানাভাবে আক্রমণই করেছেন। যদিও এই আক্রমণটা বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে কখনো আসে নি। এসেছিল সামান্য কিছু বিনীত মন্তব্যে এবং প্রেমচন্দের রচনা ধারার মূলসুরে।

আসলে একেবারে মুলেই প্রেমচন্দ ছিলেন অন্য জাতের সাহিত্যিক। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রসহ অন্য যে কোন লেখকের থেকে একেবারে পৃথকভাবে প্রেমচন্দ সাহিত্য করার প্রয়োজনটাকে অনুভব করেছিলেন। তার এই ভাবনা ভারতীয় সাহিত্যের ভাববাদী পরম্পরার সঙ্গে একেবারেই মেলেনা—আর মেলেনা বলেই ভারতীয় চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যার সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বেশী নান্দনিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে—সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর কোন চিন্তাগত বণিবনা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ এবং উপনিষদ ও বৌদ্ধ ভাবনায় লালিত চিন্তার সঙ্গে প্রেমচন্দের পার্থক্য তো আছেই সেই সঙ্গে সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তার মন্তব্য তুলে ধরেছেন তার সঙ্গেও প্রেমচন্দ একেবারেই সহমত হতে পারেন নি।

বস্তুতঃ দুজনের এই ভাবনা চিন্তার পার্থক্যটা এসেছে আমাদের সমাজগর্ভ থেকেই। ভারতীয় সমাজের মধ্যে যেসব বিষয়গুলি দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে আলোড়িত হচ্ছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন একভাবে আর প্রেমচন্দ সেই আলোড়নকে দেখেছিলেন অন্যভাবে।

কার্ল মার্কসের 'ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী' গ্রন্থের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন—'ভারতীয় সমাজের ইতিহাস—অনন্তকালের শোষণের ইতিহাস'। এই শোষণটাকে সহনীয় করে তোলার জন্যে আমরা দেখতে পাই দর্শন ও সাহিত্য নানাভাবেই দীর্ঘকাল ধরে শোষণের পক্ষে তাদের কর্তব্য পালন করে এসেছে। প্রচলিত মতামতকে কিছু সংস্কার করে বার বার শোষণের মূল কাঠামোটাকে রক্ষা করা হয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই সমাজের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে জমে উঠছিল নিপীড়িত মানুষের পুঞ্জীভূত ক্রোধ। কিন্তু এই ক্রোধ কখনো পাদপ্রদীপের সামনে আসে নি কি শিল্পে কি সাহিত্যে কি অন্য কোন মাধ্যমে। এই 'ক্রোধে'র ব্যাপারটা সব সময়ই চাপা দেওয়া হয়েছে নানাভাবে। যেখানে সামাজিক অন্যায় অবিচারগুলির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে—সেখানেও এই ক্রোধটাকে তুলে ধরা হয় নি। শিল্পীকে প্রকাশের নামে, নান্দনিকতার নামে—বার বারই সমাজ গর্ভের এই অমোঘ ক্রোধকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই ক্রোধটা যথাযথভাবে দেখি না। বিশ্বযুদ্ধ-কালীন অভিজ্ঞতা এবং সমাজের প্রতি মরমী দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও এই ক্রোধটা শ্রেণীগত কারণেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না। কিন্তু প্রেমচন্দের মধ্যে ছিল। আর এখানেই প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথসহ অন্য সব ভারতীয় লেখকের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং যে যুগে গোর্কী, লুস্যুনের মত লেখক মুক্তিকামী জাতিগুলির জীবন সংগ্রাম থেকে জন্মলাভ করেছে—সে যুগে প্রেমচন্দ ছাড়া আর একজনও ভারতীয় লেখক আমরা দেখতে পাই না যাঁর লেখনীর মধ্যে সমাজগর্ভের যাবতীয় কুশ্রী সত্যগুলি যথাযথ মর্যাদায় ভাষা পেয়েছে।

প্রেমচন্দ তাঁর এই বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন। তাই তিনি নিজেকে নিছক আদর্শবাদী লেখক হিসেবে চিহ্নিত না করে বলেছেন—'আমি সেই রচনাকেই মহৎ বলে মনে করি যার মধ্যে যথার্থবাদ ও আদর্শবাদের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। একে আপনারা 'আদর্শবাদী যথার্থবাদ' বলতে পারেন। প্রেমচন্দ বলেছেন—'এতে সন্দেহ নেই যে সমাজের কুপ্রথার দিকে মানুষের নজর ফেরানোর জন্যে 'যথার্থবাদ' সবচেয়ে উপযুক্ত।' কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তিনি উদ্দেশ্যহীন উন্মোচনের বিরোধী ছিলেন এবং সামাজিক মুক্তির আদর্শকে সামনে রেখেই এই যথার্থবাদের উপযোগ করার পক্ষে ছিলেন।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'আনন্দ'কেই বড় ঠাঁই দিয়েছেন। যথার্থবাদ তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'সাহিত্য এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্তিমাত্র। আনন্দই তাঁর আদি-অন্ত-মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ, আনন্দই তাঁহার উদ্দেশ্য।' (সাহিত্যের উদ্দেশ্য / বৈশাখ ১২৯৪)।

সাহিত্যে বাস্তবতা তথা যথার্থবাদের ব্যাপারটাও রবীন্দ্রনাথ একটু অন্য চোখে দেখেছেন। সাহিত্যে তথাকথিত বাস্তবতা সম্পর্কে কবির বক্তব্য—'বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য—হাটের কাব্য হইবে।' (বাস্তব / শ্রাবণ ১৩২১) তাঁর মতে—'সাহিত্যে ভাললাগা মন্দলাগাই শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্য মিথ্যার বিচারই শেষ বিচার।' (সাহিত্যে বিচার / বৈশাখ ১৩৩১)।

সামাজিক আদর্শবোধ ও যথার্থবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারেই উদাসিক ছিলেন তা নয়। তিনি তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে সজাগ থেকেই সামাজিক যথার্থতাকে সীমাবদ্ধভাবে দেখতে চেয়েছেন। এবং নিজের অক্ষমতাকে স্বীকারও করে নিয়েছেন। ভাদ্র ১৩২১ সালে লেখা 'লোকহিত' প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছেন তা তাঁর সমগ্র সাহিত্য সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও একইভাবে খাটে। তিনি লিখেছেন—"আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে ঐসব সাধারণ লোকেদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিষের আমদানী করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙ্গা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই।"

কিন্তু তা বলে ভারতীয় সমাজের তাবৎ বিবর্ণতাকে তিনি দেখেননি বা সমাজগর্ভের পুঞ্জীভূত ক্রোধের উৎসগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এমন নয়। উপরোক্ত প্রবন্ধেই আমরা দেখতে পাই তিনি লিখেছেন—আমাদের লোক সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই এইজন্যই জমিদর তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে আর তাহারা কেবল অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে—যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়জোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি 'তোমার কর্তব্য করো', মহাজনকে বলি—'তোমার সুদ কমাও', পুলিশকে বলি—'তুমি অন্যায় করিও না'—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বল ভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব।"

আসলে সমাজের মধ্যেকার যে ছবি প্রেমচন্দ তুলে ধরার জন্যে আজীবন একনিষ্ঠ থেকেছেন—এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজগর্ভের মধ্যেকার অস্ফুট ক্রোধকে যথার্থভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ সেই একই দেশ ও কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন সত্যের সন্ধান করেছেন একটু অন্যভাবে। দার্শনিক সত্য উপলব্ধির সূক্ষ্ম সুরের শিল্পীও ঝঙ্কারে মগ্ন হয়ে তিনি লৌকিক জীবনের আকাট ও মলিন সত্যকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন নি। যার জন্যে তার সমাজ সচেতন লেখার মধ্যেও আমরা ভারতবর্ষের সেই চেহারাটা খুঁজে পাই না যেটা প্রেমচন্দের লেখার মধ্যে পাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ বড় শিল্পী তার দেখার পরিধিও প্রেমচন্দের চেয়ে বেশি। দেশ বিদেশের বহু মনীষীর সাহচর্য, বহু অভিজ্ঞতা তাঁকে তৎকালীন পৃথিবীর বিশাল ক্যানভাসের মুখোমুখি রেখেছিল—পক্ষান্তরে প্রেমচন্দ দেখেছেন সামান্য। আর বিদেশকে জেনেছেন সাহিত্যের মাধ্যমে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কেবল সততা দিয়ে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে প্রেমচন্দ যেখানে পৌঁছেছিলেন তা বিস্ময়কর। সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা একজন লেখকের দৃষ্টিকে কতখানি পরিষ্কার করতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রেমচন্দ। এবং আজীবন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ও সামাজিক বোধের যে অদল-বদল ঘটেছে তাঁর জীবনে তার কারণও ছিল এই সত্যনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মুক্তির সন্ধানে যে প্রেমচন্দ একদা কংগ্রেসের নরমপন্থীদের ছেড়ে চরমপন্থীদের কাছাকাছি হয়েছিলেন—সেই মুক্তি বাসনাতেই তিনি পরবর্তীকালে গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই একই কারণে গান্ধীর পথ ত্যাগ করে বলশেভিক মতবাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তার এই ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে এতটুকু কপটতা নেই, ভড়ং নেই। উল্টে তা এতই অকপট নিষ্ঠাবান যে ভাবলে অবাক হতে হয়। একজন মানুষ তার আপনার ভাবনার সততা দিয়ে এতটা উত্তরণমুখী চেতনায় পৌঁছতে পারেন তা প্রেমচন্দকে দেখেই আমরা শিখতে পারি।

আর এই উত্তরণটা ঘটেছিল প্রেমচন্দের অকৃত্রিম শ্রেণীবোধ থেকে। এবং শ্রেণীবোধের ক্ষেত্রে গুরুতর পার্থক্যের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তার মহান প্রতিভা সত্ত্বেও প্রেমচন্দের জায়গায় কখনো নেমে আসতে পারেন নি।

এই ফারাকটা মনে হয় দুজনেই জানতেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাই কেউ কারো ঘনিষ্ঠ হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচন্দের একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে বানারসী দাস চতুর্বেদী, হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী প্রমুখেরা বারবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ প্রকাশ করলেও প্রেমচন্দ একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না। মহান রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়েই তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রেমচন্দের কাছে যাবার কথা কখনো ভাবেন নি। অথবা তিনি জানতেন যে প্রেমচন্দের সঙ্গে তার নৈকট্য কখনো গড়ে উঠতে পারে না।

দুজনকে শারীরিকভাবে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া না গেলেও জীবনে একবার

অন্ততঃ দুজনে মিলিত হয়েছিলেন। সে মিলন ঘটেছিল একটি বিবৃতির স্বাক্ষর দাতা হিসেবে। তখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে রোমা রোঁলা, আঁরি বারবুসের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীরা নেমে পড়েছেন শান্তি আন্দোলনে। ব্রাসেল্‌স এ সে সময় বিশ্বশান্তি সম্মেলন চলছে। ঐ সম্মেলনে পাঠানো ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এক যুক্ত বিবৃতিতে জহরলাল নেহেরু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নন্দলাল বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং প্রেমচন্দ।

প্রেমচন্দ তখন মৃত্যু শয্যায়। তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হিন্দী সাহিত্যিকদের বলেছিলেন—‘একটা রত্ন পেয়েছিলে তোমরা—তাকে হারালে।’

ছোটগল্পের প্রেমেন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র উভচর লেখক। কবিতা ও কথাসাহিত্যের দুই সৃজন ক্ষেত্রের বেড়া রবীন্দ্রনাথই ভেঙে দিয়েছিলেন। তবু সংস্কার দুর্মর, তাই আমরা কবিতা, গল্প ও উপন্যাসকে ভিন্ন সীমায়তনেই বাঁধতে চাই। নজরুলকে গল্প ছেড়ে দিতে হলো, শৈলজানন্দকে কবিতা। কেবল তারাশংকর উপন্যাসের অংশ রূপে কবিতা-গান লিখেছেন, কবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কথাশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তবু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুজন লেখক অন্তত দু'ধরনের জমিতেই সমান ফসল ফলিয়েছেন। একজন বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় জন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাদৃশ্য ঐ পর্যন্ত। রচনারীতি, চরিত্র পর্যবেক্ষণ এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোন মিল নেই।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য এক ঘরোয়া সভায় বলেছিলেন, প্রেমেন্দ্র আসলে ত্রিশের দশকের বাসিন্দা ও চিরন্তনের চারপাশেই ঘুরছে। কথাটা সত্য, নিন্দের নয়, প্রশংসারও নয়।

আমি শুধু গল্পের প্রেমেন্দ্রকে দেখতে চাইছি। তাও স্বল্প অবকাশে কয়েকটি গল্পের ঠিকরে-পড়া আলোয়।

'পুন্নাম' দিয়েই শুরু করি। প্রেমেন্দ্র তাঁর আধুনিক ছোটগল্প সংকলনে 'পুন্নাম' ও 'প্রতিমা' নিয়েছিলেন। সত্যি 'পুন্নাম' একটি পরিপূর্ণ নিটোল গল্প। কোন অল্পবিত্ত বাঙালী পরিবারে এলো একটি অসুস্থ শিশু। দিনরাত কাঁদে। চেঞ্জে যাওয়া বাবা-মার পক্ষে বিলাসিতা। তবু গেলেন। ঐ শিশু পুত্র যে একালের এবং পরকালেরও ভরসা। 'পুন্নাম' নরক থেকে তো সেই বাঁচবে, বাঁচাবে।

ধরা যাক একটি দম্পতি—ললিত ও ছবি। তাদের রুগ্ন খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গেল বাংলাদেশের প্রান্তে। শালবন অধ্যুষিত রাঙা মাটি এলাকায়। সেখানে ছেলেটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। কিন্তু এই ছেলেই কি বাবা-মা চেয়েছেন? শরীর ভালো হতে না হতেই তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়লো। হিংসুটে, নিষ্ঠুর, লোভী, অসভ্য। ললিত ও ছবি দুজনেরই আশাভঙ্গ হয়েছে। খোকনের খেলার সঙ্গী টুনু দিনের পর দিন সান্নিধ্য দিয়ে, তার নিগ্রহ মেনে নিয়ে খোকনকেই সুস্থ করলো। নিজে পড়লো অসুখে, মারা গেল। প্লট সামান্য। মধ্যে মধ্যে শিল্পীর হাতের জরির সুতোর কাজ। তাতেই গল্পটি গম্ভীর, বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। অথচ মনে হয়, ললিত ও ছবি বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

'অনেক কাপুরুষের কাহিনী' যতবার পড়েছি, কেন জানিনা, আমার 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশের কথা মনে হয়েছে। না, প্রভাব নয়। রবীন্দ্রনাথের নায়ক রবীন্দ্রনাথেরই। তবু নিখিলেশেরই সাধারণ সংস্করণ করুণার প্রাক্তন প্রেমিক পুরুষটি যে ভালবাসতে ভালবাসে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। নিজের জিনিষ কেড়ে নিলে দুঃখ পায়, ভাবে ও আমার কপালে ছিলনা; আবার অন্য কাজে মন দেয়। অসাধারণভাবে সাধারণ; তাই কি লেখক ওর নাম দেন নি। করুণার সঙ্গে ওর বিবাহের পথে বাড়ির লোকের বাঁধা। করুণাকে পাটনায় আত্মীয়ের বাড়ি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা হোল। জানতে পেরে সে ছুটে এসেছে প্রণয়ীর মেসে; তারা অন্য কোথাও চলে যাবে। কিন্তু 'কাপুরুষ' তা পারে নি। অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় কোন ঝুঁকি নেবাব মতো মনের জোর তার নেই।

সুতরাং যা হবার হোল। জঙ্গলের অফিসার বিমলবাবুর সঙ্গে করুণার বিয়ে। সংবাদ পেয়েছে কাপুরুষ। তারপর ঘটনাচক্রে বিমলবাবুর সংসারে অতিথি হয়ে সে করুণাকে দেখেছে। বাইরে ও অনেক বদলেছে, অন্তরের অন্তরে সেই করুণা। তবে তার ভেতরের কাপুরুষকে ধরে ফেলেছে। গল্পের শেষে কাপুরুষ যখন ভাবছে, বুঝি করুণা তার সঙ্গে পালাতে চায়, তখন পিসীমার জন্য প্রতীক্ষামানা করুণা নিশ্চয় অলক্ষ্যে প্রচুর হেসেছে। এই নিখিলেশেরই ভীতু বাঙালী সংস্করণ (পেপার ব্যাক?) তেলেনাপোতার নিরঞ্জন, ভস্মশেষের অমরেশ ডাক্তার।

অমরেশ ডাক্তার হয়ে ওঠবার আগে সুরমাকে ভালবেসেছিলো। শান্ত নিরীহ সিনসিয়ার অমরেশ। সুরমার সাহস ছিলো না। অমরেশের মন ভালবাসার পবিত্র আগুনে জ্বলে উঠতে চেয়েছিলো। কিন্তু সুরমা নির্ঝঞ্ঝাট সুখী জীবনের প্রত্যাশী। তাই সুরমা ধনী বড়ো মানুষ জগদীশের ঘরনী হলো। অমরেশ তখনো প্রতিষ্ঠার সিঁড়ির নিচের ধাপে, ওপরে উঠতে পারবে কিনা তাও অনিশ্চিত। ডাক্তার ধাপগুলো সতর্কে পা ফেলে মাড়িয়ে উঠেই খুঁজলো সুরমাকে। জগদীশ-গৃহিনী তখন পানজর্দাশোভিত অন্য নারী। কিন্তু অমরেশের হৃদয়ের পাত্রে তখনো ভস্মশেষ ধিকধিক জ্বলছে। তবু সেই শান্ত প্রতীক্ষা। জগদীশ, সুরমা ও অমরেশ তিনজন মেলেনি; কিন্তু মানিয়ে নিয়েছে। অমরেশ মানাতে চেষ্টা করেছে। সেইটুকুই এর গল্পরস। সূচনাতেই তিনটি চরিত্রের ভিন্নতা ধরা যায়। অন্ধকার বারান্দার দিকে তিনটে চেয়ার। চোখ বুঁজে বসেন জগদীশ। তাঁর পক্ষে এটাই দরকার। চোখ বুঁজে মেনে নেওয়া। নইলে অশান্তি, অস্বস্তি বাড়বে। সুরমা অনাবশ্যক বেশি কথা বলে। পান চিবোয়। কারো ভালো লাগলো কিনা দৃষ্টি নেই। এ ধরনের মানুষ সুখী না হয়েই পারে না। আর অমরেশ ডাক্তার শুধু সঙ্গ পায়। তার বেদনাকে সুরমা

দেখতে পায় না ; তবে জগদীশের পাশে তাকেও পাওয়া চাই। শুধু অমরেশ নয়, জগদীশও কাপুরুষ। আর সুরমা কি স্যাডিস্ট ? না, অন্তত প্রেমেন্দ্র মিত্র তা বলতে চাননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হলে গল্পের উপস্থাপনা অন্যবিধ হত। 'ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল' মধ্যবিত্ত মানসের 'নোংরা রোমান্টিকতা'-র জাল ছিন্ন করাই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং তিনজনের তুজন অন্তত জীবনের অনস্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াত। ভস্মচাপা আঙারের আগুন ফুঁ দিলেই দপ করে জ্বলে উঠতো। আর সেখানেই মানিক-চারিত্রে গল্পটি চিহ্নিত এবং গল্পটি সুনিশ্চিত হতে পারত।

সে কথা থাক। এখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্টোভ' গল্পের প্রসঙ্গ। এককথায় গল্পটি অসামান্য। একটি সাইলেন্সারহীন স্টোভের শব্দে তিনি অনেক হৃদয়ের আলোড়ন আড়াল করেছেন। এই গল্পের নায়ক শশিভূষণও 'অনেক কাপুরুষ'। ভালবাসাবাসির খেলায় মায়ের মতামত যাদের কাছে চূড়ান্ত, সেই গড়পড়তা বাঙালী তরুণদের অন্যতম! মল্লিকা ও শশিভূষণ ছিল কলেজ সহপাঠী। উভয়ের অন্তরঙ্গ ভালবাসা যখন বিবাহের পরিধিতে সুস্থিত হতে চাইল, তখনই বিচ্ছেদ। বাড়ির লোকে কি বলে, মা কি ভাবেন শশীর এই দ্বিধার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মল্লিকা তার অন্তরের অন্দরমহল পর্যন্ত দেখতে পেল। তার কি বাড়ি নেই, মা নেই, পারিবারিক মান-মর্যাদা নেই ? হঠাৎ হেন রোমান্সের কুয়াশার বাইরে মল্লিকার চোখে শশিভূষণের মনের চেহারাটা ছোট এবং বৈশিষ্টহীন হয়ে পড়েছিল। তাই সে সরে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পের ভালো মানুষ নায়কের মতো শশিভূষণও দারপরিগ্রহে রাজী হয়ে গেল। বাসন্তী শশিভূষণের স্ত্রী হয়ে সংসারে এসেছে।

কিন্তু আগুন নেভেনি। শশিভূষণ ও মল্লিকার ভালবাসা নিছক 'ভস্মাবশেষ' নয়। পুরনো স্টোভের মতোই দূরে সরিয়ে রাখা জিনিস ; অব্যবহৃত কিন্তু অব্যবহার্য নয়। সাইলেন্সারহীন স্টোভটি নিজের চেহারা হারিয়ে অসামান্য প্রতীকে রূপান্তরিত : দুটি নরনারীর দ্বিধাজড়িত অথচ আরক্তিম গাঢ় ভালবাসা কয়েক বছরের উজান ঠেলে পৌছচ্ছে অতীতে, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিবেশে কী হয়েছে এবং কী হতে পারত—একই সঙ্গে ঢেউ তুলেছে। হৃদ্‌পিণ্ডে দ্রুত আলোড়ন। স্টোভের শব্দ কি তার চেয়ে প্রবল ? কখনো নয়।

বাসন্তী স্বামীর মুখে কোনদিন শোনেনি মল্লিকার কথা। কিন্তু এমন মুখ-রোচক সংবাদ বাসন্তীর হিতৈষীরা না শুনিয়ে, না জানিয়ে থাকতে পারেন ? অতএব সে শুনেছে। কিছু ঈর্ষা, কিছু কৌতূহল জাগাও স্বাভাবিক। কিন্তু শশিভূষণ সে বিষয়ে নির্বাক, নিস্পৃহ, নির্বিকার। হৃদয়ের যে স্টোভ সে নিভিয়ে ফেলেছে, হয়ত আর জ্বালাতে চায় না। বাসন্তীরও বলার কিছু নেই। মফঃস্বল কলেজের অধ্যাপক স্বামী, সদাচারী, সচ্চরিত্র ; সংসারে বিশেষ কোন অভাব

রাখে নি। বাসন্তীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করে না।

মল্লিকারও কৌতূহল হয়, দেখে আসি শশিভূষণের সংসার। মনের পুরনো স্টোভে আগুন জ্বেলে কি লাভ? 'কে হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?' তবু নিজেরই অতীতের একটুকরোর সঙ্গে সম্ভাব্য বর্তমানের একটুকরো মিলিয়ে দেখার আগ্রহ হলো মল্লিকার। হাল্কাসুরে অনেকবার বলেছে বাসন্তী, গোকুলপুরের হেড্‌মিস্ট্রেস মল্লিকা রায়কে একবার আসতে বলোনা? শশিভূষণের বিমূঢ় প্রশ্ন, কেন? বাসন্তীর জবাব, দেখব। অর্থাৎ এত শুনেছি, এখন চোখে দেখতে চাই। তার মধ্য দিয়েই শশিভূষণের অনেকখানি দেখা যাবে। কিন্তু শশিভূষণের বিনা আমন্ত্রণেই একদিন এসেছে মল্লিকা। আর সেদিনের স্টোভের হিংস্র অনলশিখার দীপ্তিতে তিনজন মানুষ জীবনের মানে খুঁজছে। তিনজন তিন কোটিতে দাঁড়িয়ে। মল্লিকা ভাবছে, ভিজে সলতের সারাজীবন আগুন ধরাবার ব্রত একদিন দুর্বহ হয়ে উঠতোই। বাসন্তী আগে ভেবেছিল, মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রির ধ্যান তো আমায় বিয়ে করলে কেন? পরে ভেবেছে, যদি শশিভূষণের মনে কোন রঙ লেগে থাকে, তা অনেক আগেই ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে গর্জমান স্টোভের আগুনের দুপাশে দুজনকে গুঞ্জনরত দেখে পাশের ঘর থেকে বাসন্তীর মনে হচ্ছে, স্টোভটা যদি ফেটে যায়। তাহলে মল্লিকা ভাবতে পারে, বুঝি তার আগমনেই নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! 'কিছুতেই আজ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না'—এই হলো বাসন্তীর চূড়ান্ত মনোভাব। এই হলো প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনোভাব, সামঞ্জস্যের পক্ষে।

'হয়তো' এবং 'কুয়াশায়' আঙ্গিকের দিক থেকে চরিতার্থ। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের মতোই এ দুটি গল্পে প্রেমেন্দ্রের আশ্চর্য বর্ণনাশক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কবির দৃষ্টি, সহানুভূতির কিরণ সম্পাত আছে, কিন্তু কোথাও কবি-কল্পনার বিহ্বলতা নেই। ভাষার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু হারিয়ে যায়নি। আশ্চর্য সংযমের শ্রী দুটি গল্পেরই সম্ভাব্য মরবিডিটি অতিক্রম করে অন্ধকারে তারার মতো জ্বলছে। 'হয়তো' গল্পে এক ফিউডাল পরিবারের নায়ক বিকারগ্রস্ত যুবক, সামন্ত ঐশ্বর্যের তলানিতে এসে ঠেকেছে পরিবার, তবু পূর্বপুরুষের পাপ যেন তার শিরা-ধমনীতে সক্রিয়। সে সন্দেহবাতিকে জর্জরিত, তবু তার থেকে মুক্তির আকুতিও আন্তরিক। দুয়ের টানাপোড়েনে মহিম স্বস্তি পায় নি। মাধুরী কেন এল এ গল্পে—বাইরে থেকে ঈর্ষার সুতো ধরে মহিম-লাবণ্য কাহিনীকে টেনে নিয়ে যেতে? গৃহদাহের কাহিনী-অংশে মৃণালের জায়গা জুড়ে থাকা যেমন অত্যাবশ্যক নয়, তেমনি শুধু লাবণ্যের শ্বাস-রোধকারী সংসারের গুমোটে এক ঝলক দক্ষিণে হাওয়ার মতো মাধুরীর আমদানি অপরিহার্য ছিল না। গল্পের সত্যকে নিজস্ব পরিবেশে ফুটে উঠতে দেয়নি।

কথাসাহিত্যে সোমনাথ লাহিড়ী

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

"জেলখানায় কিংবা 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' থাকার সময় মাঝে মাঝে দু-চারটে গল্প লিখেছি। প্রধানত সেই রকম কয়েকটা গল্প নিয়ে 'কলিযুগের গল্প'।

তবে প্রথম গল্পটি একেবারে ছেলেবেলার; হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে লিখেছিলাম।" সোমনাথ লাহিড়ীর এই আত্মভাষণ আমাদের ইতিহাস সচেতন করে তোলে এবং সাহিত্যিক সোমনাথকে পরিচয় করিয়ে দেয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর দুবার ঐ পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছিল। আত্মজীবনীর খসড়ায় সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, "আমি জেলে যাওয়ার প্রায় মুখে মুখেই (জুলাই ১৯৩৪) ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং আরও অনেক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক নতুন আক্রমণের লাঠি উচিয়েছিল।" এরপর আরও একবার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরেই। তখনই বোধহয় তিনি 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' ছিলেন এবং কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিলেন।

সোমনাথ লাহিড়ীর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল হাতে-লেখা পত্রিকা "অভিযান" সম্পাদনার ভিতর দিয়ে। তিনি লিখছেন, "শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, একখানা হাতে লেখা পত্রিকা বার করা হবে—নাম 'অভিযান'। তখন বি. এস-সি পরীক্ষা দিয়েছি, হাতে সময়ও যথেষ্ট। 'অভিযানে' কবিতা আর গল্পের প্রাবল্যই বেশি ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনীতি, সমাজনীতি এবং মাসিক রাজনৈতিক পর্যালোচনা থাকত অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ....'সাম্যবাদ' নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে হাতের লেখা 'অভিযান'-এ খসড়া তৈরি করতে লাগলাম।" এই 'অভিযান' পত্রিকাটি পরে ছাপা হয়ে বের হতো। তখন থেকে সেটা হয়ে গেল সাপ্তাহিক কাগজ। সোমনাথ লাহিড়ীর আত্মভাষণ শোনা যাক, "এবার সবাই মিলে বার করলাম ছাপার হরফে সাপ্তাহিক 'অভিযান' কাগজ। মোটা মোটা কেমিস্ট্রির বই, কারও পরীক্ষার সোনার মেডেল, কারও হাতের আংটি বিক্রি করে আর বড়দের কাছ থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে সংগ্রহ হল পুঁজি। ...হর্তুকি বাগান লেনে 'গোলাপ প্রেস' নামে একটি ছোট্ট প্রেসে মান্ধাতার আমলের হাণ্ড মেসিনে' অভিযান' ছাপা হত। সম্পাদক ছিলাম আমি।" 'অভিযান' পত্রিকায় তিনি কোনো ছোটগল্প লিখেছিলেন কিনা জানা যায় নি।

এটাই জানা যায় সোমনাথ লাহিড়ী মোট তেরোটি গল্প লিখেছেন। তিনি প্রথম গল্প লেখেন হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে ১৩২৭ সালে।

এই তেরোটি ছোটগল্প লিখেই সোমনাথ লাহিড়ী দাবি করতে পারেন, বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি একজন প্রথম সারির বলিষ্ঠ ছোটগল্পকার। প্রথম সংস্করণের ছোটগল্প বইটির ব্যাক্-কভারে লেখা হয়েছে, "বাংলা রাজনীতি সাহিত্যে শ্লেষ আর স্যাটায়ার রচনায় একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন সোমনাথ লাহিড়ী, একথা আজ বলা চলে। 'দেশাভিমানী' ছদ্মনামে তাঁর 'ঘটনা ও রটনা' প্রভৃতি লেখা বাংলা স্যাটায়ারকে মুক্তি দিয়েছে—ভাঁড়ামি আর ব্যক্তিভিত্তিক আক্রমণের দুর্বলতা থেকে। শ্লেষের কসা হয়ে উঠেছে সংগ্রামের খড়্গ। 'কলিযুগের গল্প'গুলির ভেতর দিয়ে সোমনাথবাবুর স্যাটায়ার কথাসাহিত্যে প্রবেশ করল। কিন্তু এ শুধু স্যাটায়ার নয়, মানুষের প্রতি সহানুভূতির কোমল স্পর্শ এগুলিকে নতুনত্ব দিয়েছে।"

তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ও স্যাটায়ার মনোভাব ছাড়াও সোমনাথ লাহিড়ীর ছোটগল্পে শ্রেণীচেতনা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, চরিত্রের নিখুঁত বিশ্লেষণ, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী মনোভাব, সামাজিক দোষ-পাপ-অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ছোটগল্পগুলো চারটি দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের উল্লেখ্য দলিল। আর সোমনাথ লাহিড়ী চার দশক ধরে খুঁজে বেড়িয়েছেন সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষণগুলো যা প্রগতিশীল ছোটগল্পের দুর্বার আশ্রয়। 'আত্মজীবনীর খসড়া'-য় তিনি লিখছেন, "যুগটা ছিল সন্দেহ আর অনুসন্ধিৎসার যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে, তখন ৮/১০ বছর গড়িয়ে গেছে। যুদ্ধের রায়ও নির্মম বাস্তবতার আঘাতে ইয়োরোপের মানুষের মনে বিশেষ করে তরুণ সমাজের মনে, এতদিনকার প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সম্বন্ধেই প্রশ্ন জেগেছে। ...নতুনের অন্বেষণের এই ঢেউ ইয়োরোপ থেকে আমাদের দেশেও তখন পৌঁছে গেছে। এবং স্বভাবতই আমাদের মতো তরুণ মনকে নাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশি।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তখনো আমার যোগাযোগ হয় নি। তাই প্রথমে প্রশ্ন জাগল সাহিত্য আর ধর্ম নিয়ে। সাহিত্যে যৌন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আর ধর্মে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।"

সোমনাথ লাহিড়ীর এই আত্মজীবন-চর্চা থেকে তাঁর সাহিত্যিক-ঝোঁকটা বুঝে নিতে পারি। তাঁর সাহিত্যের মূলকথা নতুনের অন্বেষণ, অনুসন্ধিৎসা, নির্মম বাস্তবতা, প্রচলিত বিশ্বাস যথা, যৌন রক্ষণশীলতা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা। তবে তাঁর গল্পে অনুসন্ধিৎসা ও নির্মম বাস্তবতা খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। যৌন রক্ষণশীলতা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। তিনি যৌনতাকে গল্প আমল দেন নি এবং নিঃসন্দেহে এটা ভাল কাজ। অন্ততঃপক্ষে তখনকার কল্লোলীয় গোষ্ঠী থেকে তাঁকে আলাদা করা যায়।

'ভগবানের চেয়ে বড়' ছোটগল্পটি সম্পর্কে তিনি জানান, "১৯২১ সালের

গোড়ায় হেয়ার ইস্কুলে ভর্তি হলাম। আর তখনই আরম্ভ হোল অসহযোগ আন্দোলন। ইস্কুল-কলেজ সর্বত্র ষ্ট্রাইকের পর ষ্ট্রাইক। ভয়ে ভয়ে আমাদের ইস্কুলে তো ছুটিই দিয়ে দিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য। আর তারপরে গোটা যুগটাই হল হরতালের যুগ—কলেজ-ইস্কুলকেও ছাপিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর দুর্বার অভিযান। ১৯২৩ সালে আমি জীবনে প্রথম গল্প লিখি। ছাপা হয় হেয়ার ইস্কুল ম্যাগাজিনে। গল্পের নাম 'হরতাল'।" পরে হেরফের হয়ে 'হরতাল' হয়েছে 'ভগবানের চেয়ে বড়'।

এই গল্পে আছে একটি অসুস্থ ছেলের কাহিনী। ছেলেটি মাতৃহীন। বাবা অরুণবাবু যে কোন উপায়ে একমাত্র ছেলেকে বাঁচাতে চান। তখন ডাক্তারবাবু বলেন, 'রোগের এখন crisis period আরম্ভ হয়েছে। কাল দুপুরের মধ্যে যা হোক হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। এই সময়টুকু যদি ওকে সমস্ত রকম shock থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তা হলে রোগী সেরে উঠবে।

নড়াচড়ার শক ও সহ্য করতে পারবে না, সুতরাং এখানেই রাখতে হবে। কিন্তু ভোর হতে না হতেই তো আরম্ভ হবে শহরের নানা আওয়াজ।....সেজন্যই আশা দিতে পারছি না।'

"সবই ভগবানের হাত"—ডাক্তার আরও বলেন, "perfect silence-এর মধ্যে যদি দুপুর পর্যন্ত রাখতে পারেন তাহলে ফাঁড়া কেটে যাবে।" হরতাল সেই perfect silence নিয়ে এলো। অরুণবাবু ভোর থেকে শুনলেন, বাইরে থেকে কোনো শব্দ ঘরে আসছে না। ট্রাম, মোটর, রিক্সা এসবের চলার শব্দ আজ আর নেই। গল্প শেষ হতেই পাঠক ধাক্কা খায়। পাঠক চমকে ওঠে, ভাবে যে এই অসুস্থ এবং মুমূর্ষু সমাজ ব্যবস্থায় হরতালই নিয়ে আসতে পারে সজীব এবং জীবন্ত সমাজ ব্যবস্থা।

চল্লিশ দশকের চরমতম অভিশাপ দুর্ভিক্ষ। সেই দুর্ভিক্ষ নিয়ে অনেকেই গল্প লিখেছেন, তার মধ্যে প্রচার পেয়েছে বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত।' কিন্তু 'অশনি সংকেত'কেও ছাপিয়ে গেছে সোমনাথ লাহিড়ীর দুর্ভিক্ষ-আশ্রিত দুটি ছোটগল্প যথা, ১৯৪৩ এবং উনিশ-শো চুয়াল্লিশ। '১৯৪৩' ছোটগল্পটি ১৩৫০ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে '১৯৪৩' নামে ছোটগল্পটি হিন্দী 'হংস' এবং উর্দু 'আদবে লতিফ' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। চটকলের এক দম্পতি মজুর ও মজুরনীর মানবিক মূল্যবোধগুলিকে দুর্ভিক্ষ কি নিদারুণভাবে ছিঁড়েফুঁড়ে দিয়ে গেল তারই বিশ্বস্ত ফেমিন্ ডকুমেন্টশন এই ছোটগল্পটি। চটকলটি মিলিটারী নিয়ে নিলে বিষ্টু স্ত্রী রাণী ও কোলের ছেলেটাকে নিয়ে নিজের গ্রামে চলে আসে। সামান্য জমি অল্প পয়সায় গ্রামের জোতদার বাড়ুজ্যেকে বিক্রী করে দিয়ে বাড়ুজ্যের উসকানিতে এবং খাবারের লোভে বৌ ও ছেলে ফেলে বিষ্টু শহরে

পাগায়। তারপর এই বাড়ুজ্যে সামান্য খাবারের লোভ দেখিয়ে বিষ্টুর বৌ রাণীর রুগ্ন শরীরটাকে ভোগ করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার রাণী অভাবের সমুদ্রে ভাসে ছেলেকে নিয়ে। প্রচণ্ড খিদের তাপ নিয়ে রাণী অনেকটা পথ হেটে ছেলেকে নিয়ে লঙ্গরখানায় পৌছয়। কিন্তু পৌছেই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত রাণী শোনে : 'আজ নাকি সরকার থেকে চাল আসেনি, তাই আজ লঙ্গর বন্ধ।' তারপর খালি পেটে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে এবং ছেলেকে কোলে নিয়ে এতটা পথ হেটে আসা রাণীর অবস্থা অনুভব করে লেখক লিখছেন, "ছেলেটা বুকের উপর শুয়ে শুয়েই হাগল।...তার মধ্যে ছোলা---আস্ত আস্ত। ঠিক যেমন খেয়েছিল তেমন। ...আস্ত ছোলা...খাবার জিনিস। কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে রাণী যেন ভূতে পাওয়ার মতো কতক্ষণ সেই দিকে চেয়ে চেয়ে বসে থাকে। তারপর উঠল।...ময়লা ধুয়ে ছোলাগুলোকে আস্তে আস্তে আলাদা করল। আবার জল এনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছোলাগুলোকে ধুলো। অতি যত্নে, যেন খুব দামী জিনিস। তারপর একটি একটি করে খুঁটে খুঁটে খেল।...পেটের জ্বালা তো কমল না।"

অবশেষে এক সেপাই রুগ্ন-শীর্ণ-ক্ষুধার্ত এই রাণীকে আশ্বাস দেয় 'এই মাগী, রুটি লিবি ?' বিনিময় রাণীর ঐ শুকনো শরীরটা। পশুর লোভ। নারীর প্রতি মানুষের কামনা কোথায় নামলে মানুষ পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে পৌছয় তা সোমনাথ লাহিড়ী দেখিয়ে দিয়ে পাঠককে করে তুলেছেন সমাজ সচেতন। লেখক লিখছেন, "গরম কোটটা খুলে ফেলে রাণীকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে সেপাই আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'দুর মাগী, তোর লডকাটার মুখ দেখলে সব খুশি দূর হয়ে যায়'। তখন রাণী মৃতপ্রায় ছেলেটার মুখের ওপর চাপা দিল সেপাই-এর ভারী কোটটা। কারণ মনের মধ্যে তোলপাড় করছে মাতৃস্নেহের চেয়ে তিনটি ভয়ংকর শব্দ—ভাত, রুটি, পয়সা। সোমনাথ লাহিড়ী যে কত বড় ছোটগল্পকার, সেটা তখনই বোঝা যায় যখন তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবনা চিন্তাকে ধীর স্থিরভাবে কলমের ডগায় নিয়ে এসে নিখুঁত বিশ্লেষণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। তিনি ঠিক মনে রেখেছেন একজন ক্ষুধায় শরীর দিচ্ছে, অপরজন পৈশাচিক কামনায় রুগ্ন ও শুকনো শরীরটা নিচ্ছে। তিনি রাণীর কথা লিখছেন, "সেপায়ের বুকের নীচে দম আটকে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে।...মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে।" সংযত বর্ণনা। এদিকে সেপাই চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে রাণীর ছেলে কোটের চাপে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মারা গেছে। আর মানুষের জীবনে চরমতম ভাবনা সে সময় রাণী ভাবছে, 'আরে, কোট পরে সেপাই যে চলে যাচ্ছে! রুটি তো দিল না! পয়সাও না! ছেলের দেহ মাটীতে ফেলে রেখে রাণী ছুটল। সেপাইয়ের পিছু পিছু!' '১৯২৩' নামক

ছোটগল্পটীর সমাপ্তি এখানেই। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ সমাজের একশ্রেণীর মানুষকে নিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে, আরেক শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে গেছে ভোগ ও সুখের দিকে, যেমন 'উনিশ-শো চুয়াল্লিশ' ছোটগল্পটি।

১৯৪৩-এর পরিপূরক ছোটগল্প 'উনিশ-শো চুয়াল্লিশ'। এই ছোটগল্পটি চেক্ ভাষায় প্রকাশিত বাংলা গল্প সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। যুদ্ধের কালোবাজারী কি ভাবে গ্রামে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে তারই বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক দলিল 'উনিশ-শো চুয়াল্লিশ' এবং '১৯৪৩' ছোটগল্প দুটি।

জেলখানায় নারীর উপর পুলিশী অত্যাচার নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। সেসব গল্পে দেখা গেছে রাজনীতি বড় হয়ে ওঠে নি, বড় হয়ে উঠেছে নারীর প্রতি অশ্লীল অত্যাচার এবং যৌনতা। কিন্তু সোমনাথ লাহিড়ীর 'কামরু আর জোহরা' গল্পে রাজনীতি বড় হয়ে উঠেছে। কামরু এবং জোহরা দুটি যুবতী নারী। কামরুন্নেসা আত্মহত্যা করতে চায়। কারণ চাকরী পাওয়ার দুর্বার লোভে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কামরু এক জাঁদরেল চেনা অফিসারের যৌন শিকার হয়েছিল। পেটে একটা বাচ্চা আনার বিনিময়ে কামরু অবশ্যই পুলিশে চাকরী পেয়েছিল। কিন্তু মনে রয়ে গেল আত্মহত্যার ইচ্ছা এবং আফিং কিনে রাখে আত্মহত্যা করবে বলে। সেই ইচ্ছা নিয়েই সে চাকরী করে এবং আত্মহত্যার সুযোগ খোঁজে। চাকরী করতে এসেই দেখে রাজনৈতিক কারণে জেলবন্দী জোহরাকে। পুলিশী অত্যাচার উনিশ বছরের যুবতী নারী জোহরা আর সহ্য করতে পারছে না এবং কামরুও আর সেই অত্যাচার চোখে দেখতে পারছে না। অত্যাচার সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেলে জোহরা কামরুর কাছে বিষ চায়। আত্মহত্যার জন্য কামরুর কাছে সযত্নে রাখা আফিং-এর মোড়ক জোহরাকে দিয়ে কামরু অফিস থেকে বাড়ি চলে যায়। একদিন পর সে যখন অফিসে আসে তখন সুফিয়া জমাদারনী সেই আফিং-এর মোড়ক ফিরিয়ে দেয়। মাথার কাঁটা দিয়ে মোড়কে জোহরা লিখে গেছে 'এমন করে মরলে শয়তানরা ভাববে আমরা ভীতু, এরপর সকলেই এমনি করবে। ওদের কাছে হার মানবো না, তাই ফেরত দিলাম।' এমনিভাবেই অবক্ষয়ের শিকার কামরুকে রাজনৈতিক চেতনায় দীক্ষিত করে জোহরা মারা যায়। সামাজিক দ্বন্দ্বটাকে এই গল্পে সোমনাথ লাহিড়ী দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। একদিকে সমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয় যা নাকি সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিণতি যেমন কামরুন্নেসা, অপরদিকে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী মানুষের প্রবাহমান লড়াই যেমন জোহরা।

সোমনাথ লাহিড়ীর উল্লেখযোগ্য অপর একটি ছোটগল্পের নাম 'আইনের তালিম।' কোন্ পর্যায়ে পৌঁছলে গ্রামের মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, সেটাই এই গল্পের নাড়া দেওয়া বিষয়বস্তু। 'জমিদারের ছেলেই জয়পালের

বৌকে খুন করেছে'—এই বক্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে সোমনাথ লাহিড়ীর গল্প। এটাকে প্রমাণ করা এবং না করা নিয়ে গল্প এগিয়েছে। কিন্তু গ্রামের সবাই এটা জানে। এর জন্য আলাদা করে সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ গ্রামের যুবক দারোগাবাবু গ্রামের মানুষজনের প্রতিনিধি বৃদ্ধ গিরিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে খুনের কথা জানলেই হয় না। খুনটা নিজের চোখে দেখে সাক্ষী-জোগাড় করতে হয়। তাহলে জমিদারের ছেলেকে ধরে কয়েদখানায় ভরা যায়। বোকা গিরি শিক্ষিত দারোগাবাবুর কথা মেনে নেয়। কিন্তু এই ঘটনার কয়েক-দিন পরই জয়পাল মারা যায় পুলিশের গুলিতে উপোসী পেটের দায়ে জমিদারের চাল বস্তাপিছু আট আনায় পাচার করতে গিয়ে। এবার গ্রাম্য-জনতা ক্ষেপে গিয়ে থানা আক্রমণ করতেই নবীন দারোগা খুনী পুলিশকে থাপ্পড় মেরে এ্যারেস্ট করে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেয়। জনতা শান্ত হয়ে ফিরে যায়। পরদিন গিরি থানায় গিয়ে দেখে কয়েদ-ঘর খালি। সেখানে পুলিশটি নেই। এ কথা জিজ্ঞেস করলে দারোগা গিরিকে বোঝায় যে জয়পালের বৌয়ের খুনটা ছিল বেআইনী খুন, প্রমাণ হলে সাজা পেত। আর জয়পালের খুনটা আইনের খুন, তাতে কোন দোষ নেই। বোকা গিরি তখন দারোগাবাবুকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, এক বস্তা চালের দাম কত?"

"এই ধরো পঞ্চাশ টাকা।"

"পঞ্চাশ টাকা চুরি করলে আইনে কি শাস্তি হয়?"

"মাস খানেকের কয়েদ হয়।"

"তাহলে এক বস্তা চালের জন্যে জয়পালকে গুলি করে মারা হল কেন?" এবার দারোগা ধৈর্য হারালেন। তিনি চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। তখন গিরি বললে, "হুজুর আর একটা কথা।" বলেই গিরি জানতে চাইলো যে জয়পালের খুনী পুলিশটার যদি দোষই না থাকে, যদি ওটা আইনী খুনই হয়, তাহলে দারোগাবাবু ওকে কয়েদখানায় ঢোকালে কেন? তখন দারোগাবাবু বোকা গ্রাম্য গিরিকে বোঝালেন যে গ্রামের লোকেরা তখন তাকে মেরে ফেলতো বলেই পুলিশটাকে হাজতে পুরতে হয়েছিল। এবার গিরি আইনের তালিম পেয়েছে দারোগাবাবুর কাছ থেকে। সে তখন বললে, 'তা হলে জমিদারের খুনী ছেলেটাকে হাজতে না দিয়ে ভালোই করেছেন বাবু।—এখন আমরাই ওর বিচার করবো।" বলেই গিরি গাঁয়ের দিকে ছুটলো। পাঠকের চেতনার গভীরে পৌঁছে যায় এই গল্পের প্রচণ্ড প্রতিবাদী শব্দ। গভীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক বোধ থেকে এ ধরণের ছোটগল্প উঠে আসে। সোমনাথ সেই বোধে দক্ষতার সাথে উত্তীর্ণ। তাঁর সারা জীবনব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিক শিক্ষাই এর প্রমাণ।

ভারতীয় জাতপাত ও কুসংস্কারের উপর প্রচণ্ড ধাক্কা মেরেছেন বিজ্ঞানের ছাত্র

শীর্ষকায় সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর অনবদ্য লেখা 'চর্ম' নামক ছোটগল্পে। আত্ম-জীবনীর খসড়ায় লেখক তাঁর নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "আমরা ভাইবোনেরা ভুতিদিকে খুব ভালবাসতাম।...ভুতিদির মা বুড়ি। চোখে তত ভালো দেখতে পায় না। বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে কাজ করত। বর্ষার রাতে বাবুদের বাড়িতে অতিথি কুটুম্ব এসেছে। বুড়ি গেল কুয়ো থেকে জল আনতে। লণ্ঠনটা পর্যন্ত সঙ্গে নিতে দেয়নি। কারণ জলের ছাঁটে চিমনি ফেটে যাবে। একে অন্ধকার, তাতে পিছল, তার ওপর কুয়োর পাটাও ভাঙা। বেচারা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। হৈ চৈ শুনে অনেক লোক এসেছিল। কিন্তু দুর্যোগের রাত্রে অন্ধকার কুয়োর মধ্যে নেমে বুড়িকে তোলার মতো ঝুঁকি নিতে কেউই এগিয়ে এল না।

এসেছিল সাধু গোপাল। সে জাতে চাঁড়াল।...গোপালের ভয়ডর নেই। সে তখনই কুয়োয় নামতে রাজি। কিন্তু বাঁড়ুজ্যে গিন্নি নামতে দিলেন না, কিছুতেই নামতে দিলেন না। কারণ গোপাল চণ্ডাল—সে কুয়োয় নামলে কুয়ো পতিত হয়ে যাবে।

ভুতিদির কান্না আমি দেখেছিলাম—সারারাত সারাদিন। সেই কান্নাই কি আমার অবচেতনকে চৈতন্যে উত্তরণ করিয়েছিল।" এই চরমতম অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা চৈতন্যে উত্তরিত ছোটগল্প 'চর্ম'। 'চর্ম গল্পে ভুতিদি হয়েছে কুসমি এবং বাঁড়ুজ্যে গিন্নি হয়েছে জওলাপ্রসাদ-এর স্ত্রী যে জওলাপ্রসাদ হচ্ছেন রাজ্য পরিষদের সদস্য। রাজ্য পরিষদের সদস্যদের নিয়ে রাজ্যপাল ও মুখ্যপাল এই দুভাগে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলা হবে কোরিয়ার যুদ্ধে আহত সেনাদের সাহায্যের জন্য। জওলাপ্রসাদ ফুটবল খেলতে রাজী নন্। ওতে সনাতন হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ হয়। তিনি বলেন, "ভগবতীর চর্মে যে ফুটবলের আচ্ছাদন, জন্তুর চর্বি গলাইয়া যে ফুটবলে প্রলেপ দেওয়া হয়—সেই ফুটবল স্পর্শ করিয়া তিনি ধর্মহানি করিতে পারিবেন না, কিছুতেই পারিবেন না।" ভুতিদির মা হয়েছে এই গল্পে জওলাপ্রসাদের বাড়ির প্রাচীন পরিচারিকা, তাকে সবাই কুস্‌মির মা বলে ডাকে। গোপাল চাঁড়াল হয়েছে বুধন চামার। কুস্‌মির বৃদ্ধা মা জওলাপ্রসাদের বাড়ির ইঁদারায় অন্ধকার রাতে বৃষ্টির দিনে পা পিছলে পড়ে যায়। যখন চামার ইঁদারায় নেমে বৃদ্ধাকে জল থেকে তুলে আনতে চায়। কিন্তু জওলাপ্রসাদের গিন্নি ঘোরতম আপত্তি জানায়। জওলাপ্রসাদ তখন চিন্তা করেন, "মৃত পশুচর্মে ফুটবলের আচ্ছাদন; জীবিত চামারের চর্ম তাহা অপেক্ষাও অস্পৃশ্য ইহা বুঝিতে দেরি হইল না। পল্লীতে সনাতন ধর্ম রক্ষা করিতেই হইবে, নহিলে জনসংঘ হইতে রক্ষা নাই।...জওলাপ্রসাদ অবিলম্বে গৃহিনীর মতে মত দিলেন। কুস্‌মির মা ইঁদারার মধ্যেই পড়িয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, জওলাবাবুরা সকলে নিদ্রামগ্ন হইলেন।

কেবল মাতৃহারা কুসুমি ঘুমাইতে পারিল না।" ছোটগল্পের শর্তানুসারে গল্পটি এখানেই শেষ হলে নিপুণতা লাভ করতো। কিন্তু স্যাটায়ারিস্ট গল্পকার সোমনাথ লাহিড়ী আরও একটু এগিয়ে গেছেন স্যাটায়ারের ধর্ম বজায় রাখবেন বলে। স্ববিরোধিতা স্যাটায়ারের প্রধান ধর্ম। যে জওলাপ্রসাদ হিন্দু ধর্মের নিয়ামকদের বিধিমতো বর্ণভেদে চামড়ার জাতপাত মেনে চলেন, সেই জওলাপ্রসাদ গভীর রাতে নিচু জাতের যুবতী কুসমির ভাঙা কুটিরে চলে যান। গল্পকার এবার গল্প শেষ করছেন, 'নীচজাতীয়া হইলেও কুসুমির গাত্রচর্ম উষ্ণ ও মসৃণ।...প্রথম যেদিন কুসুমিকে তাঁহার সহিত রাত্রি যাপনে বাধ্য করেন সেদিনই উহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।' চরিত্র, বিষয় বস্তুর কথা স্মরণ রেখে সংস্কৃত ভাষায় পরিবেশ গড়ে তুলবেন বলেই হয়তো সোমনাথ এই গল্পে সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। অথচ আশ্চর্য, পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে হবে না যে তিনি সাধুভাষায় একটি চিরস্মরণীয় গল্প পড়ে চলছেন।

'আঁকাবাঁকা' নামক ছোটগল্পে সোমনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতি নিয়ে এসেছেন। এই গল্পেই তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন ট্রামের কংগ্রেসী এবং লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নের কথা। লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতা অবনীকে নিয়ে গল্প। চাকরীতে অবনীকে ঢুকিয়েছে দাদা ভুবন। বাপ কন্ডাক্টর ছিলেন: তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমে ভুবন কাজ নেয়, তারপর অবনী। ভুবন রাজনীতির মধ্যে নেই। সখারাম ড্রাইভার তাকে মিছিলে যেতে বললে সে জানায়, "ওরে বাবা ও-সবের মধ্যে আমি নেই।" ছোটভাই অবনী রাজনীতি করুক সেটাও দাদার না-পছন্দ। আইন মাফিক ইউনিয়ন না করার অজুহাতে ট্রাম কোম্পানীর সাহেব অবনীকে ডিসমিস্ করে। ওরা নাকি কাল সব লোককে স্ট্রাইক করার জন্য খেপিয়েছিল। 'শালার কোম্পানি একটা চার্জশীট পর্যন্ত দেয়নি, একেবারে সোজাসুজি ডিসমিস্।' ভুবন যেমন ভাইকে রাজনীতি করার জন্য গালাগাল দেয় আবার খুবই ভালবাসে। সে তখন ডিসমিসের হাত থেকে ভাইকে বাঁচাবার জন্য কোম্পানীর দেওয়া বাবার প্রশংসা পত্রটি যত্ন করে রাখা বাক্স থেকে বের করে সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে স্থির করে। ভুবন এবং অবনীর বাবাকে অতীতে এক সময় হরতাল ভাঙার জন্য সাহেবের আদেশে ট্রাম চালিয়েছিল বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিল। সার্টিফিকেটে লেখা ছিল যে তাঁর সন্তানদের অনুরোধ ভবিষ্যতে এই রেকর্ডের মাপকাঠিতে সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সেভাবেই অবনী চাকরী পেয়েছিল এবং সেভাবেই ডিসমিসড অবনীকে চাকরীতে পুনর্বহালের অনুরোধ করার জন্য ভুবন সার্টিফিকেটটি নিয়ে ট্রাফিক ম্যানেজারকে ধরতে ঘর থেকে রাস্তায় নেমে এলো। এসেই দেখে ট্রাম চলছে না। চলন্ত ট্রাম থেকে একজন পরিচিত কন্ডাক্টর নেমে ভুবনকে জানাল, "সব গাড়ি শেড হয়ে

গেল। ভাবনা ছিল এই কার-টা নিয়েই, পাক্কা দালাল কিনা ড্রাইভারটা। কিন্তু যাবে কোথায় শালা, মিছিলের ওখানে এমন তাড়া খেয়েছে যে মাফটাফ চেয়ে চোখকান বুজে এখন ডিপোয় ফিরছে।...সাত সাতজন লীডারকে ডিসমিস্ করার ঠেলাটা বুঝুক এখন কোম্পানি।...বাহাদুর ভাই তোমার অবনী। আমাদের সেকশনের শিরদাঁড়াটা সোজা করে দিল। এ-ই বলে বাপের বেটা।"

বাপকা বেটা! ভাবতেই 'ভুবনের চোখটা ভিজে এল'। ওদের অনেকের বাপ দাদা হয়তো সেই পাঁচশো জনের মধ্যে ছিল যে পাঁচশো জনের বুকের উপর দিয়ে অবনীর ও ভুবনের বাপ কোম্পানীর দালালি করতে গিয়ে সাহেবের আদেশে ধর্মঘটীদের উপর দিয়ে ট্রাম চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের হরতাল সফল হয়নি। সেজন্য পেয়েছিল সার্টিফিকেট। আজ হরতাল সফল। ভুবন সার্টিফিকেটখানা বার করল পকেট থেকে। কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল সেটাকে। তারপর ভুবন এক হয়ে গেল মিছিলের সঙ্গে। 'কাগজের কুচিগুলো তখনো হাওয়ায় উড়ছে।' এটাই গল্পের শেষ বাক্য। আশি দশকের সংগ্রাম সচেতন গল্পকাররা হয়তো এরপর আরও একটি অসংযমী লাইন যুক্ত করে দিতেন 'কাগজের কুচিগুলো মিছিলের পায়ের চাপে পিষ্ট হতে থাকল।'

ছোটগল্পের ফর্ম-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ তীব্র শ্লেষাত্মক গল্পটি হচ্ছে 'টার্ন কোট সাহেবের পালট পুরাণ'। আশ্চর্য হই, যখন ভাবি, এন্টি-এস্টাবব্লিশড ফর্ম নিয়ে সোমনাথ লাহিড়ীও ছোটগল্প লিখেছেন। এখন আমাদের মনে হয় শ্লেষাত্মক ছোটগল্প কখনই এস্টাব্লিশড্ ফর্মে বলিষ্ঠতা পেতে পারে না। এই ছোটগল্পটি শুরু হয়েছে নাটকের ভঙ্গীতে। তারপর খানিকটা গিয়ে দেখা যাচ্ছে পত্রিকার কাটিং বসানো হয়েছে গল্পের শ্লেষাত্মক বিষয়বস্তুকে ধারাল করবার জন্যে। টার্নকোট সাহেবকে হিন্দুস্থান সরকার যখন 'মেষপাল কমিশনার' পদ দেবে বলেও দিল না তখন সাহেব 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন—এই নিয়ে গল্প এগিয়েছে। পঞ্চবিংশ বার্ষিকী শোষণ পরিকল্পনা, কোটি কোটি পাউণ্ড মূল্যের অভিনব শোষণ-যন্ত্র, লণ্ডনে শোষণ-পরিকল্পনা, স্কার্ট নয় রে বোকা ওর নাম লুংগী, ভাষা-সংস্কৃতি অ্যাকাডেমীর নূতন অধ্যক্ষ প্রসঙ্গে টার্নকোট এবং মিঃ চ্যাটি সুনীটা, সেদিনের ডেঁপো ছোকরা Chatty Sooneeta Charlatan (হাতুড়ে ডাক্তারের মতো) philologist—ইত্যাদি গল্পকার কর্তৃক ব্যবহৃত অর্থযুক্ত বাক্যাংশ ছোটগল্পটিকে তীব্র স্যাটায়ারিস্ট করে তুলেছে।

সোমনাথ লাহিড়ীর ছোটগল্পের ভাষা সহজ সরল, বলিষ্ঠ এবং পরিমিত শব্দচয়ন অপরিহার্য। কোন শব্দই এম্পুটেট্ করা যায় না। তাঁর তির্যক বাচন ভঙ্গীর জন্য ছোটগল্পগুলো হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে দু'একটি ছোটগল্পে, তিনি সাধুভাষা প্রয়োগ করেছেন আর বাকি ছোটগল্পগুলো চলিত ভাষায় লেখা। কোন কোন ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার গল্পকে করেছে

গতিশীল। সেসব গল্পের সাথে গ্রামের পরিবেশ একাত্ম হতে পেরেছে। শহরের ধনিকশ্রেণী যখন তার ছোটগল্পের বিষয় হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাও পাল্টে যায়। বাঙলা চলিতভাষার সাথে চালু ইংরাজী শব্দ মিশে গিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দাস মনোভাব ফুটে ওঠে। এভাবে ভাষার তীব্র শ্লেষ পাঠককে জাগিয়ে রাখে। ভাষার বলিষ্ঠতা এসেছে সঠিক উপমা, চিত্রকল্প, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঠিক প্রয়োগে, "বাড়ুজ্যে ঠাকুরের পুরুষ্টু ভুঁড়িটা এগিয়ে আসে। দেখে রাণীর মনে হয় ভাত। থালার ওপর গোল ক'রে, চুড়ো ক'রে সাজানো ভাত" বা "হাঁটু গেড়ে পায়ে মাথা ঠেকাতে গিয়ে পিঠ আধখানা ধনুকের মত বেঁকে পড়েছে" বা "ছেলেটা ধুকছে। মাগো; জ্যান্ত ছেলের গায়ে এত হাড় থাকে তা কে জানতো। শুয়ে থাকলে মনে হয় অনেক দিন আগে মরে গেছে। কবর খুঁড়ে কে যেন তুলে রেখে গেছে।" জোহরার উপর পুলিশী অত্যাচারের পর ছোটগল্পকার লিখছেন "যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখ আর নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখের ওপর ভোরের আলো এসে লাগল—একটা নতুন দিন জন্ম নিচ্ছে।" এরকম চিত্রকল্প এবং উপমা আরও ছড়িয়ে আছে অন্যান্য ছোটগল্পে। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র সোমনাথ লাহিড়ীর আবেগবর্জিত ও পরিমিতিবোধিত মানসিকতা ভাষাকে করেছে শাণিত এবং মজবুদ যা সদর্থক বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে তোলে। আবেগ, যৌনতা, রোমান্টিকতা ও মরবিডিটির আফিং খাওয়া এখনকার ছোটগল্প পাঠকদের জাগিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখেন সোমনাথ লাহিড়ী।

তবে আমরা কি করব

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮১ সালে প্রবল অনিচ্ছায় ইয়াসনায়া পোলিয়ানা ছেড়ে মস্কোয় বসতি করতে যাওয়ার অল্প আগে ল্যেভ তলস্তয় তাঁর 'দিনলিপিতে লেখেন : 'একটা অর্থ নৈতিক বিপ্লব কেবল যে আসতে পারে, তাই নয়, আসতেই হবে। এখনও যে এসে পড়েনি তাই আশ্চর্য।' ঐ একটা বছরের প্রায় শুরু থেকেই তলস্তয় গভীর অভিনিবেশে বাইবেল পড়েছেন, পড়তে পড়তে উপলব্ধি করেছেন খ্রীষ্টীয় পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে খৃষ্টধর্ম নেই, ব্যক্তিগত জীবন পালনের জন্য কয়েকটি মৌল নীতিও আবিষ্কার করেছেন বাইবেল থেকে। যে পাঁচটি নীতি তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা একদিক থেকে ক্ষমাধর্মের পরাকাষ্ঠা (ক্রোধ ক'র না; কামে আচ্ছন্ন হয়ো না; শপথ ক'র না, যে পাপ, তাকে বাধা দিও না; তোমার শত্রুদের ভালোবেসো), অন্যদিকে অ্যানারকিজ্‌ম্‌-এরও ভিত্তি; কারণ 'যে পাপ, তাকে বাধা দিও না' এই অনুশাসন সম্পূর্ণ মানলে আইন-কানুন, আদালত, পুলিশ, কারাগার মানুষের স্বাধীন আচরণ বাধা দেওয়ার যাবতায় ব্যবস্থা খারিজ হয়ে যায়; 'তোমার শত্রুদের ভালবেসো' এই অনুশাসন প্রকারান্তরে যুদ্ধকে অস্বীকার করে। এই নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রথম পদক্ষেপেই তলস্তয়কে নিরাশ হতে হয়। ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পাঁচজন বিপ্লবীকে ক্ষমা করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে তিনি নতুন জার তৃতীয় আলেকজান্দারকে যে চিঠি লেখেন তার জবাব দেন নতুন জার, লোকমুখে প্রেরিত বার্তায় 'কাউন্ট ল্যেভ তলস্তয়কে জানিয়ে দেওয়া হোক যে তাঁর প্রাণনাশের কোন চেষ্টা হলে তিনি তা ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু আমার পিতার হত্যাকারীদের ক্ষমা করার কোন অধিকার তাঁর নেই।' বিপ্লবীদের তলস্তয় সমর্থন করেননি, অথচ তাঁদের আদর্শবাদকে স্বীকার করেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে—'এই বিপ্লবীরা কারা? এরা বর্তমান ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে, এরা এই ব্যবস্থাকে অন্যায় বিবেচনা করে, এরা এমন এক ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে ভালো। এদের হত্যা করে বা ধ্বংস করে এদের সঙ্গে যুঝতে পারবেন না। এদের সংখ্যাটা বড় কথা নয়, এদের চিন্তারই দাম। এদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে লড়তে হবে আধ্যাত্মিক পন্থায়। এদের আদর্শ সকলের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ, সাম্য ও স্বাধীনতা। এদের বিরুদ্ধতা করতে গেলে এদের আদর্শের বিরুদ্ধে এমন এক আদর্শ দাঁড় করাতে হবে যা এদের আদর্শের চেয়ে উন্নততর এবং এদের আদর্শও তার অন্তর্গত। ফরাসীরা, ইংরেজরা, জার্মানরা এদের সঙ্গে লড়ছে, কিন্তু জিততে পারছে না।'

মস্কোয় পৌঁছে দারিদ্রের যে ছবি তলস্তয় প্রতিনিয়ত দেখতে থাকেন তাতে তিনি এক নতুন নৈতিক দায়িত্ব আবিষ্কার করেন। প্রথমে চেষ্টা করেন, মস্কোয় দরিদ্রতম অঞ্চলগুলিতে গিয়ে দুঃস্থদের সামান্য অর্থভিক্ষা দিতে, প্রার্থীদের ভিড় তাঁকে ঘিরে ধরে, প্রায় আক্রমণ করে। তলস্তয় তখন আরো বৈজ্ঞানিক এক পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসে লোকগণনার সময়ে দরিদ্রদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান যাতে লোকগণনা সমাপ্ত হলে ঐ তথ্যের ভিত্তিতে দরিদ্রদের অবস্থা প্রত্যেকের যথার্থ প্রয়োজনের পরিমাপ সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে তলস্তয় এক আবেগময় প্রবন্ধে দেশের ধনীদের কাছে অর্থের আবেদন জানান যাতে এক তহবিল তৈরী করে খোলা যায়। দরিদ্রদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহান্তে এই তহবিল থেকেই দরিদ্রের প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য দান সম্ভব হবে। তলস্তয় নিজে ব্যক্তিগত ভাবেই তাঁর ধনী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে তহবিলে অর্থদানের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন, দানের পরিমাণেরও প্রতিশ্রুতি লিখে নেন: 'যখন মানুষ সত্যিই কিছু চায়, তখন তার জন্য চট করে টাকা বের করে দেয়। থিয়েটারে সারা বার্নাহার্ডকে দেখবার জন্য বক্স্‌-এর টিকিটের দাম তারা তৎক্ষণাৎ বের করে ব্যাপারটা পাকা করে ফেলে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যাঁরা টাকা দিতে রাজী হলেন, আমার আবেদনে সাড়া দিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও তখনই টাকা বের করে দিলেন না, আমি যে পরিমাণ প্রস্তাব করলাম, তাতে নীরবে সায় দিলেন মাত্র। লোকগণনার কাজে তলস্তয় নিজে যোগ দিলেন, একদল তরুণ ছাত্রের সঙ্গে রঝ্‌দানভ হাউস নামে এক বিরাট বস্তিতে কাজ করেন। লোকগণনার অঙ্গ হিসেবেই এই বস্তির দরিদ্রদের জীবনযাপনের বিবরণ, মানসিকতা, অতীত অভিজ্ঞতা, আবার আচরণের যে বিবরণ তলস্তয় গ্রথিত করেছেন, যেভাবে তা বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে তাঁর তাঁর 'তবে আমরা কী করব?' বইটিকে নগরসমাজতত্ত্বের একটি আদি দলিল বলে বিবেচনা করা যায়।

এই বিশ্লেষণ থেকে তলস্তয় উপলব্ধি করেন যে অর্থভিক্ষা দ্বারা এই দারিদ্রের সমাধানের কোন ভরসা নেই। তিনি লক্ষ্য করেন, তাঁর দাক্ষিণ্যের দান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপব্যবহৃত হয়। সাহায্য প্রার্থীরা অনেকেই আসলে দীর্ঘদিনের বা জন্মসূত্রেই দরিদ্র নন। ঘটনাচক্রে আরামের বা স্বাচ্ছন্দের জীবন থেকে দুর্বিপাকে দুঃস্থদশায় পড়েছেন। আবার সহজ দানের সুযোগে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে আগ্রহী। অন্যেরা দাতার নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে কিছুটা অর্থ ছাড়িয়ে নিয়ে মদে বা মজায় দ্রুত উড়িয়ে দেন। ক্রমে ক্রমে তলস্তয় উপলব্ধি করেন এদের দুরদৃষ্টি বাইরের উপকরণের সাহায্যে শুধরে দেওয়া যাবে না। এদের জীবনবোধ না পালটে দিতে পারলে এরা কোন অবস্থাতেই সুখী হতে পারবে না।

তলস্তয় বস্তির জীবনযাত্রার মধ্যে গোষ্ঠী জীবনের জীবনধারার কয়েকটি লক্ষণও দেখতে পান, 'আমি যখনই এমন একটি ক্ষেত্র দেখেছি যেখানে সাহায্যের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র এবং আমিও সাহায্য করতে প্রস্তুত, তখনি দেখেছি যে সেই প্রয়োজন আমি গিয়ে পড়বার আগেই আমার অভিপ্রেত সাহায্য দানে পূরণ হয়ে গেছে। কে এই সাহায্য দান করেছে? আমি যাদের উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম সেই হতভাগ্য বঞ্চিত জীবগুলির মধ্যেই কেউ, আমি যেভাবে সাহায্য করতে পারতাম তার চেয়ে ভালো ভাবেই করেছে?' এই ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া নিয়ে ঐ বস্তি জীবনের মধ্যে যে সব জীবগুলো গড়ে উঠেছে, অতীত পটভূমি থেকে যে শ্রেণীবিভাজনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাতে বাইরে থেকে এক একজনের ব্যক্তিগত উপকার করতে যাওয়ার চেষ্টা এক জটিল ব্যবস্থায় ধাক্কা খেয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। 'আমি যেন সেই ডাক্তার যে ওষুধ নিয়ে এসেছে রোগীর কষ্ট লাঘব করার জন্য, তার ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করে তা পরিষ্কার করেছে। তারপর নিজের কাছেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে সবই বৃথা গেছে। তার ওষুধে কোন ফল হবে না। অন্যদিকে ধনী বন্ধুরা যে অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তারা একজনও রক্ষা করেন না।' তলস্তয় এ নিয়ে যতই ভাবতে থাকেন ততই অনেক সিদ্ধান্ত তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকে।

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে উন্নততর কোন নৈতিক অবস্থান থেকে ধনীদরিদ্রকে দয়া দেখিয়ে সাহায্য করে, নিজেদের জীবনে দারিদ্রকে স্থান দিয়ে বৈষম্য লাঘব করতে পারেন, এই সম্ভাবনাই তলস্তয় শেষ পর্যন্ত বর্জন করেন। প্রথমত ধনীর সেই নৈতিক অধিকার কি সত্যিই আছে? 'এক মা তার মেয়েকে পানশালায় পুরুষ ধরতে নিয়ে যায়, অন্য মা তার মেয়েকে রাজসভায় কিংবা বল নাচের আসরে নিয়ে যায়, কিন্তু দুজনেই তো একই জীবনবোধে বিশ্বাসী; দুজনেই মেনে নিয়েছে, নারী কেবল পুরুষের কামবাসনাকে তৃপ্ত করবে, আর সেই তৃপ্তিদানের পরিবর্তে উপার্জন করবে খাদ্য, বস্ত্র, নিরাপত্তা। আমাদের সম্ভ্রান্ত মহিলারা কেমন করে বাঁচাবেন সেই মহিলা ও তার কন্যাকে?' শহরের দারিদ্রের কারণ তলস্তয় খুঁজে পান শোষণে: 'রুশিয়ার সর্বত্র, আমার মনে হয় শুধু রুশিয়ায় নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়েই এই একই ধারা চলেছে। গ্রামের উৎপাদকদের সম্পদ চলে আসে ব্যবসায়ী, জমিদার, রাজকর্মচারী ও শিল্পপতিদের হাতে। যারা এই সম্পদ লাভ করে তারা এই সম্পদ ভোগ করতে চায়। এবং সম্পূর্ণভাবে তা উপভোগ করা যায় কেবল শহরেই।...এইভাবেই ধনীরা শহরে জড়ো হয়, সমরুচিসম্পন্ন অন্য ধনীদের কাছাকাছি বাস করতে থাকে; সেখানে অসংখ্য পুলিশ তাদের যাবতীয় শৌখিন চাহিদা পূরণের প্রয়াসে সতর্ক প্রহরা যোগায়।...ধনীরা শহরে জমায়েত হয় সেখানে কর্তৃপক্ষের প্রহরায় তারা পরম ঔদ্ধত্যে দাবি করে গ্রাম থেকে যা কিছু ছিনিয়ে আনা হয়েছে তার সব

কিছু। ধনীদের এই অনন্ত ছুটির উদ্‌যাপন যেখানে চলেছে সেখানে গ্রামবাসীরা আসতে অংশত বাধ্যই হয়। তার কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ যেখানে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেইখানে আসে সেই গ্রামবাসী, ধনীর খাবারের টেবিল থেকে ছিটকে পড়া খাবারের টুকরোর লোভে, এবং অংশত, সকলে ধনীর যে সহজ ও শৌখিন জীবনযাত্রা অনুমোদন করে ও সমর্থন করে তা লক্ষ্য করে তারই আদলে নিজের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলার লোভে যাতে যাতে সে কম কাজ করে অন্যদের শ্রমের ফল ভোগ করতে পারে।

শোষণের ইতিহাস অনুসরণ করে তলস্তয় শেষপর্যন্ত অর্থের বিপুল ক্ষমতার উন্মেষে পৌঁছে যান। শোষণের অস্ত্র হিসেবে অর্থের ব্যবহার লক্ষ্য করেন। 'শোষণের অর্থের দরকার বিনিময়ের উপায় হিসেবে নয়, মূল্যমান নির্দিষ্ট করার জন্যেও নয়—যে মূল্যমান সে নিজেই নির্ধারণ করে। তার অর্থের দরকার শোষণের সুবিধার জন্য, কারণ অর্থ জমিয়ে রাখা যায়, বৃহত্তম সংখ্যক মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখার সহজতম পন্থা অর্থের আয়ত্ত।…শোষকের অর্থের দরকার যাতে অপরের শ্রমকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ সে খাটাতে পারে কেবল বিশেষ কিছু লোকের উপর নয়, যাদেরই অর্থের প্রয়োজন আছে তাদেরই উপর।' উৎপন্ন ফসল মজুত করে ক্ষুধার অস্ত্রে মানুষকে হীনবল করে তাদের দাসে পরিণত করার দৃষ্টান্ত তলস্তয় খুঁজে পেয়েছিলেন বুক অফ জেনেসিস্-এ, জোসেফ-এর হাতে, ইজিপশিওদের দাসত্ববরণে। তলস্তয়ের ভাষ্যে জোসেফ ক্ষুধার্তদের বলেন, 'সমস্ত শস্য আমার অধিকারে, আমি তোমাদের উপোস করিয়ে মারতে পারি। আমি তোমাদের বাঁচাব একটা শর্তে। যে শস্য আমি তোমাদের দেব তার বিনিময়ে আমার সমস্ত আদেশ তোমরা পালন করবে।'

রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রশাসন, পুলিশ সবই ধনীদের সম্পত্তি ও শোষণ প্রক্রিয়াকে পালন করে, পাহারা দেয়, এই সত্যকে গোপন করার চক্রান্তে লিপ্ত বুর্জোয়া অর্থনীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্ব। তলস্তয়ের অভিযোগ 'যেখানে ভায়োলেনস্‌ আইনের দ্বারা সমর্থিত সেখানেই দাসত্ব বর্তমান।…যতদিন বেয়নেটের শক্তি ভায়োলেন্‌স্‌কে মদত যোগায়, ততদিন জনসাধারণের মধ্যে সম্পদের সমবন্টন ঘটবে না, সব সম্পদই শোষকদের হাতেই জমবে।' এই মুক্তদৃষ্টি সমাজ ধারণায় পৌঁছেও তলস্তয় শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক সমাজ রূপান্তরের কোন সম্ভাবনা মানতে চাননি। একেবারেই ব্যক্তিগত এক জীবন নীতি অনুসরণে তিনি তাঁর বিবেক যন্ত্রণাকে শান্ত করতে চেয়েছেন, 'জমি ও অর্থের মালিকানা আমায় যে সমস্ত অধিকার দান করেছে, এবং সামরিক ভায়োলেনস্‌ যে অধিকার রক্ষায় প্রহরারত, যতদিন না সেই অধিকার আমি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারছি ততদিন আমি কেবল আমার সেই অধিকারসমূহ যত কম পারি দাবি করব, এবং অন্যেরাও যাতে এই মিথ্যা অধিকারের অন্যায্যতা ও অমানুষিকতা উপলব্ধি করেন তার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট

হব।' ব্যক্তিগত জীবনে ধনীদের বিবেকবোধ জাগ্রত হবে, তাঁরা তাঁদের জীবনধারণের সমগ্র রীতিটাই ধীরে ধীরে পালটে ফেলবেন, শ্রমের মর্যাদা স্বীকার করে নিজের হাতে কাজ করতে শুরু করবেন, এই রকম একটা আশা তলস্তয় লালন করে চলেন। ১৮৯৫ সালের 'প্রভু ও ভৃত্য' নামে দীর্ঘ গল্পটি শুরু হয় ভাসিলি ব্রেখুনভের স্বার্থপরতা, ব্যবসায়িক লোভান্ধ অস্তিত্বের পাশে তার শোষিত ভৃত্য নিকিতার নির্বোধ, বিশ্বাসপ্রবণ, অসংশয়ী আত্মসমর্পণের বৈষম্যবিন্যাসে। গল্পের শুরুতে তলস্তয়ের চাপা ব্যঙ্গের ধার তীক্ষ্ণ। 'আমরা তবে কী করব?' প্রবন্ধে ধনীদের বিলাস ও দরিদ্রদের বঞ্চিত অভাবী জীবনের বৈপরীত্যের পিছনে ধনীদের আত্মসন্তুষ্ট ঔদাসীন্যের যে উল্লেখ করেছেন বারংবার, এই গল্পে তার উত্তরণ ঘটে এক অসাধারণ কাহিনী নির্ভর রূপকল্পে : এক তুষার ঝড়ের রাতে ব্রেখুনভ ও নিকিতার দ্বৈত অভিযানে ধনীর নির্মম আরাম সন্ধান ও দরিদ্রের কষ্টসহন, যা তারা মেনেই নেয় ভবিতব্যের মতো। ঝড়ে পথ হারিয়ে তুষারের স্তূপের উপর অসহায় রাত্রি যাপন, দুঃস্বপ্ন ও ভয়ংকর শীতের মারণ পীড়ন এই গল্পের তুঙ্গবিন্দু। রুশ স্বাভাবিকবাদী বর্ণনার ঐতিহ্য ধরে তলস্তয় যে পুঙ্খানুপুঙ্খ মুহূর্তানুমুহূর্ত বিবরণ দেন, তার বাস্তব রচনা পাঠককে যেমন অভিভূত করে ঠিক তেমনি, সেই বর্ণনাই যে শক্তির জন্ম দেয়, সেই শক্তিতেই যেন ব্রেখুনভের ভেতরের মানুষটা প্রায় প্রকৃতির মতোই নগ্ন আবেগে বেরিয়ে আসে। সে মৃতপ্রায় নিকিতার শরীরের উপর শুয়ে পড়ে তার নিজের শরীরের উত্তাপে নিকিতাকে বাঁচিয়ে রাখে। একদিকে যেমন দরিদ্রের কষ্টের জীবনে আরও সহনশক্তি ও ধনীর আরাম লালিত দুর্বলতার ইঙ্গিত আছে, তেমনিই আবার প্রকৃতির প্রচণ্ড আঘাতে মানুষের মৌল চেতনার পুনরুন্মেষের সম্ভাবনার বিশ্বাসও রয়ে গেছে এই গল্পে। সস্তায় এক জঙ্গল কিনে মুনাফা লুটবার লোভে যে যাত্রা শুরু হয়, তার সমাপ্তি ঘটে ধনীর মোহমুক্তিতে, দরিদ্রের প্রাণরক্ষায়, আত্মবিসর্জনে।

ধনীর এই মানবিক উত্তরণের সম্ভাবনায় তলস্তয় কতটা বিশ্বাস করতেন? বিশ্বাস করলেও কি ভরসা রাখতেন? মস্কোয় দারিদ্র ও শোষণের যে চেহারা তিনি দেখেছিলেন, তাতে আতঙ্কিত তলস্তয় শেষপর্যন্ত শিল্প-সাহিত্যকেই বাতিল করতে বসেছিলেন, নিজের ইউটোপিয় বিশ্বাসকেই যেন সরাসরি আক্রমণ করে লেখেন : 'আমরা যে তুরীয় শিখরে চিন্তাবিদ্ বা শিল্পীর স্থান কল্পনা করেছি, তিনি সেখানে যেন কখনো না বসেন। তিনি সর্বদাই থাকবেন চিন্তা ও বিক্ষোভের দশায়; তিনি হয়তো কোনদিন আবিষ্কার করবেন বা উচ্চারণ করবেন সেই সত্য যা জনসাধারণের জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ হবে, তাদের কষ্টভোগ থেকে মুক্তি দেবে, কিন্তু আজও তিনি সেই সত্য আবিষ্কার করেননি, বা উচ্চারণ করেননি…।' সাহিত্যে যে স্তরে ভবিষ্যৎদর্শী, সেই স্তরেই তলস্তয়

সংশয়ী। তিনি শুদ্ধ সাহিত্য থেকে ক্রমশঃই দূরে সরে যান। ফ্রান্স থেকে তুর্গেনেভের চিঠির সেই অনুরোধ ('বন্ধুবর, আপনি সাহিত্যের কাজে ফিরে যান।...আমার বন্ধু, রুশভূমির মহান লেখক, আমার প্রার্থনায় কান দেবেন') উপেক্ষা করেই। দারিদ্রের বাস্তবে বিপর্যস্ত তলস্তয় যতই ভরসা হারান ততই যেন সেই অর্ধমৃত ভরসাকে আঁকড়ে ধরেন, উচ্চৈঃস্বর উচ্চারণে। আর সঙ্গে সঙ্গেই দারিদ্রের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাকে বার বার প্রকাশ করেন, অসহায় আতঙ্কেই যেন।

অনুবাদ এবং ম্যাক্সিম গোর্কীর গল্পপাঠ

শ্যামল মৈত্র

ম্যাক্সিম গোর্কীর গল্পের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন অনেকেই। ম্যাক্সিম গোর্কী যত গল্প লিখেছেন তার মধ্যে অনেকের মতেই শ্রেষ্ঠ গল্পটি হল, 'মানুষের জন্ম'। তবে আরেকটি গল্প 'Song of the Stormy Petrel', সেটিও প্রায় সমান দাবিদার।

অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি সরাসরি রুশভাষা থেকে অনূদিত হয় না। ইংরেজী ভাষার হাত বদল হয়ে তা এখন পাঠকদের কাছে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে একে অনুবাদের অনুবাদ বলা যায়। রুশ ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করা বেশ কিছু সাহিত্য এবং চিরায়ত গ্রন্থ খোদ রাশিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইংরেজীর হাত বদল হয়ে অনুবাদের অনুবাদ হিসেবে যে গ্রন্থ আমরা হাতে পাচ্ছি তা সরাসরি অনূদিত গ্রন্থ সমূহের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য। রুশ ভাষা থেকে সরাসরি অনূদিত গ্রন্থগুলি সুখপাঠ্য হয় না; তার প্রধান কারণ হিসেবে মনে হয়, যাঁরা অনুবাদ করেন তাঁদের রুশ এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই সমান ব্যুৎপত্তি থাকে না। যে অনুবাদকের মাতৃভাষা বাংলা, দেখা যায় রুশভাষায় তাঁর দখল কম থাকায় অনুবাদে অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। আবার অনুবাদক রুশী হলে বাংলায় স্বল্পজ্ঞানের দরুণ তাঁর অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ হয় না। অবশ্য, দুটি ভাষায় সমান ব্যুৎপত্তি কখনই আশা করা যায় না। মাতৃভাষার সমান কি আর কেউ হতে পারে?

এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, আমরা সরাসরি অনুবাদকেই শুধু গ্রহণ করব, না অনুবাদের অনুবাদকে গুরুত্ব দেব! চীনদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লু সুন এই প্রসঙ্গে একবার ভারী সুন্দর দাওয়াই বাৎলে দিয়েছিলেন। 'কঠিন অনুবাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে "চীনদেশে বেশ কিছুকাল ধরেই দেখা যাচ্ছে ডারউইন এবং নীটশে, এই দুজনকে নিয়ে খুব আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ডারউইনের একটিমাত্র রচনা এবং নীটশের আধখানা মাত্র চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইংরেজী বা জার্মান জানেন এমন পণ্ডিত চীনদেশে কম নেই, কিন্তু তাঁরা সম্ভবত অনুবাদ কর্মকে তাঁদের মান মর্যাদার দিক থেকে কিছুটা ছোট কাজ বলে মনে করেন। আমি ইংরেজী বা জার্মান ভাষা তেমন ভাল জানি না। তবু লোকে যে যা বলে বলুক, আমার যেটুকু বিদ্যে আছে তা দিয়েই আমি কিছু না হোক, জাপানী বা ফরাসী ভাষা থেকেই যতটুকু যখন পারব অনুবাদ করে যাবো।"

ভারতবর্ষে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অনুবাদকর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেমচন্দ এবং কিছুটা রবীন্দ্রনাথের নাম করা চলে। অধিকাংশ নামী-দামী সাহিত্যিকের মধ্যে অনুবাদকর্মের প্রতি প্রচণ্ড অনীহা

থাকার ফলে ভারতবর্ষের সাহিত্যের আঙ্গিনায় বিদেশী সাহিত্যের আলো ভাল করে পড়তে পারে নি ! অনুবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ দিয়েছেন লু সুন। তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল আক্ষরিক অনুবাদের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে। অনেক সময় অনুবাদ একান্ত মূলানুগ হলে তার পাঠযোগ্যতা কমে যায়। সেক্ষেত্রে অনুবাদক যদি মূল থেকে কিছুটা সরে এসে স্বীয় কল্পনার রঙ্ মিশিয়ে রচনাটির অনুবাদ করেন তাহলে দেখা যায় অনূদিত রচনার রসাস্বাদ অনেক বেশী গ্রহণীয় হয়। সেক্ষেত্রে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে অনুবাদ আক্ষরিক হবার ফলে পাঠককে যদি তা পড়ার জন্য কিছুটা বেশী শ্রম স্বীকার করতে হয় তিনি বরং সেটুকু কষ্ট করুন, তবু অনুবাদকে যতদূর সম্ভব মূলানুগ করতেই হবে।

যদি গল্পের অনুবাদ অত্যন্ত মূলানুগত হয় তাহলে পাঠক মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। জীর্ণ-বিকল, মানুষের জন্ম, কবি, কোলুষা, প্রথম প্রেম আমরা ছাব্বিশ জন ও একটি মেয়ে অথবা পাঠক গোর্কীর এইসব গল্প অত্যন্ত মূলানুগ হবার ফলে পড়তে কিছুটা অস্বস্তি হয়, সুখপাঠ্য হলেও।

গোর্কী বলতেই সাধারণভাবে আমাদের রুশ বিপ্লবের কথা মনে পড়ে যায়। লেনিন বা স্তালিনের মতই গোর্কীও রুশ বিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যদিও গোর্কীর আগে তলস্তয় থেকে শুরু করে তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি, চেখভ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন অনন্য প্রতিভাধর শিল্পী সাহিত্যিক রুশ বিপ্লবের ভেরীবাদকের ভূমিকা পালন করেছেন।

ম্যাক্সিম গোর্কী কিসের তাগিদে লিখতে শুরু করলেন সেই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "এক দারিদ্রপীড়িত ক্লান্তিকর জীবনের চাপে পড়ে আমি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম—জীবনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা না বলে থাকা যায় না বলে কলম ধরেছিলাম। আমার উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে দুভাবে, সরাসরি বাস্তব জীবন থেকে আর গ্রন্থ অধ্যয়নে। প্রথমটাকে যদি বলা যায় ষাঁড়! দ্বিতীয়টি হল সেই ষাঁড়েরই চামড়া। প্রসঙ্গত বলি বিদেশী সাহিত্যের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। বিশেষত ফরাসী সাহিত্যের কাছে।" স্তাদাল, বালজাক ও ফ্লবেয়ারকে তিনি প্রায় আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কীর মত আমরাও যদি অমন অনুরাগভরে বিদেশী সাহিত্য আত্মস্থ করতে পেতাম তাহলে আমাদের সাহিত্যও অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত বলে মনে হয়। আর সাহিত্য এগোলে সমাজও এগোয়।

ম্যাক্সিম গোর্কীর রচনার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে তাঁর আগে এমন করে শ্রেণী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সচেতনভাবে আর কেউ সমাজের নিচুতলার মানুষের স্বার্থে গল্প উপন্যাস রচনা করেননি। সাহিত্যক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনে তাঁকে প্রধান ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তিনি এবিষয়ে যে যথেষ্ট দায়িত্ব সচেতন

ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁরই রচনায় : "সোভিয়েত লেখকদের ওপর ইতিহাস আজ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে সে সাহিত্য হবে মৌল তাৎপর্যে সার্বজনীন। সারা বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর ঘুম ভাঙাবে এই সাহিত্য। বৈপ্লবিক অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে তাদের।"

চরম দারিদ্র্যের পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই লেখক তাঁর জীবনের রূঢ়, রুক্ষ, তিক্ত সঞ্চয়কে গল্পে উপন্যাসে প্রাণভরে ঢেলে দিয়েছেন। সঙ্গে যোগ করেছেন তাঁর প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হৃদয়কে। গোর্কী যে কি ভীষণ আবেগপ্রবণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনায়। তাঁর যখন উনিশ বছর বয়স তখন তিনি ছিলেন এক রুটির কারখানার শ্রমিক। বলশেভিক পার্টির অনুগামী ছাত্ররা সেই এলাকায় এক সংগ্রামের কর্মসূচী পালন করতে গেলে পেশকভের (গোর্কীর আসল নাম) সহকর্মী শ্রমিকরা ছাত্রদের আক্রমণ করে। নিজের সহকর্মীদের এই সংগ্রামবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে পেশকভ এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি মনের দুঃখে আত্মঘাতী হতে যান। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন গুলি তাঁর ফুসফুসে লাগে নি।

গোর্কীর জীবনে দুটি পর্যায়ের ছোটগল্পের স্থান। প্রথম পর্বে আছে সরল মানবতাবাদের গল্প হিসেবে আমরা ছাব্বিশজন ও একটি মেয়ে, কবি, পাঠক ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় পর্বে আছে শ্রেণীচেতনায় ভাস্বর, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত রচনা হিসেবে মানুষের জন্ম, কমরেড, প্রথম প্রেম ইত্যাদি। গোর্কীর রচনায় এই দুটি পর্বের বিভাজন লক্ষ্য করতে গিয়ে মনে পড়ে আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁরও রচনাবলী দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম জীবনে উঁচুদরের শিল্পগুণান্বিত রচনায় ছিল ফ্রয়েডীয় চেতনার প্রভাব এবং মানবচরিত্রের রহস্যময়তার প্রতি প্রবল ঝোঁক। পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় গোর্কীর মতই শ্রেণী চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখতে হবে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে আমাদের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সুচিন্তিত বিশ্লেষণ আমাদের মনে রাখা দরকার "বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা যখন যতদূর অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার ততখানি শক্তিশালী হবার সম্ভাবনাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যায়। বাংলার শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সংস্কৃতির দুর্বার জোয়ার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে আছে বহুমুখী বিক্ষিপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলির মধ্যে। আমরাই গাফিলতি করে এতদিন ধারাগুলিকে একত্র করে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারি নি।" (লেখকের কথা)

ম্যাক্সিম গোর্কীর গল্পপাঠের সার্থকতা সেখানেই, যেখানে পাঠক ঐ গল্প পাঠ করে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবেন।

লু স্যুন: 'পাগলের রোজনামচা' ও সমাজতত্ত্ব

তপোবিজয় ঘোষ

লু স্যুনের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'হে যুদ্ধ, স্বাগত'-এর ভূমিকায় লু স্যুন নিজেই বলেছেন—'এক পাগলের রোজনামচা' হল তাঁর প্রথম গল্প-রচনা। 'হে যুদ্ধ, স্বাগত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে বেজিঙ্ [বা পিকিঙ্] থেকে। উক্ত গল্পটি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পটির রচনাকাল ১৯১৮। লু স্যুন তখন পরিণত বয়সের শিল্পী। তাঁর বয়স প্রায় আটত্রিশ (১৮৮১, ২৫ সেপ্টেম্বর—১৯৩৬, ১৯ অক্টোবর, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ)। ঐ বয়সেই তিনি প্রথম গল্প লেখা শুরু করেন। গল্পটি প্রকাশিত হয় চীনের 'নতুন যৌবন' নামক পত্রিকার ১৯১৮ সালের মে সংখ্যায়। 'নতুন যৌবন' ছিল সে-সময়ের চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা। ইতিপূর্বে লু স্যুন গল্প না লিখলেও নানা ধরনের অনুবাদকর্ম করেছেন, কিছু মৌলিক প্রবন্ধও লিখেছেন। জুলে ভার্নের বিখ্যাত গ্রন্থ 'From the Earth to the Moon' এবং 'Voyage to the Centre of the Earth'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন (১৯০৩); দুই খণ্ডে 'বিদেশী গল্পগুচ্ছ' প্রকাশ করেছেন (১৯০৯) এবং ১৯১১ সালে 'রেমিনিসেন্স অফ্ দি পাস্ট' বা 'অতীতের স্মৃতিচারণ' নামে একটি গল্প লেখারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই লেখাটিকে লু স্যুন নিজেই 'প্রথম গল্পে'র মর্যাদা দেন নি। দিয়েছেন 'পাগলের রোজনামচা'কে। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই গল্পটিই।

'পাগলের রোজনামচা' চীনা কথাসাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসের ধারায় এক প্রবল ব্যতিক্রমী গল্প। অভিনবত্ব এর বিষয়বস্তুতে, প্লট নির্মাণে, দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং ভাষা ব্যবহারে। এমন নাড়া-দেওয়া, চমক সৃষ্টি করা, জ্বালা-ধরানো উত্তেজক-গল্প চীনে ইতিপূর্বে আর কখনো লেখা হয় নি। এই গল্পের মধ্য দিয়ে চীনের আধুনিক কথাসাহিত্যের যাত্রা শুরু।

মূল গল্প আরম্ভের পূর্বে উত্তমপুরুষে লেখা সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা থেকে জানা গেল লেখকের হাতে তাঁর একদা সহপাঠী বন্ধুর দুটি ডায়েরী বা দিনপঞ্জী এসেছে। লেখক ডায়েরীর পাতা উল্টেপাল্টে দেখছেন। তাঁর মনে হ'ল—ডায়েরী লেখক অসুস্থ, একধরনের মানসিক উৎপীড়নে ভুগছে। সেই ডায়েরী থেকে কাটা-কাটা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অংশ অতঃপর উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেই বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিগুলোর সহযোগেই গড়ে উঠেছে এই অবিচ্ছিন্ন অসাধারণ ছোটগল্পটি।

মূল গল্পে সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত মোট ১৩টি অধ্যায় আছে—পাগলের তারিখবিহীন তেরোদিনের দিনপঞ্জী। এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের কালগত পারম্পর্য নেই। ভাবগত পারম্পর্য আছে যা না থাকলে গল্প হয় না।

গল্পের প্রথম অধ্যায়েই দেখা গেল, পাগল লিখেছে—'আজ রাতে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে।…আমাকে সতর্ক হতে হবে! না হলে যাও-বাড়ির কুকুরটি আমার দিকে দু'বার তাকাবে কেন? আমার ভয়ের কারণ আছে!'

গল্পের শুরুতেই এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এক ভয়তাড়িত মানসিকতার ছবি। মুহূর্তে চাঁদের মায়াবী আলোও যেন ম্লান হয়ে গেল। অজানিত কোনো এক যাও-বাড়ির হিংস্র কুকুরের ভয়ঙ্কর পাশবিক দৃষ্টি নিষ্ঠুরভাবে জ্বল জ্বল করে উঠে আকাশ মাটি চাঁদকে গ্রাস করে ফেলল। গল্পের শুরুতেই সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহারে গড়ে উঠল এক শ্বাসরোধী পরিবেশ। চাঁদের আলোর বন্যা এবং কুকুরের হিংস্রদৃষ্টি। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী উপাদানের সমাবেশ ঘটিয়ে লেখক লু স্যূন আশ্চর্য কৌশলে এই গল্পের মূল দ্বন্দ্বের আবরণ-উন্মোচন (exposition) করলেন। চাঁদের প্রেক্ষিতেই হিংস্রতা এমন ভয়াল হ'ল, আতঙ্ক এমন নির্মম হ'ল।

তার পরের দৃশ্যে আকাশে আর চাঁদ নেই। চাঁদের আর প্রয়োজনও নেই। যে কারণে তাকে আনা হয়েছিল—প্রথম অধ্যায়েই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। পাগলের দুই-নম্বর রোজনামচায় তাই দেখা গেল—'আজ রাতে কোনো চাঁদ নেই। জানি এটা অমঙ্গলের প্রতীক।' এ গল্পের ৮নং অধ্যায়ে আরো একবার চাঁদের প্রসঙ্গ থাকলেও তার তেমন উজ্জ্বলতা নেই এবং বিপরীতে এ গল্পের প্রায় সবত্র অন্ধকার নেমে এসেছে গভীর হয়ে। ৬নং পারচ্ছেদে পাগল বলেছে 'গভীর অন্ধকার। জানি না এখন দিন না রাত। যাও-বাড়ির কুকুরটি আবার ডাকছে। সিংহের হিংস্রতা, খরগোশের ভীরুতা, শেয়ালের ধূর্ততা……'

ভয় ও আতঙ্ক থেকে আগত এই অন্ধকার প্রাকৃতিক নয়, মানসিক। মনোবিকারের অন্ধকার। ক্রমে গল্পের নায়ক পাগলের মানসিকতায় এই অন্ধকার এমন চেপে বসেছে যে চাঁদ দূরে থাক্—সূর্যকেই তার মনে হয়েছে আলোহীন, নিষ্প্রভ। ১১নং পরিচ্ছেদে পাগল লিখেছে 'সূর্যের কোনো আলো নেই।' দিনরাত্রির পার্থক্যও সে আর করতে পারছে না—'জানি না এখন দিন না রাত।'

পাগলের চৈতন্য গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ একটাই, তার ভয় ও বিশ্বাস—সকলেই তাকে খুন করে তার মাংস খেতে চাইছে! এমন কি বাচ্চাদের চোখেও খুনীর দৃষ্টি! তার নিজের দাদাও তাকে খুন করার ও তার মাংস খাওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত। ১ থেকে ১২নং অধ্যায় পর্যন্ত পাগলের এই আতঙ্কই ক্রমে ক্রমে বিস্ফারিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় গল্পকার সুকৌশলে পাগলের মনের এই ভয়-আতঙ্ককে ক্রম-উর্দ্ধগতি (rising action) দান করে

একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে (climax) পৌঁছে দিয়েছেন। তার মানসিক স্তর-বিন্যাস এই রকম :

প্রথম দিনপঞ্জীতে পাগল যাও-সাহেবের কুকুরের হিংস্র দৃষ্টি থেকে ভয় পেয়েছে কিন্তু কি কারণে ভয় বলা হয় নি। পাগলও স্পষ্ট কারণ জানে না।

দ্বিতীয় দিনপঞ্জীতে পাগলের সন্দেহ হয়েছে যাও-সাহেব যেন তাকে খুন করতে চায়। রাস্তার বাচ্চারাও অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে যেন তাকে খুন করতে চায়। বাচ্চারা নিশ্চয়ই তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকেই এই দৃষ্টি পেয়েছে কিন্তু পাগলকে তারা সত্যই খুন করবে কিনা—এ বিষয়ে পাগল নিশ্চিত হয় নি।

তৃতীয় দিনপঞ্জীতে সন্দেহ গাঢ় হয়েছে। পাগলের অনিদ্রা রোগ দেখা দিয়েছে। এখন শুধু আর বাইরের অনাত্মীয় যাও-সাহেব নয়, ঘরের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর চোখেও পাগল খুনীর দৃষ্টি দেখছে। অর্থাৎ ঘরেবাইরে সর্বত্রই এখন সে খুনীদের দেখছে, ভয়ঙ্কর একটা চক্রান্তের আঁচ পাচ্ছে। এই সময়ই সে শুনতে পায় তার বড়দাকে একজন গ্রামবাসী জানাচ্ছে—তাদের 'নেকড়ের বাচ্চা' গ্রামের একজন লোককে পিটিয়ে মারা হয়েছে এবং কিছু লোক তার কলজে তেলে ভেজে খেয়েছে। এই ঘটনা শুনে পাগল আরো আতঙ্কিত হয়। এবং ক্রমে তার বিশ্বাস জন্মায় যে চারপাশের লোকজন তাকে শুধু খুন করতেই চায় না, তার মাংসও খেতে চায়। পাগলের স্নায়ুতন্ত্র আরো বিপর্যস্ত হয়। সে আরো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৪নং দিনপঞ্জীতে দেখা যায়—পাগলের মনোবিকার আরো বেড়েছে. একবাটি সেদ্ধ মাছ তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে—'মাছটির চোখ শক্ত এবং বিবর্ণ, মুখটা মানুষখেকো মানুষদের মত হাঁ-করা। বোঝা যায় না মাছ না মানুষের মাংস।' পাগল সেই মাছ খেতে পারে না, বমি করে দেয়। সেদ্ধ মাছকে একই সঙ্গে তার মানুষের মাংস এবং মানুষখেকো মানুষদের মতো মনে হয়. বোঝা যায় যে পাগলের বিকার জটিলরূপ ধারণ করেছে। তার দাদা ডাক্তার আনে। কিন্তু পাগল ডাক্তারকেও ভাবে নরমাংসাশী প্রাণী। ডাক্তার যেন দাদাকে চুপি চুপি বলে, 'এখনই খেয়ে ফেলতে হবে!' দাদাও যেন সায় দেয়। পাগলের এবার সন্দেহ হয়, তার নিজের দাদাও বুঝি মানুষখেকো, তাকে খেয়ে ফেলার চক্রান্তের দোসর। পাগলের শেষ বিশ্বাসের স্থানটুকুও যেন ভেঙ্গেচুরে যেতে থাকে। নিজেকে একজন মানুষখেকোর ছোটভাই ভেবে ভয়-আতঙ্কের সঙ্গে অদ্ভুত একধরনের বিষণ্ণতা অনুভব করে।

৫নং দিনপঞ্জীতে পাগল তার দাদার কথাই বিশেষ করে ভাবে। দাদা যে মানুষখেকো এ বিষয়ে তার পূর্ববর্তী সন্দেহ এবার স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়। ফলে সে এবার সমস্ত দিক দিয়ে আশ্রয়চ্যুত হয়। তার শেষ বিশ্বাসের জায়গা-টুকুও ভূমিকম্পে ধ্বসে যায়।

এরপর ৬নং দিনপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত অংশে পাগল শুধু দেখে—'সিংহের হিংস্রতা, খরগোশের ভীরুতা, শিয়ালের ধূর্ততা…'। বুঝতে পারে, তার পরিত্রাণের আর কোনো পথ নেই। এই দৃশ্যেই যেন গল্পের climax সূচিত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পাগলের চিন্তাভাবনা মানুষের মাংস-খাওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে অপেক্ষাকৃত শ্লথগতিতে আবর্তিত হতে থাকে। পাগলের অবসন্ন বিষাদগ্রস্ত মনে ধারণা হয় যে মানুষ কর্তৃক মানুষের মাংস খাওয়ার ইতিহাস বহু পুরাতন। আদিমকাল থেকে তা চলে আসছে এবং এখনো তার বিরাম নেই। কিন্তু যারা মানুষ খায় মানুষ হিসেবে তারা শুধু হিংস্র বা ধূর্তই নয়, তাদের মধ্যে 'খরগোশের ভীরুতা'-ও আছে। ভীরুতা কেন? ৯নং দিনপঞ্জীতে পাগল নিজেই তার কারণ ব্যাখ্যা করেছে—'মানুষ খেতে চাওয়া আবার একই সঙ্গে নিজেরাও খাবার হয়ে যাওয়ার ভয়। তাই তারা ভয়ে ভয়ে ও সন্দেহে একে অপরের দিকে তাকায়।' পারস্পরিক সন্দেহ, ভয়, হিংস্রতা ও ধূর্ততা নিয়েই মানুষ মানুষের মাংস খায়। ভয় যত বাড়ে নখদন্তও তত বেশি শাণিত হয়। আত্ম-লুপ্তির আশঙ্কাই তাকে অন্যকে খুন করার কাজে মরিয়া করে। এ শুধু ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব নয়, শ্রেণী-মনস্তত্ত্ব, সমাজ-মনস্তত্ত্ব। এবং এই খুনীদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয় বলেই তাদের মুখগুলো সবসময় থাকে মুখোশ আঁটা। (১০ নং দিনপঞ্জী দ্রষ্টব্য)।

পাগল এক সময় আবিষ্কার করে তার পাঁচ বছরের ছোট্ট বোনটির মৃত্যুর জন্য তার দাদাই দায়ী। সম্ভবত বোনের মাংস ভাতে-তরকারিতে মিশিয়ে পাগলকেও তারা খেতে বাধ্য করেছে…'হয়ত আমি অজান্তে আমার বোনের কয়েক টুকরো মাংস খেয়েছি! এবার আমার পালা…' (১২ নং দিনপঞ্জী)।

স্পষ্টতই গল্পটি গভীর সামাজিক ও ইতিহাসবোধের গল্প। আপাতদৃষ্টিতে পাগলের চিন্তাভাবনাকে এলোমেলো মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বাস্তবের পাগল ও গল্পের পাগল কখনো এক হয় না। বাস্তবের পাগলকে নিয়ে গল্পও হয় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লু স্যুনের গল্পের পাগলটি 'paranoid schizophrenia'-র রুগী। এটা একটা মানসিক রোগের নাম। এতে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মনে হয় সকলেই তাকে আক্রমণ করতে চাইছে, হত্যা করতে চাইছে। এই আক্রান্ত ও নিহত হওয়ার মানসিকতা থেকে তার মধ্যে নানা রকমের বিকার যথা, 'delusion of persecution', 'illusion' এবং 'hallucination' ইত্যাদি দেখা দেয়। পাগলেরও তাই দেখা দিয়েছে। দিনের আলোকেও তার রাত্রির অন্ধকার বলে ভ্রম হয়, মাছের সেদ্ধ টুকরোকে মানুষের মাংস মনে হয়, কুকুরের স্বাভাবিক দৃষ্টি আততায়ীর হিংস্র-দৃষ্টি হয়ে ওঠে, ডাক্তারের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সে চক্রান্ত খুঁজে পায়। এমন কি নিজেকেও সে কখনো বিশ্লিষ্ট করে এবং একটি কাল্পনিক মনুষ্যমূর্তি সম্মুখে দাঁড় করিয়ে 'মানুষের মাংস

খাওয়া উচিত অথবা অনুচিত'—এ সম্পর্কে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। তারপর নিজেরই মানসিক দুর্বলতার জন্য কাল্পনিক মূর্তির নিকট থেকে কোনো ইতিবাচক আশ্বাস সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে। গল্পে এর চমৎকার উদাহরণ পাগলের ৮নং দিনপঞ্জীটি। এখানে আসলে পাগলের অপেক্ষাকৃত সচেতন মনের অংশ বাইরে মূর্তি লাভ করেছে মগ্নচৈতন্যের টানে। পাগল লিখছে, 'হঠাৎ কেউ এল। তার বয়স মাত্র বিশ। আমি তার চেহারা ভালোভাবে দেখি নি।'—এই হঠাৎ-আসা যুবকটি বাস্তবের মানুষ নয়। পাগলেরই আরেক সত্তার আবির্ভাব। এ জন্যই সে যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎ-ই অদৃশ্য হয়ে যায়। আর এ কারণেই পাগল তাকে চেনে না। অপরিচিত রহস্যময় এই হঠাৎ-আগন্তুকটি পাগলের মন থেকেই জন্ম নেয়। সে এসে প্রকারান্তরে মানুষ-খাওয়ার ব্যাপারটাকেই সমর্থন করে। কারণ ইতিমধ্যে পাগলের মনে তার নিজের খুন হওয়ার ও তাকে মাংস বানিয়ে খাওয়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। চেষ্টা করেও তার অবচেতন বা অচেতন মন সেই ভাবনাটাকে তাড়াতে পারে না। সচেতন মন তাড়ানোর চেষ্টা করলেও মগ্নচৈতন্য থেকে সমর্থন আসে না। এ কারণেই আগন্তুক মানুষটি মাংস খাওয়ার পক্ষেই মত দিয়ে ফেলে। ফলে পাগল লাফিয়ে ওঠে চোখ বড় বড় করে ভয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। এটা এক ধরনের 'splitting of Ego' নিজের আত্মাকেই দ্বিখণ্ডিত করে দেখা। পাগলের মগ্নচৈতন্যের অপরূপ মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লু স্যুন জাপানের সেন ডাই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিলেন। ১৯০৪ সালের আগস্ট থেকে ১৯০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রায় দু'বছর তিনি ঐ কলেজে পড়েছিলেন। তারপর পাঠ অসমাপ্ত রেখে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন তাঁর বৃথা যায় নি। প্রথম গল্পটিতেই তার ছাপ সুস্পষ্ট। পরে অন্যান্য গল্পেও তার প্রভাব আছে। মনোবিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম-দৃষ্টিপাতে এ গল্পটি আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে। মনোবিজ্ঞান আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেরই অপরিহার্য অঙ্গ।

কিন্তু এ গল্পের বিশেষত্ব পাগলের বিকারগ্রস্ততার মধ্যে নিহিত নয়। সামগ্রিক বিষয়বস্তু থেকে নিক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার মধ্যেই এর অসাধারণত্ব। এই গল্পের সাহায্যে লু স্যুন আসলে যা বলতে চেয়েছেন—সেই নিহিতার্থটি গূঢ় এবং গভীর। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মানুষের শিকার হয়, মানুষই মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডে কামড় বসায়, মানুষের রক্তশোষণ করে মানুষ স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, রাজতন্ত্রে বা জমিদারতন্ত্রে মানুষ-হত্যার রূপটি নগ্ন ও ভয়াল। একদিকে আচার-বদ্ধ সমাজব্যবস্থা ধর্মের নামে প্রকাশ্যে মানুষ পুড়িয়ে মারে, নরবলি দেয়, শিশুহত্যা করে, কুমারীর রক্তে দেবতার তৃপ্তিসাধনের কথা বলে—

অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ কৃষকের প্রাণ বলিদান হয়। হত্যার নগ্ন প্রকাশ্য ধারাবাহিক 'উৎসব' সামন্ততন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট। গল্পের পাগলটিও সেই ধারাবাহিক ইতিহাসকে বারংবার স্মরণ করেছে। ১২নং দিনলিপিতে সে বলেছে—'শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি যে গত কয়েক বৎসর ধরে আমি এমন জায়গায় বাস করছি যেখানে চার হাজার বছর ধরে মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে।' বলাবাহুল্য 'চারহাজার বছর'-এর উল্লেখ চীনের দীর্ঘকালের সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বোঝাতে। গল্পের নানা স্থানেই সামন্ততান্ত্রিক আচার-অন্ধতার প্রসঙ্গ আছে। একস্থানে বলা হয়েছে—'একদল লোক সাহস বাড়ানোর জন্য তার কলজেটা তেলে ভেজে খেয়ে ফেলেছে' (৩নং দিনলিপি), অন্যত্র আছে (১০নং দিনলিপি) 'গতবছর তারা শহরে এক আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং এক যক্ষারোগী তার রক্তে রুটি ভিজিয়ে তা খেয়েছে।' (এরকম প্রসঙ্গ লু স্যুনের 'ওষুধ' গল্পেও আছে)।—এর কোনোটাই কাল্পনিক নয়—চীনের সামন্তযুগের নানা লোকবিশ্বাস হাতুড়ে চিকিৎসার অনিবার্য ফল। এর অনেক কিছুই লু স্যুন নিজের চোখে দেখেছিলেন। ইতিহাস ঘেঁটে জেনেছিলেন ই ইয়ার কাহিনী, যে নিজের ছেলেকে সেদ্ধ করে চীনের ছি-বংশের নবাব হুয়ানকে উপহার দিয়েছিল কিংবা ১৯০৭ সালের স্যু-সীলিনের পরিণতির কথা। স্যু সীলিন ছিলেন ছাং রাজবংশের (১৮৪৪-১৯১১) শেষ দিককার বিপ্লবী মানুষ। ১৯০৭ সালে তার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং কিছু লোক তার হৃদ্‌পিণ্ড ও যকৃৎ সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলে। এসব পুরনো রেকর্ড ও বর্তমান ঘটনার প্রতিক্রিয়াই মূর্ত হয়ে উঠেছে লু স্যুনের আলোচ্য গল্পটিতে। এই গল্পের শিকড় বাকড় তথা বস্তু ভিত্তি চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ইতিহাসের মধ্যেই প্রোথিত। এই সূত্রে চীনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথাও স্মরণযোগ্য—যেগুলো লু স্যুনকে এরকম একটি ভয়ঙ্কর-মানসিকতার গল্প লিখতে প্ররোচিত করেছে। ১৮৪২ সালের চীনের প্রথম আফিঙ যুদ্ধের পরিণতিতে নানকিং-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকেই চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে আসে আমেরিকান, ফরাসী ও জাপানীরা। চীন ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবাধ মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ধন-সম্পদ লুণ্ঠন থেকে মানুষ শিকার নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। পিকিঙ বা বেজিঙে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তা কার্যত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুতুলে পরিণত হয়। চীনের জনগণের উপর নেমে আসে সীমাহীন অত্যাচার ও নিপীড়ন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংস্পর্শে এসে চীন আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক সমাজে পরিবর্তিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ এক হয়ে চীনা জনগণকে রক্তহীন পাণ্ডুর করে তোলে। এসময় চীনের সামন্তপ্রভু ও উদীয়মান মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ারা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে কেউ ইংরেজের,

কেউ আমেরিকার, কেউ ফরাসী বা জাপানীদের পদ-লেহনকারী ভৃত্যে পরিণত হয়। তারা স্বজাতির রক্ত মাংস শোষণের জন্য গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াতে থাকে। সমগ্র চীন ভূখণ্ডে এক অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায়ের কাল উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় সকলেই সকলের মাংস শিকারের জন্য ওৎ পেতে থাকে। আবার নিজেরাও খাদ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিতও থাকে। লু স্যুন যখন গল্পটি লিখেছেন তখন চীনে এইরকম অবস্থাই চলছে। ১৯১১ সালের বিপ্লব চীনা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটালেও চীনের জনগণের দুঃখ দুর্দশার বিন্দুমাত্র অবসান ঘটায় নি। এই সময় চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাও ছিল দুর্বল এবং ১৯২০ সালের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টিরও জন্ম হয় নি। বস্তুতপক্ষে ১৯১২-থেকে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত চীনের বুকে এক অন্ধকার হিংস্র মাংসাশী রাজত্ব বিরাজ করছিল। চীনের ঐতিহাসিকগণ এ সময়ের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—'Under the autocratic rule of Yuan shikai the country continued to be governed by the big landlords and comprador bourgeoisie. Yuan shikai flagrantly carried on the policy of selling out the country and, with the support of the imperialist powers, attempted to crown himself 'Emperor'. He failed to establish a monarchy and after his sudden death in 1916, political power fell into the hands of Yuan's successors —a group of military leaders known as the Beiyang warlords. When one of the various cliques, into which these warlords were divided, seized control of Beizing, it set up so a called 'central Government'. This 'central Government' became the prey of warlords, bureaucrats and various shameless politicians. The warlords of the different provinces maintained huge military establishments, each regarding himself as the 'supreme authority' in his own region and fighting the others in internecine wars.'

'পাগলের রোজনামচা' গল্পটির রচনাকালে লেখকের মনে চীনের গৃহযুদ্ধের ঐ রক্তাক্ত ইতিহাস বিশেষভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল। লু স্যুন এইসময় এক ধরনের হতাশা-রোগেও ভুগছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'হে যুদ্ধ স্বাগত' —গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর নিজের উক্তি থেকে। 'নতুন যৌবন' পত্রিকার সম্পাদক জিন সিনই-কে তিনি বলেছিলেন—'জানালাবিহীন একটি লোহার বাড়ির কথা চিন্তা কর যা ধ্বংস করা যায় না। এর ভেতরে বহু লোক গভীর ঘুমে অচেতন যারা সহসা দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। যেহেতু তারা ঘুমের মধ্যে

মারা যাবে যেহেতু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে না। তুমি যদি তাদের মধ্য থেকে পাতলা-ঘুমের কয়েকজনকে জাগানোর জন্য চিৎকার কর এবং অন্যান্যদের ঘুম ভাঙিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে দাও—তাহলে তুমি কি তাদের উপকার করছ?'

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, উপরোক্ত নেতিবাচক হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কিছু অংশে 'পাগলের রোজনামচা' গল্পেও সংক্রামিত। কেননা—পাগলের দৃষ্টিতে সকলেই মাংসাশী, সকলের চোখেই খুনীর দৃষ্টি। এমন কি রাস্তার বাচ্চারাও তাদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে ঐ দৃষ্টি পেয়েছে। বর্তমান, বহমান জগতে পাগলের কাছাকাছি ঘরে-বাইরে এমন একটিও মানুষ নেই যাকে বিশ্বাস করা চলে। অবিশ্বাস, সন্দেহ ঘৃণা, ভয়, আতঙ্কে মোড়া এই গল্প।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গল্প নেতিবাচক দর্শনের শিকার নয়। ইতিবাচক পরিসমাপ্তি লাভ করেছে শেষ কয়েকটি শব্দে—'সম্ভবত এখনো অনেক শিশু আছে যারা মানুষ খায়নি। শিশুকে বাঁচাও।' (১৩নং দিনলিপি)। এই চমৎকার ব্যঞ্জনাগর্ভ উপসংহার গল্পটিকে নেতিবাচকতার স্তর থেকে অর্থবহ ইতিবাচকতায় উত্তীর্ণ করেছে। গল্পের পাগল তার শেষ বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছে অমলিন পবিত্র শিশুদের কাছেই—পরবর্তী স্তরে যারা গড়ে তুলবে এক নতুন সমাজ, যেখানে মানুষ মানুষের হৃদপিণ্ড শিকার করবে না।

তাছাড়া গল্পের পাগল চরিত্রটি যেহেতু প্রকৃত পাগল নয়—সেহেতু তার আপাতঃ বিশৃঙ্খল চিন্তাভাবনার মধ্যেও সুস্থ মানবিকতার লক্ষণগুলো ধারাবাহিক-ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে আসলে এই মাংসাশী-সমাজে এক প্রবল প্রতিবাদ—এক জাগ্রত বিবেক। শুধু চীনের নয়—সমগ্র বিশ্বের নরমাংসলোভী সামন্ত তান্ত্রিক অথবা পুঁজিবাদী-ব্যবস্থায় মানবিকতার, নতুন সমাজ-ভাবনার 'বিশ্ব-বিবেক।' সে আঘাত করতে চেয়েছে আমাদের চৈতন্যকে, আমাদের ক্লীবত্বকে, হিংস্র পরিবেশের নিকট আমাদের দুর্বল ভীরু আত্মসমর্পণের নপুংসক মনোবৃত্তিকে।

লক্ষ্য করার বিষয়, এই পাগলই একদিন, বিশ বছর আগে, মিঃ গু জিউ নামক জনৈক সামন্তপ্রভুর পুরনো ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে তার অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তার এই অভিযানের ফলে—স্বভাবতই সকল প্রতিক্রিয়ার শিবির তার বিরুদ্ধে সংহত এবং আক্রমণমুখী হয়েছে। গল্পে তারই প্রতিনিধিত্ব করছে মিঃ যাও ও তার কুকুর। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঐ শিবিরের প্রসাদপুষ্ট পেটিবুর্জোয়ারাও। তাই পাগলের ঘরে-বাইরে শত্রু—সকলের চোখেই খুনীর দৃষ্টি। পাগল আতঙ্কগ্রস্ত কিন্তু তাই বলে তার বিবেক ঘুমিয়ে পড়ে নি। সে মেরুদণ্ড সোজা রেখেই পথ হেঁটেছে। প্রবল আতঙ্কগ্রস্ততার মধ্যেও তার চরিত্রের প্রতিরোধের

দীপ্তি এই গল্পে ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়েছে। ২নং দিনলিপিতে পাগল লিখেছে, 'আমি নির্ভয়ে পথ চলতে থাকি।' ৪নং দিনলিপিতে লিখেছে, 'এসব দেখেশুনে আমার হাসতে হাসতে মরে যাবার দশা… আমি জানি এ হাসিতে সাহস এবং সততা আছে।' মনুষ্যত্বের সতর্ক প্রহরী, মানবিকতার সাহসী জাগ্রত বিবেক এই চরিত্রটি গল্পের মধ্যে বারংবার 'মানুষের মাংস খাওয়া উচিত কি না'—এ বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং সততার সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে—মানুষখেকোদের অভিশপ্ত করা উচিত এবং এ কাজ শুরু করবে তার দাদাকে দিয়েই (৭ নং দিনলিপি)। চিৎকার করে বলেছে, 'তোমরা বদলে যাও। হৃদয় মন নিয়ে বদলে যাও। তোমাদের জানা উচিত ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে মানুষখেকোদের জায়গা হবে না।' (১০ নং দিনলিপি)। গল্পের তথাকথিত পাগলের এই ঘোষণা চীনের নবজাগ্রত বিপ্লবী শক্তিরই সমাজ বদলের ও নতুন সমাজ গঠনের দীপ্ত ঘোষণা। এখানেই লু স্যুন নতুন কালের শিল্পী, নতুন চিন্তার দিশারী।

এই গল্পের ভয়ংকর শ্বাসরোধী পরিবেশ ও পাগলের আর্তকণ্ঠের প্রবল প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে লু স্যুন আসলে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে চেয়েছিলেন দেশের যুবশক্তিকে। চীনা সমাজের বিকারগ্রস্ততার রূপ উদ্ঘাটিত করে, তার আত্মধ্বংসী নগ্নরূপ তুলে ধরে, সচেতন করতে চেয়েছিলেন লোহার ঘরে ঘুমন্ত জড়ত্বপ্রাপ্ত স্বজাতির পঙ্গু মানসিকতাকে। পরস্পরের মাংস-শিকারে উন্মত্ত না হয়ে এক নতুন ভালবাসার সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর এসব কাজ করার জন্যই লু স্যুন শিল্পে দীক্ষিত ছিলেন। সেনডাই কলেজে চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে তিনি স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন জাতীয় চরিত্রের ক্ষতস্থানসমূহের শল্যচিকিৎসার জন্য। লু স্যুনের এই গল্প সেই শল্য-চিকিৎসার গল্প! গল্পের পাগল-চরিত্র সেকালের চীনের জাতীয় জীবনে 'বৈদ্যুতিক শক্'-এর কাজ করেছে। যেমন করেছে লু-স্যুনের আর এক আধ-পাগল চরিত্র—আ কিউ, 'আ-কিউ এর সত্য কাহিনী' গল্পে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দ্বিতীয়টি ছোটগল্প নয়, বড়োগল্প। লু স্যুনের ছোটগল্পের মধ্যে, আমার ধারণা, বিষয়বস্তুর গভীরতায়, সমাজ-ইতিহাসের মর্মোদ্ঘাটনে, ভবিষ্যতের আশাবাদী রূপ-কল্পনায় এবং প্লট নির্মাণ ও চরিত্রসৃষ্টির কৌশলে তাঁর প্রথম গল্পটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

মেটামরফোসিস এবং সমাজ জিজ্ঞাসা

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

মেটামরফোসিসের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা □

ফ্রানৎস কাফকার (FRANZ KAFKA) বিখ্যাত ছোটগল্প 'মেটা মরফোসিস।' মেটামরফোসিস (metamorphosis), এই ইংরেজী বিশেষ্য পদটি বাংলায় অনেকভাবে অনুবাদ করা যায়। যথা, রূপান্তরের কাহিনী, আকৃতির পরিবর্তন, রূপান্তর বা পোকা ইত্যাদি।

কাফকার 'মেটামরফোসিস' গল্পটি জার্মান দেশের কোন এক উচু মধ্যবিত্ত পরিবারকে নিয়ে লেখা। কাফকা-পরিবারের কাহিনীও অনেকাংশে 'মেটামর ফোসিস' গল্পের মতোই ছিল। বলা যেতে পারে কাফকার ব্যক্তিগত জীবনের গভীর রেখাচিত্র। কাফকার বয়স তখন ত্রিশ। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পটি লেখেন। বাবা-মা এবং ভাই-বোন যথাক্রমে গ্রেগর, গ্রীট এই নিয়ে 'মেটামরফোসিস্' গল্পের পরিবার। তিন ঘরের একটি দামী ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে শহরের অভিজাত অঞ্চল শারলোট্রেনস্ট্রাসে বাস করে। সময়টা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের কাল, ১৯১৩।

এই পরিবারে আছে ঠিকা ঝি এবং রাঁধুনি। উৎসবে অনুষ্ঠানে পরে যাবার মতো মা-বোনের যথেষ্ট অলংকার আছে। কার্পেট বিছানো ঘর। দামী দামী ফার্নিচার, সুসজ্জিত। এ সবই সম্ভব হয়েছে গ্রেগর সামসার মোটা মাইনের চাকরীর জন্য। সে এক ব্যবসায়িক ফার্মে সেলস্‌ম্যানের চাকরী করে। ঐ ফার্মে চার বছর চাকরী করেই গ্রেগর মোটা অঙ্কের সিঁড়ির উঁচু ধাপে উঠে যায়। আগে ঐ ফার্মেই কেরানির কাজ করতো। ভোর সাতটায় চাকরী করতে বের হয় এবং সন্ধ্যায় মদ্যপান করে ঘরে ফেরে গ্রেগর। গ্রেগরের বাবার কাজ নেই। তিনি ঘরেই থাকেন। এক সময় তিনি একটা ব্যবসা করতেন। সেই ব্যবসা ফেল্ করেছে। সে সময় তিনি কিছু মোটা টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন। গ্রেগর সেটা জানতো না। আসলে বাবা জানতে দেন নি। এতকাল গ্রেগরের ধারণা ছিল যে ব্যবসা ফেল হওয়ার দরুন বাবা এক কানাকড়িও রক্ষা করতে পারেন নি।

সামসা পরিবারে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আভিজাত্য এনে দিয়েছে গ্রেগর। সেজন্য এই পরিবারের ভয় যদি গ্রেগরের চাকরী চলে যায় বা গ্রেগর যদি চাকরী ছেড়ে দেয় বা গ্রেগরের যদি কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে পুনরায় ফিরে আসবে ধ্বস্ত জীবন। মুহূর্তেই উবে যাবে এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য, এই আভিজাত্য। আর ঐ ব্যবসায়িক ফার্মের মালিকের মর্জির উপর নির্ভর করছে গ্রেগর। এসব ভেবেই গ্রেগরকে বাবা এবং বোন গ্রীট তোয়াজ করে। চাকরী

থেকে সন্ধ্যায় গ্রেগর ফিরে এলে বাবা পুত্রের ঘরে গিয়ে দু'একটা কথায় কুশলবার্তা জেনে নেয়। বোন মাঝে মধ্যে বেহালা বাজিয়ে ভাইকে শোনায়। একমাত্র চির রুগ্ন মা এর ব্যতিক্রম। যে কোন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার জন্যই যেন মাতৃত্বের আবির্ভাব এই সংসারে।

এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মুদ্রাস্ফীতিতে স্ফীতকায় ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থাই তাদের সম্পর্কিত অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। এই সম্পর্ক এবং অস্তিত্বটা সরিয়ে দিলে মা-বাবা এবং ভাইবোনের অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় সেটাই কাফকা এই গল্পে সুন্দর এবং নিখুঁত বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সংকটাপন্ন অবস্থার পরিণতি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজে সংকটাপন্ন আর্থিক সীমার মধ্যে ব্যক্তি মালিকানার সাথে গ্রেগরের আর্থিক সম্পর্ক এবং অস্তিত্ব, গ্রেগরের সাথে পরিবারের সম্পর্ক এবং অস্তিত্ব বোঝাতে সাহায্য করেছেন কাফকা এই গল্পে।

ফার্মের মালিক এবং ম্যানেজারের কাছে গ্রেগর মানুষ নয়। গ্রেগর সেখানে ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির জন্য এক মূল্যবান যন্ত্র বিশেষ। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানবিকতা বাজারি পণ্য ছাড়া কিছু নয়। এ বোধ কাফকা পাঠকের মধ্যে জাগিয়ে দেন। যার জন্য গ্রেগরের অসুখকে বা একদিনের স্বাধীন আলস্যকে কোনপ্রকার গুরুত্ব না দিয়ে ফার্মের ম্যানেজার বলতে পারেন, 'যাহোক আমরা ব্যবসা বুঝি। আমরা কাজ চাই। তোমাকে অফিসে আসতেই হবে।'

গ্রেগরের সংকট স্বাধীন চলাফেরা এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার সাথে পরাধীন আর্থিকতা এবং পরিবারের ভরণপোষণ। একদিকে গ্রীটের বেহালার সুরের জগৎ, অপরদিকে বাঁচার এবং বাঁচাবার তীব্র যন্ত্রণা। মাঝখানে গ্রেগরের স্বাধীন সত্তা। এখানেই লেনিনের কথা মনে আসে, 'বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী মহোদয়রা, আমরা বলতে বাধ্য যে আপনাদের পরম স্বাধীনতা কথাটা একেবারেই ভণ্ডামি। যে সমাজ অর্থ-আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে মেহনতী জনগণ দারিদ্রে ভোগে, আর পরজীবী হয়ে দিন কাটায় মুষ্টিমেয় ধনী, সেখানে বাস্তব ও সত্যকারের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। যে সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থ-আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে না।' কাফকা লেনিনের বক্তব্যকেই উন্মোচিত করেছেন 'মেটামরফোসিস' ছোটগল্পে। কাফকার নায়ক গ্রেগর ভাবছে, 'যে করেই হোক ম্যানেজার সাহেবকে ধরতে হবে, মন জয় করতে হবে।' মালিকের মর্জির ওপরেই এখন গ্রেগর এবং তার পরিবারের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে চাকরী-জীবন কত যে দুর্বিসহ, পারিবারিক জীবন কত যে অন্তর-বিযুক্ত এবং জীবনের রসকে কিভাবে নিংড়ে আখের ছিবড়েতে পরিণত করে দেয় তা জানতে বুঝতে পারি গ্রেগরের অনুভবের ভিতর দিয়ে। গ্রেগর

তাবে প্রতিদিন একইভাবে সাত সকালে বিছানা থেকে ওঠা-ব্যাপারটার মতো বাজে ব্যাপার জীবনে আর কিছুই হতে পারে না। নিজের মধ্যে অবস্থান করে গ্রেগর নীরব প্রতিবাদ জানায়: 'বাবা-মার ভরণপোষণের ঝামেলা না থাকলে কিছুতেই আমি এ চাকরি করতাম না। সোজা মালিকের কাছে গিয়ে বলতাম, দিনরাত ঘুরে ঘুরে কাজ করা আমার পোষাবে না।' এরপরও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে গ্রেগরকে এই পরিবেশের কাছে নতজানু হতে হয়। প্রতিবাদী মানসিকতা যখন প্রতিবাদের কোন পথ খুঁজে পায় না তখনই সে প্রতীকী কীটে বা পোকায় পরিণত হয়ে যায়। এই মহৎ ভাবনাটাই কাফকাকে সাহিত্যের জগতে মহান এবং ছোটগল্পকার হিসেবে শক্তিশালী করে রেখেছে। 'মেটামরফোসিস' গল্পের মূল চরিত্র গ্রেগর সামসাও কীটে পরিণত হয়ে যায়। গল্পের শুরুও হয় এভাবে, 'বিশ্রী স্বপ্ন দেখার পর একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই বিছানায় শুয়ে গ্রেগর সামসা বুঝতে পারলো যে সে একটা ভয়াবহ পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।' অসহায় মানসিকতা, বিচ্ছিন্নতা-বোধ, সারেণ্ডার মনোভাব এবং বাঁচার ভয় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মালিকাধীন এবং মালিকানুগত কর্মচারীদেরকে পোকায় পরিণত করে ফেলছে। এরজন্যই মার্কস-লেনিন দাবী করেন, বিপ্লবের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে শ্রমিক কৃষকের ঐক্য। কারণ এঁরাই সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। গ্রেগর সামসার মতো কর্মচারীরা নয়। অফিসের কর্মচারীরা প্রতিবাদের পথ হিসেবে যদি কোনদিন আন্দোলন বা মিছিলও করে তা একদিন হয়ে যাবে যান্ত্রিক। শেষপর্যন্ত মালিক বা শোষকগোষ্ঠী ওতে ভয় পায় না।

এই গল্পে দেখতে পাই গ্রেগরের রাগ আছে, ক্রোধ আছে, ক্ষোভ আছে, কিন্তু বাঁচার প্রশ্নে প্রতিবাদ করতে পারে না, ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে না। গ্রেগর দুর্বল, গ্রেগর অসহায়, গ্রেগর বিচ্ছিন্ন। সে যুগ-যন্ত্রণাক্রান্ত।

গ্রেগরের পোকায় রূপান্তরিত হওয়ার আরও একটি দিক আছে। সেটা হচ্ছে গ্রেগরের জীবনের অস্তিত্ব এবং সমাজ ও পরিবারের সাথে ব্যক্তি জীবনের সম্পর্ক। গ্রেগর যখন মোটা বেতনের চাকরী করতো তখন পরিবারের সাথে গ্রেগরের সম্পর্ক এবং যখন চাকরী না করে কীটে রূপান্তরিত হয়ে পরিবারের বোঝা হয়ে দিনরাত কাটাতো পরিবারের সাথে তখনকার (এখানে বুর্জোয়া অর্থনীতি মানবিক সম্পর্কগুলোকেও রূপান্তরিত করে তুলছে) সম্পর্ক কি অভিন্ন? না অভিন্ন নয়। গ্রেগরের জীবনকে সময়ের দুভাগে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারা যায় যে অস্তিত্ব ও সম্পর্কগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা। জীবনের বনিয়াদ অর্থ যোগাড় দিতে না পারলে পরিবারের ভালবাসা হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর, নির্দয়যন্ত্র বিশেষ। গ্রেগর বুঝে মরলো যে চারদিকে দস্যুর মতো নিষ্ঠুর অন্ধকার। সে এ বাড়িতে এখন অবাঞ্ছিত।

মেটামরফোসিস ও বিচ্ছিন্নতা □

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগের ও শ্রম-বিভাগের ফলে মানুষ নিজের শ্রম থেকে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মার্কসের ভাষায়, 'The positive transcendence of private property as the appropriation of human life is the positive transcendence of all estrangement,—that is to say, the return of man to human, i.c social mode of existence" (Economic and Philosophic Manuscripts—1844 ; P. 103).

অবশ্য অস্তিবাদীরা বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে অন্য ধারণা পোষণ করেন। তাদের মতে গ্রেগরের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যা, ধনতন্ত্রের সমস্যা নয়। কিন্তু 'মেটামরফোসিস' গল্পটি পড়লে তা মনে হয় না। আবার অনেকের মতে ফ্রয়েডীয় লিবিডো-তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাগুলো দেখা যায়। গ্রেগরের সমস্যাটা সেখানেও দেখা যায় না। অনেক মার্কসবাদীরাই অস্তিবাদে বিশ্বাস করেন। জাঁ পল সাত্র´ তাদের মধ্যে একজন। তাঁদের বিশ্বাস যান্ত্রিক সভ্যতাই বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ যা নাকি সমাজতান্ত্রিক দেশেও দেখা দিতে পারে। কিন্তু 'মেটামরফোসিস' গল্পটিকে ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা ঠিক হবে না। সাম্রাজ্য-বাদী ক্ষুধা ও লোভের পরিণতি প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের নিট ফল ধনতান্ত্রিক সমাজে ভয়ংকর মুদ্রাস্ফীতি। এরই পটভূমিকায় গল্পটি বিচার করলে দেখা যাবে যে তখনকার সমাজ ছিল বাণিজ্য ভিত্তিক। মুনাফার জন্য দ্রব্য, মুনাফার জন্য শ্রম এবং মুনাফার জন্য মানুষ। বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা বৃদ্ধির এ-ও এক কারণ। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা থেকে হতাশা, হতাশা থেকে নিষ্ক্রিয়তা। আর এরই প্রতীক গুবরে পোকা বা আরশোলা অর্থাৎ কাফকার 'মেটামরফোসিস'।

সামন্ততন্ত্রের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যে স্বাধীনতা পেয়েছিল সে স্বাধীনতার অনেকখানিই আজ নেতিবাচক স্বাধীনতায় পরিণত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গ্রেগরের অবস্থান দেখে আমাদের তাই মনে হয় যে নেতিবাচক স্বাধীনতাকে কাফকাও স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু এই পর্যন্ত কাফকার দৃষ্টিভঙ্গির সীমারেখা। বিশ বৎসরের কাফকা যে ভাবে পুঁজিবাদী সমাজের পোষ্টমর্টেম করেছেন তা পরবর্তীকালে মার্কসবাদী লেখকদের তখনকার সামাজিক অবস্থানকে বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে। শুধু মেটামরফোসিস গল্পটি নয়, এক্ষেত্রে স্মরণীয় তাঁর আরও একটি ছোটগল্প 'ইন দ্য পেনাল কলোনী'। ভয়, নিঃসঙ্গতা, অনিশ্চয়তা ক্রমশ মানসিক সক্রিয়তাকে অসাড় করে দিয়েছে। এরকম অবস্থায় যারা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শিকার তাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় পলায়ন, না হয় সদর্থক দিকটির সক্রিয় সংগঠন। শেষের পন্থা গ্রহণ করা এই

সমাজে কাফকার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পরিবেশ, বয়স, পিতৃ-সম্পর্ক, ধর্ম, প্রেম ইত্যাদি কাফকাকে নিয়ে গিয়েছিল অন্য এক মানসিক জগতে যেখানে কাফকা একা। সেজন্য এক সমালোচক বলেন, "From his (Gregor Samsa) meditations in bed—symbol of a dangerous isolation from the external world."

ধনতান্ত্রিক যন্ত্রযুগের বিশেষ উৎপাদন প্রণালী ও শোষণ ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করে। ব্যক্তি মাত্রই বিচ্ছিন্নতার ফলে অটোমেশনে (automation) পরিণত হয়। কাফকা কি শোষণ ব্যবস্থার চেয়ে অটোমেশনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন? এক সময় কাফকা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিন্দনীয় ছিলেন। কিন্তু আজকাল আর নিন্দনীয় নয় কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও যন্ত্র-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে। তবে সমাজতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতা ও ধনতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতা এক নয়। যন্ত্র সভ্যতার ফলে যে বিচ্ছিন্নতা এবং শোষণ ও শ্রম বিভাজনের ফলে যে বিচ্ছিন্নতা দুটোকে এক করে দেখা চলে না। প্রথমটির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না, কারণ সেখানে স্বজন-বিযুক্ত মানসিকতা গড়ে ওঠে। গ্রেগর সামসাও মুক্তি পায় নি।

□ মেটামরফোসিসের ইতিহাস □

রোমক গ্রীক পুরাণ কাহিনী থেকে আহৃত গল্পের উপাদান নিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৪২ শতাব্দী পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে প্রাচীন রোম কবি ওভিদ লিখেছেন প্রথম রূপান্তরের কাহিনী, 'দি মেটামরফোসিস' নামে। ওভিদের 'দি মেটামরফোসিস' অনেক লেখককেই প্রভাবিত করেছিল। কাফকাকেও প্রভাবিত করে থাকবে হয়তো। পনেরোটি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত বইটিতে গ্রীক সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে সীজার পর্যন্ত রয়েছেন। যেমন ভাবে, ওভিদের আবাকৃনি এবং নারোবির উপাখ্যানে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বের কাহিনীতে ক্রুদ্ধা শিল্পদেবী মিনার্ভা মানবী আবাকৃনির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেলে আবাকৃনিকে অভিশাপ দিয়ে মাকড়সায় পরিণত করে দেন। ঠিক তেমনি ভাবে নিয়তিধন্য ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপে গ্রেগরও দৈত্যসদৃশ পোকায় পরিণত হয়ে যায়। তবে ওভিদের কাহিনীতে দেবতা ও মানুষের যে শ্রেণী সংঘর্ষের পরিণতি দেখানো হয়েছে তা কাফকার 'দি মেটামরফোসিস'-এ অনুপস্থিত। স্মরণীয় কার্ল মার্কসের প্রিয় লেখক ছিলেন ওভিদ।

কাফকার 'মেটামরফোসিসে'র সাথে আরও বেশী সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় রোমান দার্শনিক আপুলিয়াসের লেখা 'দি মেটামরফোসিসের' মধ্যে। আপুলিয়াসের গল্প 'দি মেটামরফোসিসে'র আরেক নাম 'The golden Ass." এই গল্পের প্রধান চরিত্র এক-তরুণ দার্শনিক সোনালি গর্দভে রূপান্তরিত হয়ে যান। এই

সোনালী গর্দভ বিভিন্ন ধরনের এড্ভেনচারের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয় এবং বিভিন্ন ধরনের এ্যাড্ভেন্চার নিয়ে এক একটি কাহিনী গড়ে ওঠে।

ওভিদের কালে প্রাচীন রোমের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ছিল। রাজা অগস্টাসের বিরুদ্ধে যৌবনের বিদ্রোহ দেখেছেন কথাশিল্পী ওভিদ এবং বিদ্রোহের বাণীরূপ দিলেন তাঁর গ্রন্থে। দাসপ্রথা ভাঙছে, সামন্তপ্রথা জন্ম নিচ্ছে। তাঁর লেখায় এল শ্রেণীদ্বন্দ্ব। আপুলিয়াস তুলে ধরেছিলেন নষ্ট মূল্যবোধের ভয়াবহ কাহিনী। কিন্তু কাফকা? বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় ধ্বস্ত মানবিক মূল্যবোধ দেখালেন কাফকা। কাফকার 'দি মেটামরফোসিস'-এ চিত্রায়িত হয়েছে অসহায়, বিচ্ছিন্ন, লিবিডো তাড়িত বীভৎস ও নিষ্ঠুর বুর্জোয়া শ্রেণী। এখানে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। প্রলেতারিয় অবস্থান এই গল্পে না থাকলেও কিভাবে একটি বড় পরিবার প্রলেতারিয় অবস্থানে এসে পৌঁছয় তা দেখানো হয়েছে। গ্রেগরের নিজের অবস্থায় যখন আর ফিরবার লক্ষণ নেই, তখন গ্রেগরের পরিবার এক সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়। ঝি ও রাঁধুনিকে ছাড়াতে হয়। অভাবের তাড়নায় অলংকার বিক্রী হয়ে যায়। আর তখনই সমাজ সচেতন লেখক কাফকার কলম থেকে বের হয় 'দরিদ্রের জীবন অভাব-অনটনের মধ্যে কাটে। সকল বঞ্চনা ওরা মাথা পেতে সহ্য করে।' মাংস খাওয়া নিয়ে গ্রেগর ভাবছে, 'শুধু বড়লোকরাই মাংস খাবে, গরিবেরা মাংস খাবে না সমাজে এই শ্রেণীভাগ চলতে পারে না। কারণ মাংস খাওয়ার অধিকার সবারই আছে।'

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় কাফকাই প্রথম মানুষের পোকায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবেন নি। ডস্টোয়েভস্কি আগেই ভেবেছিলেন। তিনি তার লেখায় উল্লেখ করেন: 'Now I want to tell you gentleman whether you care to hear it or not, why I could not even become an insect, I tell you solemnly that I wanted to become an insect manytimes'. (Fyodor Dostoyevsky's 'Notes from underground'. P. 276)

মেটামরফোসিস গল্পের মানবিক সম্পর্ক □

ছোটবেলা থেকেই কাফকা বাবাকে পছন্দ করতেন না। ভয় করতেন। কাফকার কাছে কাফকার বাবা স্বেচ্ছাচারী, বড্ডবেশী পার্থিব এবং লিবিডো-তাড়িত, যদিও তিনি পরিবারের কর্তব্যে অবহেলা করেন নি। কঠোর পরিশ্রম করতে ভালবাসতেন। বাবার পার্থিব চিন্তাভাবনার বিপরীতে অবস্থান করতেন কাফকা। কাফকা আনন্দ খুঁজে পেতেন বই পড়ার মধ্যে, বন্ধু-বান্ধব এবং মুক্ত চিন্তাভাবনার মধ্যে। তিনি কোনদিন বাবার ব্যবসা এবং কারখানা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কাফকার বাবা এটা পছন্দ করতেন না। এবং এ জায়গাটাতেই উভয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করতো। পিতা সম্পর্কে কাফকা লিখছেন,

'তোমাকে আমার পিতা হিসাবে বড্ড কড়া লোক বলে মনে হয়। আর এটার মূল কারণ হল অল্প বয়সেই আমার ভাইদের মৃত্যু, আমার বোনদের পরে জন্মানো।' 'মেটামরফোসিস' গল্পে বাবাকে কাফকা নিজের বাবার মতোই অনেকাংশে চিত্রায়িত করেছেন। গ্রেগর কাজে যেতে পারছে না। বাবা গ্রেগরের কর্তব্যে অবহেলা সহ্য করতে পারলেন না। কাফকা লিখেছেন, "বাবা ছড়িটা তুলে নিলেন। মেঝেতে পা ঠুকতে লাগলেন। রাগে ফুলতে লাগলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে ছড়িটা দিয়ে জোরে গ্রেগরের পিঠে আঘাত করতে লাগলেন। গ্রেগর করুণ মিনতিতে ভেঙে পড়লো। কিন্তু তার নিবেদনে ফল হল না। বাবা তার মনোভাব ধরতে পারলেন না।' বাবা যেখানে ছেলের মনোভাব বুঝতে পারেন না সেখানে তাদের সম্পর্ক তৈরী হয় স্নেহহীন শ্রদ্ধাহীন যান্ত্রিকস্বভাবে। সেখানে সম্পর্কটা দাঁড়ায় কর্তব্য এবং আর্থ মনোভাবের উপর। এর কারণটা গ্রেগর সামসাই দেখিয়েছেন। যখন সবল সুস্থ অবস্থায় গ্রেগর উপার্জন করতো তখন গ্রেগর তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলে বাবা খুশী হতেন। বছরে কোনদিন পরিবারের আর সকলের সঙ্গে বাইরে বেরোতেন। শান্ত-সচল-সুস্থ বাবার কথা ভেবে গ্রেগর অবাক হতেন। কিন্তু যেদিন থেকে গ্রেগরের দৈহিক পরিবর্তন ঘটেছিল সেদিন থেকে এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, যে বাবা তাকে রীতিমতো শাস্তি দিতে চায়। কারণ এসময় গ্রেগর অর্থসর্বস্ব জগৎ থেকে পালিয়ে এসে পোকায় পরিণত হয়ে গেছে।

মা সম্পর্কে বাবার কাছে লেখা একটি চিঠিতে কাফকা উল্লেখ করছেন, 'তিনি তোমাকে দারুণভাবে ভালবাসতেন এবং তোমার প্রতি তার আসক্তি ও আনুগত্য ছিল…'। তবুও কাফকার মা কাফকার কাছে ছিল মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। তিনি স্বীকার করেছেন, "It was true that Mother was illimitably good to me…"। 'মেটামরফোসিস' গল্পে মা-র ছবিটি নিজের মা-এর কথা ভেবেই চিত্রায়িত করেছেন। গ্রেগরের মা সম্পর্কে কাফকা লিখছেন, "মা চিররুগ্ন। অথচ দু'হাতে সারাজীবন ধরে এ সংসারের যাবতীয় কাজ নীরবে করে আসছে। গ্রেগরের জন্য বাড়তি ঝঞ্ঝাট পোয়াতে তাই তার মোটেই কোন বিরক্তি নেই। বরং সন্তানের এই অসহায় অবস্থায় তাঁর স্নেহ যেন আর বাঁধ মানতে চাইছে না।" বাবার প্রতি মায়ের আকর্ষণে যৌন কাতরতার দিকটাও কাফকা দেখিয়েছেন। মনে হবে যেন ঐ যৌন ইচ্ছার জন্য মা এতো পারিবারিক অত্যাচার ও শোষণের মধ্যেও প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারছেনা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিকার যে মা, তার প্রতি কাফকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন নি। এ গল্পে কাফকা মা-এর স্বভাবকে রূপান্তরিত করেন নি। সবকিছু মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকেই তিনি এখানে দেখিয়েছেন।

বোনদের কাফকা ভালবাসতেন। কাফকার তিন বোন ছিল। তার মধ্যে

গুটলা নামে বোনটিকে খুবই ভালবাসতেন। আর সব বোনদেরকে স্বৈরাচারী নাজী বাহিনী হত্যা করেছিল। সেই ভালবাসা এই গল্পেও দেখতে পাই। রূপান্তরিত হওয়ার আগে ক্লান্ত গ্রেগর অফিস করে বাড়ি ফিরলে বোন গ্রীট বেহালা বাজিয়ে শোনাত। গ্রীট যখন ভাড়াটেদের বেহালা বাজিয়ে শোনাচ্ছিল তখন কীট গ্রেগর বোনের স্কার্ট ধরে টেনে বলতে চেয়েছিল যে ওরা বেহালা বোঝে না। সে এখনও গ্রীটের বেহালা শুনতে চায়। সে এখনও বোনকে ভালবাসে। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রেগরের চাকরী থেকে সরে আসার এবং কীটে রূপান্তরিত হওয়ার পর সতের বছরের গ্রীটের দৈহিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তন ঘটল। সে এখন সেলস্ গার্ল-এর চাকরী করে। আরও উন্নতির আশায় সন্ধ্যায় শর্টহ্যাণ্ড ও ফরাসী ভাষা শেখে। যতই গ্রীট বাঁচার তাগিদে নিজের জগতে চলে যাচ্ছে ততই সে ভাই-এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং ভাই-এর প্রতি বিরক্তি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। অবশেষে গ্রেগরের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় গ্রীট।

মালিকের সাথে গ্রেগরের সম্পর্ক বোঝাতে কাফকা বলেছেন যে গ্রেগরের অফিসের মালিক যেন ধনতান্ত্রিক সমাজে অবিবেচক দৈত্যের মতো। মালিকের কাছে সকল কর্মচারী scoundrel ছাড়া আর কিছু নয়।

এ ভাবে কাফকা দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কি ভাবে পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে রূপান্তরিত করে দেয়।

মেটামরফোসিসের কাফকা □

এক) কাফকা সামাজিক সমস্যা নিয়ে গল্প লিখেছেন। তিনি সমাজ সচেতন লেখক। বস্তুবাদী চিন্তাভাবনাকে তিনি এড়িয়ে যান নি। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কুফলকে তিনি তুলে ধরেছেন। শোষিত এক বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এই সমাজব্যবস্থা কীটে পরিণত করে রেখেছে যারা কোনদিন প্রতিবাদ করতে পারে না। কাফকা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন।

দুই) কাফকার ছোটগল্পে ধর্ম বা যৌনতা প্রধান হয়ে ওঠেনি। তবে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যে মানুষকে বিচ্ছিন্ন ও বিষণ্ণ করে তোলে তা তিনি দেখিয়েছেন।

তিন) যেহেতু কাফকার চিন্তা ভাবনায় স্ববিরোধিতা উপস্থিত সেহেতু তিনি একজন বিতর্কিত লেখক, কখনই দায়বদ্ধ লেখক নন্। ছোটগল্পের জগতের বাইরে তিনি যখন চিন্তা-ভাবনা করতেন তখন সেসব চিন্তাভাবনা স্ববিরোধী হয়ে ওঠে। যেমন, "It is not necessary that you leave the house. Remain at your table and listen. Do not even listen, only wait. Do not even wait, be wholly still and alone. The world will present itself to you for its unmasking, it can do

no other, in ecstasy it will writhe at your feet. ঘরে বসে থাকলে চিন্তা-ভাবনা কখনও গতিশীল হতে পারে না। আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, কাফকা বলছেন "A man has free will, and this of three kinds: First of all he was free when he willed this life; …… Secondly he is free in that he can choose the mode and the route of his progress through his life: Thirdly he is free in that, as the person he is one day to become again, he has the will to go through life under all conditions and thus to find his way to himself ……এরপর তিনি আবার স্বীকার করছেন, Such are the three aspects of free will, but since they are present at the same time they form unity, and at bottom such a complete unity that no room is left for any will, either free or unfree. (The collected Aphorisms থেকে গৃহীত)। কিন্তু মেটামরফোসিস-এর নায়ক গ্রেগর স্বাধীনভাবে জীবনকে চালাতে পারেনি যদিও তার জীবনে unity ছিল না। এখানেই কাফকা সত্য যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা মানুষকে না দিতে পারছে unity, না দিতে পারছে complete freedom.

চার) পুঁজিবাদী সমাজে শিল্পপতিরা মুনাফা বোঝে। যতদিন না যন্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে ততদিন শিল্পপতিরা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করে, মানুষ হিসেবে নয়। কাফকা এই সত্যটা বুঝতে পেরে লিখছেন, The degrading and inhuman aspects of his job are clearly defined by Gregor, 'O God', he thought, what an exhausting job I've picked on !"

পাঁচ) মেটামরফোসিস সম্পর্কে দুজন সমালোচকের মন্তব্য।

ক) In the wake of rapid urban development another 'enemy of the spirit' was quickly identified: materialism—though many preferred to call it capitalism.

খ) Since critics have paid little attention to the social implications of Kafka's work. I shall select this particular story for the purpose of commenting on Kafka's devasting critique of modern social and economic systems

ছয়) মেটামরফোসিস প্রসঙ্গে কাফকা।

I am now reading 'The Metamorphosis' at home and find it bad. I would gladly write fairy tales that could please her

excitement sometimes or really, all of time—when she hears stories. হতাশা থেকে এসেছে এই মন্তব্য।

'দি মেটামরফোসিস' গল্পটি লেখার জন্য কাফকাকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারমধ্যে এক মহিলাও ছিলেন। সেজন্য তিনি নিজের গল্প সম্পর্কে দুঃখের সাথে মন্তব্য করেন 'Great antipathy to Metamorphosis. তিনি আরও বলেন "Imperfect almost to its very marrow", 'Unreasonable ending.' অথচ ছোটগল্পটির শেষ ইতিবাচকতায় গিয়ে পৌঁছেছে।' যথা—গ্রেগর মারা গেছে। সাথে সাথে শহরের অভিজাত পল্লীর সাথে সকল সম্পর্ক শেষ। গ্রেগরের মা-বাবা-বোন সবাই শহরের বাইরে চলে যাচ্ছে ট্রাম এ চেপে। আগামী দিনের দিন-চালাবার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মা বাবার নজরে আসে যে মেয়ে বিবাহ-যোগ্য হয়ে উঠেছে। আরও একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে। তখন কাফকা গল্প শেষ করছেন, "And it was like a confirmation of their new dreams and excellent intentions that at the end of their journey their daughter sprang to her feet first and stretched her young body." কাফকা তাঁর প্রিয় নারী ফেলিসকে লিখছেন 'I am just sitting down to yesterday story with an overwhelming desire to pour myself into it which obviously spring from despair.

কাফকার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর □

'মেটামরফোসিস' ছোটগল্পে কাফকার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। তবে মালিকশ্রেণীর প্রতি গ্রেগরের রাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ চাপা থাকে নি। এমন কি মালিকশ্রেণীর প্রতি ঘৃণাবোধের ইংগিতটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সময়টা ছিল ইরান, মেক্সিকো এবং রুশ বিপ্লবের। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম পশ্চিম ইউরোপের বহুদেশে শ্রমিক আন্দোলনে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। সে সময় সমগ্র ইউরোপে ধর্মঘটী আন্দোলনের নতুন জোয়ার এসেছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রমিকদের বিক্ষোভ অত্যন্ত জোরদার হয়েছিল। তারা অবরোধ নির্মাণ করে পুলিশ ও সেনাদলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এসবের প্রভাব অবশ্য কাফকার লেখায় নেই।

যৌনতা, ধর্ম, রাজনীতি কাফকার ছোটগল্পকে গ্রাস করতে পারে নি। তিনি সমাজকে দেখেছেন, চিড়েছেন। রাজনৈতিক পরিবেশের বাইরে থেকে তিনি 'মেটামরফোসিস' লিখলেও অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভাব এসে যায়। মূলত এই গল্প জন্ম নিয়েছে হতাশা থেকে যা কাফকা নিজেই স্বীকার করেছেন। এই গল্পে প্রতিবাদ নেই কিন্তু প্রতিবাদী পরিবেশ গড়ে তুলেছেন আগামী প্রজন্মের

জন্য। প্রতিবাদ এসেছে কাফকার অন্যান্য গল্পে। 'না আমি আপনাদের এসব নিয়মনীতির কিছুই সমর্থন করি না।' In the Penal Settlement গল্পের প্রধান চরিত্র Explorer ভয়ঙ্কর মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়: সেই গল্পেই আছে, যখন ক্যাপ্টেন ঘোড়ার চাবুক তুলে ক্রীতদাসকে মারতে গেলেন, তখন ক্রীতদাস ক্যাপ্টেনের পাদুটো সাপটে ধরে ঝাকুনি দিয়ে চীৎকার করে বললে, 'চাবুক ছুড়ে ফেলুন। নয়তো আপনাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাব।'

'জাজমেণ্ট' গল্পের প্রধান চরিত্র জর্জ বাবাকে বলছেন তার এক বন্ধু সম্পর্কে 'ভেবে দেখুন বাবা, একবার সে আপনাকে রুশবিপ্লব সম্পর্কে নানা অবিশ্বাস্য গল্প বলেছেন।' ঐ গল্পে রুশবিপ্লবের উল্লেখ আরও পাওয়া যায়। যেমন কাফকা বলেছেন যে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই আশঙ্কাজনক। জর্জের বন্ধুটি জার্মানে অনেক কাজকর্মের চেষ্টা করেছে। সুবিধা করতে না পেরে রাশিয়ায় চলে যায় ভাগ্য ফেরাবার জন্য। সেখানে একটা ছোটখাটো ব্যবসা করে। থাকে সেণ্ট পিটার্সবার্গে। ভাগ্যের সন্ধানে সেসময় অনেকেই রাশিয়া চলে গিয়েছিল। কারণ ভাগ্যহীনরা বুঝতে পেরেছিল রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার আমূল এক পরিবর্তন আসছে। ক্রান্তদর্শী কাফকা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন।

সার্ত্রের গল্প : স্বাধীনতা

মনোজ চাকলাদার

"The five stories that wake up the volume have become classics······ Intimacy is probably the most successful and the most entertaining interior monologue in French literature······ Sartre's mastery of the language is extraordinary."—সার্ত্রে সম্পর্কে অধ্যাপক হেনরি পিয়ার (Prof. Henri Peyre) সঠিক মন্তব্য করেছেন বলে আমার ধারণা। সার্ত্রে মাত্র পাঁচটি গল্প লিখেছেন, এর ভেতর দিয়ে তাঁর জগৎ বিশ্বাস এবং দর্শন সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত।

'ইন্টিমেসি' গল্পের শুরু "Lulu slept naked because she liked to feel the sheets caressing her body and also because laundry was expensive" এবং শেষ "She (রিরেৎ, লুলুর বান্ধবী) dropped Pierre's hand ; without knowing why she felt flooded with bitter regret."

দীর্ঘ এ গল্পের ভেতর দিয়ে লুলুর ভালবাসা ও জীবন সম্পর্কে স্বাধীনতার যে বোধ তারই গভীর চেতনা সমগ্র গল্প জুড়ে রয়েছে। লুলু কাকে ভালবাসবে, হেনরিকে না পিয়ারকে। কাকে সে স্বাধীনভাবে নিজের মত করে নির্বাচন করবে। ভালবাসার অর্থও হল নিজের সমগ্র বোধ অপরের ওপর চাপানো। অপরের স্বাধীনবোধকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করা। লুলু জানে জীবনে বেশ কিছু বন্ধন রয়েছে ; যার সঙ্গে সে থাকবে তারও কিছু রুচি, ইচ্ছে, শিক্ষা অশিক্ষা রয়েছে। ফলে তার স্বাধীনতাকে সম্মানও দিতে চায়। সে কাকে ভালবাসবে মানবতাকে না দেহমনকে. এ দুটি সীমানায় তার যাতায়াত। সে কি প্ল্যাটোনিক ভালবাসাকে গ্রহণ করবে না দেহসর্বস্ব ভালবাসাকে গ্রহণ করবে। এ দ্বন্দ্ব। হেনরিকে সে বিয়ে করেছে কারণ হেনরি দেখতে যাজকের মত। ওকে দেখতে পবিত্র, থলথলে গোলগাল। আবার তার অসুখের কারণ, হেনরি পূর্ণাঙ্গ নয়, সে যৌন অক্ষম। সারা রাত হেনরির পাশে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকে, তার স্বামী পাশে ঘুমিয়ে থাকে শিশুর মত। লুলুর রাগ বিরক্তি আসে তবু সে হেনরিকে করুণার চোখে দেখে। বুকে ব্যথা জেগে ওঠে। ছুটে যেতে চায় পিয়েরের কাছে। ওর বান্ধবী রিরেৎ চায় লুলু হেনরিকে ছেড়ে চলে আসুক। কিন্তু কোন অজুহাত পায় না, অবশেষে পেয়ে যায় অজুহাত। হেনরি লুলুর ভাই রবার্টকে মেরেছে, ছোটবেলা থেকে রবার্টকে সে খুবই ভালবাসে। ওর এত বড় সাহস! চলে আসে রিরেতের কাছে। রিরেৎ ওকে নিয়ে যায় পিয়েরের কাছে।

যাবার সময় ইচ্ছে করেই হেনরির পাশ দিয়ে যায়। হেনরি বাধা দেয়। কিন্তু রিবেৎ জোর করেই লুলুকে ট্যাক্সিতে তুলে নেয়। পিয়েরের সঙ্গে হোটেলে লুলু উদ্দাম সঙ্গমে লিপ্ত হয়। কিন্তু পিয়েরকে সে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে না। তার অনুপস্থিতিতেই চিঠি লিখে জানিয়ে আসে, হেনরিকে সে ভালবাসে। হেনরিও ওকে ভালবাসে। ওকে না পেলে হেনরি আত্মহত্যা করবে। তাই ও অপরিহার্য। তবে সে পিয়েরকেও ভালবাসে। সে তার সঙ্গে সন্ধে ৫টায় দেখা করবে।

লুলুর কাছে জীবন কখনো শান্ত কখনো উদ্দাম। শুধুমাত্র শান্ত বা উদ্দামই জীবন নয়। যে কারণে তার কাছে দ্বিচারণই জীবন ও স্বাধীনতা। সে মনে করে মানুষকে ভালবাসবে শুধু যৌন অঙ্গের জন্য নয়, বা মনই নয় তাকে ভালবাসতে হবে তার সমগ্র দেহমন শরীরকে। তার হাত পা পাকস্থলী কিডনিকেও। দেহের প্রতিটি কোষই যৌথভাবে আয়োজন করে শরীরী সুখ ও শরীরী মন। একে সে মনে করে অন্তরঙ্গতা, একে সে মনে করে ভালবাসা, একে সে মনে করে স্বাধীনতা এবং নির্বাচন করবার স্বাধীনতা।

সাত্রে এ গল্পের বুনোট রেখেছেন যৌনতার ভেতর ডুব দিতে দিতে কিভাবে নায়িকা লুলু আবিষ্কার করেছে তার বোধ ও দ্বিচারিণী হওয়ার যুক্তিজাল। জীবনটা শুধুমাত্র বেডশিট দিয়ে ঢেকে রাখার জন্য নয়, তাকে খুলেও দেখাতে হবে তার প্রকৃত মনটিকে, লুলুর ভেতর কিভাবে রোমান্টিক মানবসত্তা এবং বাস্তবসত্তা কাজ করছে তারই এক উজ্জ্বল আলেখ্য। এই দুই সত্তা নিয়েই মানব জীবন এর একটিকে দমিত করলে হয়ে ওঠে বন্দী জীবন। লুলুর এই স্বৈরিণী তত্ত্ব আমাদের ভাবায় বৈকি!

'ইন্টিমেসি' গল্পে লুলু দ্বিচারিণীর তত্ত্বর সামনে নিজেকে এনে হাজির করে, অপরদিকে 'দ্য রুম' গল্পে নায়িকা ইভ কিভাবে তার স্বামী পিয়েরের জগতে থাকতে চায় অথচ সে জগতে পিয়ের নেয় না, অর্থাৎ পিয়েরের জগতে কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তো একাত্ম হবার কোন প্রশ্ন নেই। এই দুটি গল্পে কিভাবে লুলু ও ইভ মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে হেনরি ও পিয়েরকে বেছে নিচ্ছে তারই আলেখ্য। তাদের এই স্বাধীন নির্বাচনে মাতৃত্ব সত্তারই প্রকাশ বেশি। উভয়েই তাদের স্বামীদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে যেতে পারে না। প্রেম ভালবাসা, শরীরী মন অপেক্ষা মাতৃত্ব মনটি যেন এখানে বেশি নায়িকাদের অসহায় করে তোলে। তারা অস্বাভাবিক জগতের ভেতর প্রবেশ করে।

'দ্য রুম' গল্পে দুটি পরিচ্ছেদে দুটি স্তরে গল্পটি নির্মাণ করেছেন লেখক। প্রথম পরিচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে ডরবেদৎ দম্পতি কিভাবে সংকটে পড়েছে, তাদের আদরের মেয়ে, যাকে অতি স্নেহে লালন করেছে সেই ইভ এমন একজনকে স্বামী

হিসেবে নির্বাচন করেছে যে উন্মাদ। এবং ডাক্তার বলেছে বছরখানেক পরে সে জড়পদার্থে পরিণত হবে। এই দম্পতি তাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। M. Darbadet তার মেয়েকে বোঝাতে এসেছে। এভাবে তার মাকে ও তাকে যেন কষ্ট না দেয়, তার নিজেরও ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না করে। তার বয়স কম। শেষ কথাটি বলেও তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে না। সে শুধু উপলব্ধি করে, I resent her living outside the limits of human nature. Pierre is no longer a human being ; in all the care and all the love she gives him she deprives human beings of a little, we don't have the right to refuse ourselves to the world ; no matter what, we live in society."

ভরবেদৎও যেন তার সেই ছোট্ট মেয়েটিকে নিজের ভেতর লালন করে রাখে। রাস্তায় বহু পথচারী দেখে, তার ভেতর ছোট্টমেয়েকে দেখে। সঙ্গে রয়েছে তার মা। ওরা দাঁড়ায়, একটু নিচু হয়ে মেয়েটিকে স্পর্শ করে ও মৃদু হাসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জুড়ে রয়েছে ইভ ও তার স্বামী পিয়েরের জগৎ। ইভের বাবা চলে গেছে। তাকে ফিরিয়েই দিয়েছে ইভ। এক ধরনের অহংকার তার ভেতর গড়ে উঠলেও হঠাৎ ভাবে, তার কোথাও কোন জায়গা নেই। তার চিন্তায় গাঢ় হয়ে ওঠে "Normal people think I belong with them. But I couldn't stay on hour among them. I need to live out there, on the other side of the wall, But they don't want me out there."

পিয়ের তার এক কল্পনার জগৎ নিয়ে থাকে। সে ইভকে চেনে না। তাকে ডাকে 'আগাথা' বলে। তার কল্পনায় থাকে অসংলগ্ন কথা। সে কোন এক ভেনিশ নাবিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। অদ্ভুতভাবে রয়েছে এক অপরাধ-বোধ ইভ ভাবে, I would like to be invisible and stay here seeing him without his seeing me. He does not need me I am useless in this room পিয়েরের কথা-বার্তায় ও কল্পনায় এত অসংলগ্নতা যে ইভকে পীড়িতও করে। ভাবে, Sometimes I think I'm going mad. But no, she thought, I can't go mad. I get nervous, that's all সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে পিয়েরের সম্পর্কে ইভের বেদনা ও তার নিজের সম্পর্কে আতংক। মাঝে মাঝে ইভ তাকে ঘৃণাও করে। বিশেষ করে ভেনিশ নাবিকদের কথা যখন বলে। ভাবে, He's lying, he doesn't believe a word of what he says. He knows my name isn't Agatha. I hate him when he lies. পিয়েরের কল্পনা জুড়ে নাও

পাওলো, নিগ্রো রমণী, ভাটিখানা। এসব ইভকে পীড়িত করে। তাকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে।

পিয়ের ঘুমোয়। ইভ পাশে, ঘুমোয় না। তার চিন্তা জুড়ে 'Recapitulation'—। হঠাৎ জেগে ওঠে পিয়ের। তার চোখ মুখ সাদাটে, গাল ঝুলে পড়েছে। চোখ বড়, মুখ খোলা। যেন সে সব পরিচিত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। ভয় পেয়ে যায় ইভ। সে জানে ডাক্তার বলেছে এক বছরের আগে জড়-ভরত হবে না। সব স্মৃতি চলে যাচ্ছে পিয়েরের। ইভ তার বাবাকে বলেছিল, এ দৃশ্য দেখার আগেই হত্যা করবে। পিয়ের ক্রমশ ইভের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইভ ভাবে পিয়েরের যে সব লক্ষণগুলো ফুটে উঠছে তা কি পূর্বলক্ষণ।

এ গল্পের ভেতরেও রয়েছে সার্ত্রের গল্প বুননের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলমালা। প্রতিটি ভাবনার ওপর গড়ে উঠছে সিদ্ধান্ত। ভাবনা ব্যবহার বা মাঝে মাঝে মনোজগৎ উন্মোচন সফলভাবেই গল্পটির ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে দিয়ে এক গভীর মাত্রা এনে দিয়েছে। স্বামীর জীবনের ভয়াবহ পরিণতি জেনেও ইভ যে ফিরে আসতে পারছে না, তার জীবনের চরম দুঃখ বঞ্চনা তাকে বিক্ষত করবে জেনেও সে তার স্বাধীন ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আবার এও বলা বোধহয় ঠিক হবে না এ তার স্বাধীন নির্বাচনের কারণে। আমার মনে হয়েছে, এ হল বিবেকবান মানুষের নিয়তি, যে নিয়তি সৎপথের দিকে ধাবিত হয় সব আত্মবিসর্জন দিয়েই। স্বাধীনতার সৎ অর্থই তাই বলে মনে হয়। এই 'ঘর' থেকে বেরিয়ে আসা যায় না বা আরো ব্যাপকভাবে বলা যায় এই স্বাধীনতার প্রাকাম্যবোধ থেকেই মানুষ আসতে চায় না।

'ইন্টিমেসি' ও 'দ্য রুম' গল্পটি নায়িকা প্রধান এবং অপরদিকে বাকি তিনটি গল্প সম্পূর্ণভাবে নায়ক প্রধান। তাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার সংকট নিয়ে গল্পগুলোকে বুনেছেন সার্ত্রে।

'দ্য ওয়াল' গল্প অন্য গল্পগুলোর থেকে স্বতন্ত্র। এখানে যৌনতার প্রশ্নটিকে বা যৌন আচরণকে সংকট বলে মনে হয়নি। এ কারণে যৌন অনুভূতিগুলো আসেনি এই গল্পটিতে বাকি চারটি গল্পে যে ভাবে এসেছে। অবশ্য 'দ্য রুম' গল্পে ততটা তীব্রভাবে প্রকট নয়। 'দ্য ওয়াল' গল্পে রয়েছে আত্মপ্রত্যয়ের সংকট। কয়েকজন স্বাধীনতা যোদ্ধা বা বিপ্লবীকে ধরে আনা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তাদের নেতার নামটি এবং সে কোথায় রয়েছে জানতে চাওয়া হচ্ছে। তারা অত্যাচারের সামনে ভেঙে পড়বে কিনা, এমন কি তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে। এই মৃত্যুর কাছে সব কিছুই অর্থহীন। তবু তাদের আত্মপ্রত্যয়কে বেছে নেয়। তারা স্বাধীনতাকেই বেছে নেয়।

এ গল্পটি সম্ভবত সার্ত্রকে দারুণভাবে আলোড়িত করে, এ গল্পটিকেই পরবর্তী কালে যেন Man without shadows নাটকে রূপান্তরিত করেন।

গল্পটি বলা হয়েছে নায়ক পাবলো ইবিয়েতার দৃষ্টিকোণ থেকে। সে বিভিন্ন জেলে ছিল, তাকে ঘোরানো হচ্ছে বিভিন্ন জেলে।

নায়ক যখন বলছে—I said to myself, "I want to die cleanly'—আমরা নায়কের নির্বাচন জেনে যাই।

জুয়ান মিরবল সবচেয়ে কম বয়সী, প্যান্টে পেচ্ছাপও করে ফেলে ভয়ে। সে মৃত্যুর ভয়ে বারবার আতংকিত। বলে, 'আমি মরতে চাই না, আমি মরতে চাই না।' টম যে শুধু নিজেকে নিয়ে আত্মমগ্ন থাকতে চায়, সেও মৃত্যু ভয়ে ভীত। জুয়ানের আর্তনাদে এ ভয় তাকে আরো বেশি অস্থির করে তোলে। কিন্তু পাবলো শুধুমাত্র নিজেকে প্রত্যয়স্থিত করে। তাকে যখন জিজ্ঞেস করে, র‍্যামন গ্রিস কোথায়? সে উত্তর দেয়—আমি জানি না। সকলকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে শুধুমাত্র রাখা হয়। একক ও নিঃসঙ্গ করে তাকে রাখা হয় এবং বলা হয় সে যদি নাম বলে তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাকে বলা হয়, "It's his life against yours. You can have yours if you tell us where he is" এবং তাঁকে পনের মিনিট সময় দেওয়া হয়। নায়ক ভাবে তারা বড় ভুল করছে। যদিও সে জানে গ্রিস কোথায়। কিন্তু গোপন জায়গাটি সে বলবে না। যদিও গ্রিসকে সে পছন্দ করে না। এটাই সে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। যদিও সে ভাবে—My friendship for him had died a little while before dawn at the same time as my love for Concha, at the same time as my desire to love.—ভাবছে আমার চেয়ে তার জীবন আমার কাছে বড় নয়, মূল্যও বেশি নয়। আর ওরা যদি দেয়ালে ঠেকিয়ে গুলি করে মারে তবে, আমি বা গ্রিস বা অন্য কেউ—যেই হোক না কেন, কোন তফাৎ নেই।—যদিও স্পেনের জন্য গ্রিসের তার তুলনায় প্রয়োজন বেশি। তবু তার কাছে গুরুত্ব নেই। মৃত্যুর সামনে কোন কিছুরই গুরুত্ব থাকে না।

তাকে নিয়ে অফিসাররা যেমন হেলাফেলা করছে সেও তাদের নিয়ে মজা করতে চায়। সে জানে তাকে নিয়ে তারা কি করবে। সে মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে চায়। সে ঠাট্টা করে বলে। আমি জানি সে কোথায়। সে কবরে লুকিয়ে আছে,—ভল্টে বা কবরখনকের কুটিরে।

বাস্তবে দেখা গেল সত্যসত্যই তার বলা গাঁজাখুরি জায়গা থেকে র‍্যামন গ্রিস ও আরো দশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নায়ক চমকে ওঠে। এবং গল্পটি শেষ হয়েছে—"Everything began to spin and I found myself sitting on the ground: I laughed so hard I cried."

'ইরসট্র্যাটাস' (Erostratus) গল্পের নায়ক পল হিলবার্ট তার অফিসের

সহকর্মীদের সঙ্গে লিনদবার্গ প্রসঙ্গে আলোচনায় জানায়—"আমি কিন্তু কালো বীরপুরুষদের বেশি পছন্দ করি।"—এক্ষেত্রে কালো নিগ্রোদের নয়। কালো মানে যারা দুষ্ট ইন্দ্রজালে পটু, বীর। লিনদবার্গ তার বিচারে একজন সৎ বীরপুরুষ। সুতরাং তাকে আকর্ষণ করে না। লমারসিয়ে যখন উত্তর দেয়, এ তো অরাজকতার সমর্থক। শান্তভাবে উত্তর দেয় পল, অরাজকতার সমর্থকরা নিজেদের মতন মানুষকে ভালবাসে।

তুলনায় শিক্ষিত মাসে বলে, "আমি জানি তোমার চরিত্র। তার নাম ইরসট্র্যাটাস। সে বিখ্যাত হতে চায়, আর অফেসাসের সেই মন্দিরকে পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তার চোখে আর কিছুই ভাল লাগে না, অথচ এই মন্দিরই পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি।" মন্দিরটির নির্মানকারীর নাম কেউ বিশেষ মনে রাখে না অথচ ধ্বংসকারীর নাম সবাই জানে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে ইরসট্র্যাটাসে কোন খারাপ ইঙ্গিত দিয়ে যায়নি। দুশো বছরের পরেও তার নামটি উজ্জ্বল।

গল্পের নায়ক হিলবার্ট সাততলা থেকে মানুষদের দেখে পিঁপড়ের মত কিন্তু যখন সে নিচে নেমে পাশাপাশি চলে তখন মনে হয় বড় বিচিত্র, তার তাদের পাশে হাঁটতে ইচ্ছে করে না। চলতে চলতে একদিন দেখে কয়েকজন মিলে একজন মানুষকে খুন করে। প্রথমে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। কিন্তু তবু নায়কের পা ঘাড় কেমন হালকা লাগে, সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যারা মানুষটিকে খুন করে তারা ওষুধের দোকানে এনে চোখেমুখে জল দেয়, মদ দেয়। মারধোরও করে। অসহায়ভাবে তাদের হাতে মারও খায়। সে এদের শত্রু ভাবে। অবশ্য সে এটা প্রকাশ করে না। এরপর থেকে নিজের আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল রাখতে শুরু করে। এরপরের আচরণধারা বেশ অদ্ভুত, একজন মানসিক রোগীর মত। সে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। একদিন একটি বেশ্যাকে নিয়ে যায় হোটেলে। সহবাস না করে তাকে নগ্ন অবস্থায় বন্ধ ঘরে হাঁটতে বাধ্য করে। সে ছয়জনকে খুন করে নিজেকে খুন করতে চায়। এর আগে তার বিচিত্র জীবনধারার সপক্ষে দীর্ঘপত্র লিখে ১০২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চিঠি লিখে তাদের কাছে পাঠাবে ঠিক করে। অবশেষে একজন লম্বা লোককে খুন করে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। জনতা তাকে দরজা খুলতে বলে। সে জানে জনতা তাকে কি করবে। পিস্তলে একটি গুলি রয়েছে। আত্মহত্যা করবে না ধরা দেবে। দরজা খুলে জনতার কাছে ধরা দেয়।

এ গল্পের নায়কের রয়েছে অসহায়ত্ব, বিষাদ। এক পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থার অবক্ষয় সমাজের শিকার সে। রয়েছে অদ্ভুত শূন্যতায়, এক অর্থহীনতায়। সমাজে তার অস্তিত্ব যেমন নেই, নিজের অস্তিত্বও নিজের স্বাধীনতায়

কারণে আরেক পরাধীনতার জালে সে জড়িয়ে পড়ে। এ চরিত্র প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে গিয়ে হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্ন।

আপাতভাবে মনে হতে পারে নায়ক যা কিছু ঘটাচ্ছে অকারণ কিন্তু নায়কেরই বা নিরাপত্তা কোথায়, কারাই বা দায়ী। পল হিলবার্টের স্বাধীন হয়ে ওঠার এক পদ্ধতি বা তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, সে অপরের স্বাধীনতাকে বিঘ্ন করে। কিন্তু সেও মানবিকতাপূর্ণ এক মানুষ। পল হিলবার্ট তার চিঠির বয়ানে যখন লেখে, "আপনাকে বলে রাখি : মানুষকে ভালবাসাই দরকার তা না হলে তারাও পাশ কাটিয়ে চলাটাকে সঠিক ভাবে।" আমরা পল হিলবার্টের জন্য কষ্ট পাই কিন্তু তার অস্তিত্বের পথ খুঁজে দিতে পারি না।

'ইন্টিমেসি' গল্প সঙ্কলনে সবচেয়ে দীর্ঘ গল্প (৬৬ পাতা) "দ্য চাইল্ডহুড অব এ লিডর"। এ গল্পের ভেতর দিয়ে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের এক অন্তঃসারশূন্য সমাজমন ফুটে ওঠে। এই সমাজমনের ভেতর একটি শিশু বিশেষ এক উপলব্ধি ও অস্তিত্ব আবিষ্কার করে এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তারই এক ইতিবৃত্ত। প্রায় জন্ম থেকে যৌবন পর্যন্ত এর পরিধি। এখানে সার্ত্রে তার সত্তা ও শূন্যতা (Being and nothingness) প্রকাশ করেছেন। সার্ত্রে নিজেও বিশ্বাস করতেন সাহিত্য ও শিল্পের ভেতর দিয়ে একজন লেখক ও শিল্পী তার দর্শন বা প্রতিবাদ যদি প্রকাশ না করতে পারে তবে সে শিল্পের কোন অর্থ নেই। গল্পটিও বলা হয়েছে লেখকের সত্তাবোধ থেকে। আবার একথা মনে রাখতে হবে গল্পটি চলেছে নিজের স্রোতধারাতে। নায়ক লুসিয়েন শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত যে ভ্রমণ করেছে সেই পথে এসেছে অজস্র চরিত্রের ঢেউ। এই ঢেউগুলাই তাকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে তার অস্তিত্ব কোথায় বা তার অধিকার কি। নায়ক নিজের অস্তিত্ব বা নেতৃত্বের মানসিকতা খুঁজে পেয়েছে। তবে এই অস্তিত্ব কি সদর্থক না নঞর্থক। এ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে।

চরিত্রটি ইরসট্র্যাটাসের নায়ক পল হিলবার্ট বা দ্য ওয়াল গল্পের নায়ক পাবলো ইবিয়েতার মত সদর্থক হয়ে ওঠেনি। আবার নঞর্থক নয় এ কারণে যেসব চরিত্রের ভেতর দিয়ে লুসিয়েন শিখেছে তাদের কাউকে আমাদের আকর্ষনীয় চরিত্র মনে হয়নি। বরং অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছে। চরিত্রগুলো ভঙ্গুর ও পলকা। বলা যেতে পারে এও এক ধরণের সমালোচনা। অর্থাৎ সমাজমনের সমালোচনা। যে সমাজ থেকে একটি বুর্জোয়া চরিত্র নঞর্থক দিকে যায়। গল্পের শেষে নায়ক নেতা হয়ে উঠেছে। কাফে থেকে বেরিয়ে স্টেশনারী দোকানের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে চায় যে সে কতটা রূঢ় ও কঠিন হয়েছে। কিন্তু সে দেখে—But the mirror only reflected

a pretty, headstrong little face that was not yet terrible. "I'll grow a moustache." he decided.

গল্পের শুরুতে দেখা যায় শিশু লুসিয়েনের রূপ, নরম শরীর ও পোশাকে সকলে তাকে মেয়ে মনে করে আদর করে। তাকে কেউ ছেলে ভাবছে না। সে সেই ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বলে, আমার নাম লুসিয়েন। কিন্তু কেউ যে এতে গুরুত্ব দিল মনে হল না। এভাবে বাবা মা তাদের আত্মীয়জন বা মায়ের বান্ধবী প্রমুখদের কাছে নিজেকে ঠিক অস্তিত্বপূর্ণ সত্তা বলে জাহির করতে পারে না। এই সংকট গল্পটির শেষ লাইন পর্যন্ত। শেষ লাইনটি পড়েই আমরা বুঝতে পারি তার অধিকারবোধ তার নেতৃত্ববোধ ও সমাজে নিজের অস্তিত্ববোধ একটি চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা প্রয়োজন। এ কারণে ঠিক করে,—'I'll grow a moustache'।

'I don't like ancillary love'—লুসিয়েন বলে। ছোটবেলা থেকে কোন আবেগ তাড়িত ভালবাসা তার পছন্দ নয়। সে কখনো অপরের কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারে না বা চায় না। কাউকে সে ভালোবাসতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি আস্থাও নেই শৈশব থেকে। তার সবকিছু জানে ঈশ্বর যেহেতু ঈশ্বর সবকিছু জানে বলে। সে ঈশ্বরকে ঘৃণা করে এ কারণে যে লুসিয়েন নিজেকে যতটা না জানে তারচেয়ে বেশি জানে ঈশ্বর। সে তার বাবা মাকে ভালবাসে না, ভান করে সে সব সময়ে ভাল ছেলে। সৌভাগ্য, যেহেতু এ বিশ্বে বহু বালক রয়েছে তাই ঈশ্বর সবকিছু স্মরণ রাখতে পারে না।

সে কোথাও তার অস্তিত্ব টের পায় না। সে যে লুসিয়েন, তার যে একটা অস্তিত্ব আছে, বা তাকে কেউ গুরুত্ব দেবে সেরকম বিশেষ পরিচয়ও নেই। সে ভাবে,—"Existence is an illusion because I know I don't exist, all I have to do is plug my ears and not think about anything and I'll become nothingness."

তার বাবা শেখায় কিভাবে শ্রমিকদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হয়। বন্ধুরা তাকে অবজ্ঞা করে, সে পুরনো সংস্কার দূর করতে পারে না। যেহেতু সে অভিজাত, ধনী ও বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান একথা সে ভুলতে পারে না। তার নিজস্ব বোধ রয়েছে, ব্যক্তিগত নির্বাচন রয়েছে তা কোথাও স্বীকৃত নয়। এসব প্রমাণ করার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে হাসিস খায়, বেশ্যাবাড়ি যায়, সমকামে লিপ্ত হয়। কিন্তু সে কারো সঙ্গেই প্রকৃত অর্থে যুক্ত হতে পারে না।—"Lucien was alone, without a shadow and without echo, in the midst of this too discreet nature which meant nothing."

লুসিয়েন ভাবে, "he was not a jellyfish, he did not belong to that humiliated race, he told himself, 'I am diver'."

লুসিয়েন একজন ব্যক্তি, একজন অধিকার সচেতন দলনেতা তা বুঝতে পারে একটি কাফেতে বসে। সে তার এক বন্ধুর নিয়ে আসা প্রতিবাদ পত্রে সাক্ষর করে। সেটি ছিল ইহুদি বিরোধী অভিযান। ক্রমশঃ সে ইহুদি বিরোধী হয়ে ওঠে। বন্ধুদের সঙ্গে একজন ইহুদিকে একা পেয়ে মারধোরও করে। সেই প্রধান ভূমিকা নেয়। তার বন্ধুর বাড়িতে ওয়েইল নামে একজন ইহুদি নিমন্ত্রিত। সেও নিমন্ত্রিত হয়। তার আত্মসম্মানে বাধে। তার বন্ধুদের বলে, জানে আমি ইহুদিদের সহ্য করতে পারি না—। সে পার্টি বয়কট করে চলে আসে। এইভাবে সে নিজেকে চিহ্নিত করে। প্রত্যেকের একটা চিহ্ন থাকা দরকার। 'সে ধীরে সতর্কভাবে, তার হাতটা কপালের দিকে তোলে, জলন্ত মোমবাতির মত, তারপর সে দাঁড়িয়ে ভাবনায় ভাবিত হয়ে পবিত্রভাবে নিজের ভেতর কিছু শব্দ আসা অনুভব করে, I HAVE RIGHTS!' অধিকার! যেন কিছু ত্রিভুজের মত ও বৃত্তের মত: এ এত নির্ভুল যে এর অস্তিত্ব নেই, তুমি হাজার হাজার বৃত্ত কম্পাস দিয়ে আঁকতে পার কিন্তু একটি বৃত্তও তৈরি করতে পার না।' অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থাই লুসিয়েনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেখান থেকেই অধিকার বোধ জন্মায়। তাই লুসিয়েন এখন সেইরকমই—দায়িত্ব ও অধিকারের একটি বিরাট তোড়া।

এবার স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে, কেন লুসিয়েনের ইহুদি বিরোধিতাকে তার অধিকার বলে মনে হল। এখানে ফ্রয়েডতত্ত্বই কাজ করেছে বলে মনে হয়। সে তার বন্ধু বারজেরের (Bergère) সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হয়। উপভোগ করলেও একটা পরাজয় যেন তাড়া করে। বারজেরে তার শরীরের সবকিছু জেনে যায়। কেউ সব গোপন কিছু জেনে গেলে তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। শুধু তাই না বারজেরের বন্ধু বার্লিয়াক, সে আবার ইহুদি। সে স্কুলে সকলের কাছে বলে দিতে পারে। তাকে সকলে ঘৃণা করতে পারে। ক্রমশঃ ইহুদি বিরোধিতা তার ভেতর জন্ম নেয়। আমরা দেখতে পাই যেদিন সে দীর্ঘকায় এক ইহুদিকে মারধোর করে সেদিনই পবিত্রভাবে তার বান্ধবী মাদকে ভালবেসে সহবাস করে। এর আগে কখনো চুমু ছাড়া আর কিছুই সে করেনি। প্রথম সে অধিকার সচেতন হয়ে মাদকে গ্রহণ করে। এও সে বুঝতে পারে অধিকার-সচেতনাও আবেগতাড়িত ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই ancillary ভালবাসা সে পছন্দ করে না। এতদিন সে মনে করত তারা দুজন মিলে এক হয়ে যা হল, তা মাংসপিণ্ড। এখানেও তার ব্যক্তিসত্তা বিসর্জিত হয়ে পড়ে। তার প্রেমও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। লুসিয়েন প্রেমে ব্যর্থ হয়েই সে আবার তার

বাবা, মা, বন্ধুদের কথা স্মৃতিতে আনে। ভাবে সে বোধহয় দৃঢ়, নির্মম ব্যক্তি যা তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আয়নায় সে অন্য মূর্তিই দেখে।

'দ্য চাইল্ডহুড অব এ লিডর' গল্পে কি তবে ইহুদি বিরোধিতার সপক্ষে লেখক তাঁর যুক্তি দাঁড় করালেন, স্বভাবতই এ প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। এ গল্পটিতে ইহুদি বিরোধিতা নায়কের অধিকার বলে মনে হলেও, গল্পটি ব্যঙ্গাত্মক। শেষ বাক্যটিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে। এটি ইউরোপের এক বিশেষ সময়ের মানসিক পর্যায়। ইহুদিদের আচরণ-ধারাতে এ গল্পে এমন কোন বিদ্বেষ-প্রসূত সিচ্যুয়েশন বা ইনসিডেন্ট নেই যা আমাদের উত্তেজিত করতে পারে। পরবর্তীকালে ইহুদি বিরোধিতার বিরুদ্ধে সার্ত্রে সোচ্চার ছিলেন। এই বিরোধিতা তাঁর কাছে অর্থহীন, এবং এতে কোন পক্ষের সমস্যার সমাধান হবে না বলে তিনি প্রচার করেছেন।

সার্ত্রের গল্পগুলোকে নঞর্থক বলে মনে হতে পারে এরকম গহ্বর লেখক নিজেই তৈরি করেছেন। অর্থাৎ এক ভ্রমাত্মক জগতে নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। এবারে পাঠকই নির্বাচন করবে সদর্থক জীবনের দিকে তার গতি, না শূন্যতার দিকে গতি। মনে রাখতে হবে নঞর্থক বা শূন্যতার দিকে জীবনের কোন গতি হতে পারে না। 'অস্তিত্বশীল হওয়া' আর 'বেঁচে থাকা' এক জিনিস নয়। অর্থহীন জীবনযাপন করাকে 'বেঁচে থাকা' বলা যায়, কিন্তু কিছুতেই 'অস্তিত্বশীল' বলা যায় না। মানব অস্তিত্ব তার সত্তার সঙ্গে একাত্ম আর ঐ স্বাধীনতা রূপ পায় কর্মের ভেতর দিয়ে। অস্তিত্বশীল ব্যক্তিমাত্র ব্যস্ত থাকে কর্মের ভেতর। বাস্তবতার মধ্যে বেঁচে থাকাই জীবন।

সার্ত্রে মনে করেন, বুদ্ধি অস্তিত্বের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না বলেই সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না। মনের স্বমুখীনতার ভেতরেই ধরা পড়ে মানব অস্তিত্বের রহস্য। আর সেই অস্তিত্ব সবসময় সারধর্মের পূর্ববর্তী।

মানুষ স্বাধীন, নিজের দায়িত্বে মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বা নির্বাচন করতে পারে। স্বাধীনতা বলতে বোঝায় কর্ম করার প্রতিজ্ঞা নেওয়ার ক্ষমতা। কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ তৈরির সামর্থ। চেতনার অন্য নামই স্বাধীনতা। এ সম্পর্কে সচেতন থাকলে সার্ত্রের গল্প সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

'সরল এরিনদিরা এবং তার নিষ্ঠুর ঠাকুমার এক অবিশ্বাস্য ও করুণ গল্প।'

গল্পের নামকরণে শুধু দৈর্ঘ্য নয়, রূপকথার মেজাজও আছে। ওই মেজাজকে আরও ঘনীভূত করে 'অবিশ্বাস্য' নামক বিশেষণটি। গার্সিয়া মার্কেজের লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন তাঁর লেখায় অনেক সময় অদ্ভুত, উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য ভাবনা ও ঘটনা থাকে। শুধু ভাবনার স্তরে উদ্ভটতা এক জিনিস। কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই উদ্ভট ভাবনা বা কল্পনা একটু থাকে। এটা তাই বাস্তবতারই অংশ। কিন্তু সেই উদ্ভটতাকে ঘটনার স্তরে নিয়ে এনে 'বাস্তবায়িত' করা আর এক জিনিস। মার্কেজের লেখায় এরকম বাস্তবায়িত উদ্ভটতাও মাঝে মাঝে থাকে। এজন্য তাঁর লেখাকে বলা হয়ে থাকে ম্যাজিক রিয়েলিজমের ফসল। অর্থাৎ একটা জাদুজগতের তিনি রূপকার। এই লক্ষণগুলো তাঁর লেখাকে একদিকে যেমন আকর্ষক করেছে, অন্যদিকে করে তুলেছে বিতর্কিত। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে বাস্তবায়িত উদ্ভটতার যৌক্তিকতা কোথায়। মার্কেজ অবশ্য বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এটার উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে এই উদ্ভটতা ল্যাটিন আমেরিকার জীবনযাপনেরই অংশ। ওখানকার মানুষের মধ্যেই আছে নানা উদ্ভট ভাবনা, কল্পনা, বিশ্বাস আচরণ। আর একটা যৌক্তিকতার কথা আমরা, অর্থাৎ পাঠকরা, বার করে নিতে পারি। সেটা হল রূপক ও প্রতীকের যুক্তি। অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি তাঁর লেখায় আপাত উদ্ভটতার নিচে লুকিয়ে আছে একটা রূপকী বা প্রতীকী অর্থ।

এই গল্পের নামকরণে 'অবিশ্বাস্য' বিশেষণটি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা খোঁজার চেষ্টা করব গল্পটিতে কোথায় কোথায় অবিশ্বাস্য উপাদান আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার এ গল্পটিতে একেবারে অসম্ভব ঘটনা একটা ছাড়া ঘটছে না, বা প্রচুর ঘটেছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'য়। এখানে শুধু কিছু ঘটনা বা ভাবনা উদ্ভট। একটু আশ্চর্যের। তাই এই গল্পের ক্ষেত্রে 'অবিশ্বাস্য' বিশেষণটি 'বিস্ময়কর' অর্থেই নিতে হবে। তার আগে দীর্ঘ গল্পটির একটা ছোট সারাংশ দেওয়া দরকার। গল্পটি এরকম : মরুভূমির উপর এক বিশাল অট্টালিকায় এরিনদিরা ও তার ঠাকুমা থাকে। বাড়িটি তৈরি করেছিল ঠাকুমার বর আমাদিস, যার পেশা ছিল চোরাকারবার এবং ঠাকুমাকে একটা গণিকালয় থেকে তুলে নিয়ে এসে মরুভূমিতে বাস করা শুরু করে। ওদের ছেলে হয়। ছেলের একটি অবৈধ মেয়ে জন্মায়। এই মেয়েটিই এরিনদিরা। এক সময় আমাদিস এবং ছেলে

দু'জনেরই গুলির ঘায়ে অপমৃত্যু হয়। ঠাকুমা তার নাতনিকে নিয়ে বাড়িতে থাকে। গল্প যখন শুরু হচ্ছে তখন এরিনদিরা চোদ্দ বছরের কিশোরী। মেয়েটিকে ঠাকুমা ক্রীতদাসিদের মত খাটায়। দিনরাত খাটে এরিনদিরা। রান্নাবান্না করা, ঠাকুমাকে চান করিয়ে পোশাক পরিয়ে দেওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার করা, জামাকাপড় কাচা। নানা বৈভবে ভরা বাড়িতে শুধু ঘড়িই আছে কয়েক ডজন। শুধু ওদের দম দিতেই এরিনদিরার ছ'ঘণ্টা সময় লাগে। সব কাজ সেরে এরিনদিরার ঘুমতে ঘুমতে অনেক রাত হয়ে যায়। একদিন ঘুমতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে সে। ঘুমবার আগে জলন্ত লম্ফটা নেভাতে ভুলে যায় এবং লম্ফ উল্টে আগুন ধরে যায় সমস্ত বাড়িতে। রাজমহলের মত বাড়িটি পুড়ে ছাই। কিছু আসবাব ও দামি জিনিসপাতি কোন রকমে বাঁচান সম্ভব হয়।

এরপর থেকে শুরু হল এরিনদিরার করুণ ও অবিশ্বাস্য কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব। ঠাকুমা ঠিক করে বাড়ি পুড়িয়ে ফেলার ক্ষতিপূরণ এরিনদিরাকেই দিতে হবে। কিভাবে? বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। তাই করা হয়। মরুভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে এরিনদিরাকে ভেতরে রাখা হল। আর বাইরে পড়তে লাগল অসংখ্য পুরুষের লাইন। ভিড় সামলাতে কুপনের ব্যবস্থা করা হল। এরিনদিরাকে কেন্দ্র করে মরুভূমির ওই অংশে যেন সার্কাস বা মেলার মত উৎসব শুরু হয়ে গেল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অসংখ্য পুরুষ এরিনদিরাকে ভোগ করে। কয়েকমাসের মধ্যেই প্রচুর অর্থাগম হল। এরিনদিরার এ রকম জীবন চলল প্রায় ছ'বছর। ইউলিসেস নামে এক রূপবান কিশোরও একদিন এরিনদিরাকে ভোগ করবে বলে লাইনে দাঁড়ায়। ওর বাবা চোরাকারবার করে। কমলালেবুর ভেতর ঢুকিয়ে হীরে পাচার করে। এরিনদিরাকে দেখে ইউলিসেস হতবাক। এত রূপ সে দেখে নি। হতবাক এরিনদিরাও। এরকম রূপবান কিশোরও সে দেখে নি। ইউলিসেস চলে যায় কিন্তু এরিনদিরাকে ভুলতে পারে না। একদিন রাতে সে বাড়ি থেকে চলে আসে, এরিনদিরাকে নিয়ে চিরকালের জন্য পালিয়ে যাবে বলে। ঠাকুমা তখন এরিনদিরাকে নিয়ে একটা সমুদ্রের তীরে তাঁবু ফেলেছে। এরিনদিরা ওকে জানায় ঠাকুমাকে হত্যা করলেই সেটা সম্ভব। ইউলিসেস প্রথমে ঘাবড়ে যায়, কিন্তু এরিনদিরার ভর্ৎসনা তার পৌরুষে লাগে। সে ঠাকুমাকে হত্যা করতে রাজি হয়। ঠাকুমার জন্মদিনে বিষমাখা কেক তৈরি করে এনে দেয়। ঠাকুমা সেটা খেয়ে নেয়, অথচ মরে না। ওরা দু'জনে হতবাক। ইউলিসেস বোঝে ছোরা দিয়ে সরাসরি হত্যা না করলে ঠাকুমা মারা যাবে না। সে হঠাৎ সাদা তিমির মত ঠাকুমার প্রকাণ্ড শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর উন্মাদের মত ছোরাটা দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মারা গেল ঠাকুমা। এবং ইউলিসেস হঠাৎ চোখ তুলে দেখে এরিনদিরা ঠাকুমার একটা সোনার অন্তর্বাস হাতে ধরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর সমুদ্রতীর ধরে শহরের দিকে দৌড়তে লাগল। ইউলিসেস ওকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। কিন্তু এরিনদিরা পেছন ফিরেও তাকায় না। সে উর্ধ্বশ্বাসে শহরের দিকে দৌড়চ্ছে। হত্যাজনিত ভয় ও ক্লান্তিতে ইউলিসেস বিধ্বস্ত। সে এরিনদিরাকে ডাকতে ডাকতে কয়েক পা এগল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ঠাকুমার লোকেরা তাকে ধরে ফেলল।

ওদিকে এরিনদিরা দৌড়চ্ছে। হরিণীর মত। সমুদ্রের তীর দিয়ে। সমুদ্র শেষ হয়ে আবার অসীম মরুভূমি এল। এরিনদিরা মরুভূমির ওপর দিয়ে দৌড়তে লাগল। কোনোদিকে না তাকিয়ে এরিনদিরা শুধু দৌড়চ্ছে।

এখানেই গল্পটি শেষ এবং তাৎপর্যও আমাদের কাছে পরিষ্কার। এরিনদিরা এখন যেন সমস্ত পুরুষ জাতি থেকেই যেন মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু তাও কি সে পাবে? গল্পটিতে সে ইঙ্গিত নেই। বরং দৌড়তে দৌড়তে মরুভূমিতেই যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেটাই বেশি স্বাভাবিক। আমরা এবার সংক্ষেপে খোঁজার চেষ্টা করব গল্পটির মধ্যে 'অবিশ্বাস্য' উপাদান কি কি আছে, অর্থাৎ 'বিস্ময়কর' উপাদান কি কি আছে। এক অর্থে সমস্ত গল্পটিই কি বিস্ময়কর নয়? গল্পটির দূরবর্তী পরিবেশ, ঠাকুমার চরিত্র, এরিনদিরার ওরকম যৌন জীবন, নির্জন মরুভূমির উপর উজ্জ্বল অট্টালিকা, চোরাকারবারীদের জীবন, ঠাকুমাকে হত্যা, এরিনদিরার দৌড় এ সবকিছুর মধ্যে এমনিতেও একটা বিস্ময়কর রোমাঞ্চ আছে। রূপকথাসুলভ মেজাজ আছে। গল্পটির চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিশ্চয়ই মেলে না। গতিহীন, রোমাঞ্চহীন, ঘটনাহীন, কল্পনাশক্তিহীন, ঠাণ্ডা মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে মার্কেজ সাধারণত লেখেন না। তাঁর ভাল লাগে ঘটনা। অ্যাকশন। একটু অদ্ভুত চরিত্র। তাদের অদ্ভুত ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, কাণ্ডকারখানা। এরিনদিরা দুর্ঘটনাবশত বাড়িটি পুড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঠাকুমা যে পথ নিল তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। চোদ্দ বছরের কিশোরীকে দিনের পর দিন, রাতদিন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পুরুষেরা ভোগ করে যায়। এরিনদিরা রোজই শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

"'ঠাকুমা!' সে ফুঁপিয়ে (একদিন) বলে। 'আমি মারা যাব।' ঠাকুমা তার কপাল ছুঁল, এবং যখন দেখল জ্বর নেই, তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। 'আর মাত্র দশজন সৈনিক আছে।' ঠাকুমা জানায়। আতঙ্কিত পশুদের মত এরিনদিরা আর্তনাদ করে উঠল।"

মূল সংকট ছাড়াও গল্পটিতে ছোট ছোট এমন সব ভাবনা, ঘটনা ও চিত্রকল্প আছে যা বিস্ময় জাগায়। ঠাকুমা ঘুমের ভেতরও জাগ্রত থাকে। ঘুমতে ঘুমতেও

সে এরিনদিরাকে নানা কাজের হুকুম দিয়ে যায়। ঘুমের ভেতর জাগ্রত থাকার ক্ষমতা এরিনদিরাও উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। সেও ঘুমের মধ্যে কাজ করে। হাঁটে। এরিনদিরাকে ভোগ করতে প্রথম যে পুরুষ আসে, সে অনেকক্ষণ দর কষাকষি করে জানায় দেড়শ পেসোর বেশি দিতে পারবে না। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঠাকুমা বলে, "মেয়েটা আমার যে ক্ষতি করেছে তার মূল্য দশ লক্ষ পেসোরও বেশি। অত কম দর দিলে সব ঋণ শোধ করতে ওর ত দুশো বছর লেগে যাবে।" দর সাব্যস্ত হবার পর লোকটা যখন এরিনদিরার তাঁবুতে ঢোকে, এরিনদিরা ভয় পায়, চেঁচায়, তারপর অবশ হয়ে যায়।" "ভয়ের কাছে এরিনদিরা আত্মসমর্পণ করল এবং অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর স্বাস্থ্য শরীর দেখে মনে হচ্ছিল ঝোড়ো বাতাসে ভাসতে থাকা একটা মাছের গা থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোৎস্না যেন ওকে সম্মোহিত করে রেখেছে। বিপত্নীক লোকটা ওর পোশাক খুলতে লাগল। সে খুব মাপা টানে পোশাকগুলো ছিঁড়ে চলল, যেন মুঠোয় ধরে ঘাস ছিঁড়ছে, এবং ছেঁড়া রঙিন টুকরোগুলোকে চারপাশে ছড়িয়ে দিল। টুকরোগুলো পতাকার মত হাওয়ায় ভাসল, তারপর বাতাসে উড়ে গেল।' প্রথমদিকে ঠাকুমা কোনো খদ্দেরের কাছে পাঁচ পেসো কম থাকলেও তাকে ফিরিয়ে দিত। এরিনদিরার সঙ্গে সঙ্গম করার অনুমতি দিত না। কিন্তু পরে, "বাস্তব সম্পর্কে তার জ্ঞান আরও গভীর হতে থাকলে সে তাদের প্রত্যেককেই তাঁবুতে ঢোকার অনুমতি দিতে লাগল, যারা টাকার বদলে দাম মেটাতে সক্ষম হত ধর্মীয় মেডেল দিয়ে, কিংবা পরিবারের কোনো প্রাচীন স্মারক দিয়ে, কিংবা বিয়ের আংটি দিয়ে, কিংবা এমন কিছু দিয়ে, ঠাকুমার কামড়ের কাছে যা খাঁটি সোনা বলে প্রমাণিত হত, চকচক না করলেও।" রাতে ইউলিসেসকে ঠাকুমা যেদিন প্রথম দেখে, ছেলেটার রূপে সে এত হকচকিয়ে যায় যে সে মনে করে আকাশ থেকে কোনো দেবদূতই বুঝি নেমে এসেছে। ঠাকুমা ছেলেটাকে সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করে, "'তোমার ডানা দুটোর কি হল?' ইউলিসেস সরলভাবে জবাব দেয়, 'ডানা যার সত্যি ছিল সে আমার ঠাকুর্দা। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করত না।'" নাবালিকাকে নিয়ে এরকম অবৈধ ও ঘৃণ্য ব্যবসা করার জন্য একদিন ওই অঞ্চলের মিশনারিরা এরিনদিরাকে ধরে আশ্রমে বন্দী করে দেয়। ঠাকুমার মাথায় হাত। কারণ তখনও তার অনেক ক্ষতিপূরণ বাকি। বাড়ি তৈরির সমস্ত টাকা এরিনদিরা তখনও তুলে দেয় নি। ঠাকুমা মিশনারিদের কবল থেকে নাতনিকে উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু হয় না। সে একবার ওই অঞ্চলের মেয়রের কাছে গেল এবং নাতনিকে উদ্ধার করে দেবার জন্য লোকটার কাছে করুণ প্রার্থনা করল। "ঠাকুমা দিয়ে দেখে লোকটা তার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে, খালি গা, এবং একটা যুদ্ধের বন্দুক দিয়ে চলন্ত আকাশে উড়ে চলা এক টুকরো কালো ও নিঃসঙ্গ মেঘের দিকে

তাক করে গুলি ছুঁড়ছে। সে চেষ্টা করছে মেঘটাকে ফুটো করে দিতে, যাতে বৃষ্টি নামে।" মার্কেজ একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তাঁর দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে প্রেমে পড়লে প্রেমিক বা প্রেমিকার জীবনে হঠাৎ নানা অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে শুরু করে। এ গল্পে ইউলিসেস এরিনদিরার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবার পর সে যখন বাড়ি ফেরে, "ওর মা ওকে চারটের সময় খাওয়ার ওষুধটা দিতে বলল। ওষুধটা একটু দূরে টেবিলের ওপর রাখা। ইউলিসেস ওটা ছোঁয়া মাত্র শিশির কাচের রঙ পালটে গেল। তারপর খেলাচ্ছলে সে কিছু পেয়ালার পাশে রাখা একটা কাচের কলসের গায়ে হাত রাখল। কলসটা সঙ্গে সঙ্গে নীল রঙের হয়ে গেল। ওষুধ খেতে খেতে মা ব্যাপারটা দেখল। এবং যখন নিশ্চিত হল যে অসুখের কষ্টের জন্য সে ভুল দেখছে না, ছেলেকে জিজ্ঞেস করল,

'কতদিন ধরে ওরকম হচ্ছে ?'

'মরুভূমি থেকে আমার ফিরে আসার পর থেকে।' ইউলিসেস জবাব দেয়। 'শুধু কাচের জিনিস ছুঁলেই ওরকম হয়।"

"মার কাছে আরও প্রমাণ দেবার জন্য ইউলিসেস টেবিলে রাখা কাচের জিনিষগুলো একের পর এক ছুঁয়ে যেতে লাগল এবং প্রত্যেকেই রঙিন হয়ে উঠল।

'শুধু প্রেমে পড়লেই ওরকম হয়।' মা বলল। 'মেয়েটা কে ?'"

সমস্ত গল্পটিতে এই ঘটনাটাই একমাত্র উদাহরণ, যেখানে সত্যি সত্যি কোনো উদ্ভব ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। কাচগুলো সত্যি সত্যি রঙিন হয়ে উঠছে, মা সেটা দেখছে। এটা কল্পনা নয়। এরিনদিরা ইউলিসেসের ভাবনায় বিভোর। এক রাতে "অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বিছানায় শুয়ে ভাবছে, ঠাকুমা ঘুমের ভেতর গান গাইছে, পরনে সোনার অন্তর্বাস। এরিনদিরা বিছানা থেকে ঠাকুমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। অন্ধকারে ওর চোখ দুটোকে বেড়ালের চোখের মত দেখাচ্ছিল, তারপর ভেতরের কণ্ঠস্বরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ডাকল, 'ইউলিসেস!' 'কমলালেবুর বাগানে নিজের বাড়ির ভেতর ঘুমিয়ে থাকা ইউলিসেসের ঘুম ভেঙে গেল। এরিনদিরার গলা সে এত স্পষ্ট শুনতে পেল যে ঘরটার অন্ধকারে সে এরিনদিরাকে খুঁজতে লাগল।'" ঘুমের ভেতর ঠাকুমা রোজই নানা কথা বলে। যেন স্বপ্নে যা দেখছে মুখে তার বিবরণ দিয়ে চলেছে। ঘুমের ভেতর তার মনে ভেসে আসে অতীতের সুখের দিনগুলো, যখন সে খুব সুন্দরী এবং আমাদিস তাকে খুব ভালবাসে। একদিন ঘুমের ভেতর সে বলছে, "'ওটা ওই সময়ের কথা যখন গ্রীক জাহাজটা বন্দরে ভেড়ে। ওটায় ছিল একদল উন্মাদ নাবিক, যারা মেয়েদের খুব সুখ দিত, আর পয়সার বদলে দিত প্রচুর স্পঞ্জ। জীবন্ত স্পঞ্জ। ওই স্পঞ্জগুলো

পরে বাড়ির চারপাশে চলাফেরা করত, আর হাসপাতালের রুগীদের মত গোঙানি তুলত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওরা কাঁদাত, যাতে ওদের অশ্রু খেতে পারে।'" এরিনদিরা ইউলিসেসকে ভর্ৎসনা করে জানাল সে যদি যথেষ্ট পুরুষ হয় এবং তাকে পেতে চায়, তবে ঠাকুমাকে তার হত্যা করা উচিত। ইউলিসেস রাজি হয়। ঠিক হয় জন্মদিনে ঠাকুমাকে বিষমাখা কেক খেতে দেওয়া হবে। জন্মদিনের কেক হাতে সে যখন তাঁবুর ভেতর ঢুকছে, ঠাকুমা ধমক দিয়ে জানতে চায় এখানে আসার সাহস সে কোথায় পেল। ইউলিসেস দারুণ রূপবান, একেবারে দেবদূতের মত। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মধ্যে শয়তান ঢুকে আছে, কারণ সে মনে মনে ঠাকুমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। তাই এই মুহূর্তে সে দেবদূত নয়, সে শয়তান। ঠাকুমার ধমক খেয়ে ইউলিসেস ঘাবড়ে গেলেও, নিজের শয়তানটা গোপন রাখতে ব্যর্থ হয় নি। মার্কেজ বড় সুন্দর লিখছেন, "নিজের দেবদূতীয় মুখটার আড়ালে ইউলিসেস লুকিয়ে পড়ল।"

গল্পটিতে কিছু কিছু 'অবিশ্বাস্য' বা 'বিস্ময়কর' ভাবনা ও ঘটনা এভাবে প্রবেশ করেছে। শুধু এ গল্প নয়, মার্কেজের অন্যান্য প্রধান লেখায়ও এরকম অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর উপাদান আছে। খুব বাড়াবাড়ি রকমের অবিশ্বাস্য কিছু থাকলে পাঠকের যুক্তিবোধের উপর স্বভাবতই চাপ পড়ে। পাঠক ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না। বিতর্ক ওঠে। তবে সেসব ক্ষেত্রে ঘটনাগুলোকে প্রতীকী বা রূপকী অর্থে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু অবিশ্বাস্য ও উদ্ভট উপাদানগুলো যদি চরিত্রের বা লেখকের শুধু কল্পনাতেই প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাইরে যদি না ঘটে, তবে সেগুলোর যে একটা বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। ওরকম উপাদান লেখাকে আরও বাস্তব, আরও সত্য ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। শুধু আপাত বাস্তবতায় লেখা ভেসে বেড়ায় না। শুধু তাই নয়, ওগুলোর উপস্থিতি ও গল্প ও উপন্যাসকে করে তোলে অপরিসীমভাবে উপভোগ্য। গল্প পড়ার খাঁটি স্বাদটা পাওয়া যায়। মন শিশুদের মত কল্পনা-প্রবণ হয়ে ওঠে। কল্পনাটা হয়ে ওঠে আদিম পুরুষদের মত মিথিক। তখন গল্প পড়তে পড়তে বৃষ্টি না পড়লেও বাইরে যেন বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যায়। শীতকাল না থাকলেও মনে হয় শীতের রাতে কোনো আগুনের বৃত্তের সামনে বসে আছি। কথক গল্প বলে চলেছে।

জয়েসের পর থেকে য়োরোপীয় গল্প উপন্যাসে নিছক বুদ্ধিবৃত্তি, জটিল বিশ্লেষণ এবং কাহিনীহীনতার যে ঐতিহ্য প্রায় পাঁচ দশক ধরে ছড়ি ঘুরিয়েছে, মার্কেজের লেখা যেন সেই গাম্ভীর্যের মুখে শিশুদের আনন্দে নানা রঙ মাখিয়ে দিয়ে হাসছে।